নিবেদিত মার্গারেট

ডঃ দীপক চন্দ্র

দাশগুপ্ত এণ্ড কোং
৫৪/৩, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
ফাদার দ্যতিয়েন
শান্তি সদন
৩৪-এ, তেলিপাড়া লেন
কলিকাতা-৪

প্রথম প্রকাশ, ফাল্গুন ১৩৬২

স্বপ্নের ভারতবর্ষে যাওয়ার ডাক এল মার্গারেটের। মনটা তৈরিই ছিল। কেবল যেতেই বিলম্ব হচ্ছিল। সেজন্য রাজার ওপর রাগ হতো তার। রাজা তো ভাল করেই জানে দেহই আয়র্ল্যান্ডে তার, মন ভারতবর্ষে। স্বপ্নের ভারতবর্ষের নীল আকাশে পাখা মেলে দিয়ে নীল সমুদ্রে ভেসে ভেসে সে মন পৌঁছে যায় তিন সাগর ঘেরা ভারতবর্ষের উপকূলে। কল্পনায় দেখত মুণ্ডিত মস্তক গেরুয়া বসন পরিহিত তার রাজাকে এবং তাঁর গুরু রামকৃষ্ণের সমাহিত মূর্তি। রাজার প্রাণোজ্বল, জ্যোর্তিময় দৃপ্ত দুটি চোখের মনোহারিত্ব তার কল্পনেত্রে শোভা পেত।

একটা ঘোরের মধ্যে আকুল প্রতীক্ষায় মার্গারেটের দিনগুলো কাটতে লাগল। যাত্রার দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করার তর সইছিল না তার। কতদিন রাজাকে দেখে না। চিঠি পাওয়া থেকেই তাকে মনে পড়ছে শুধু।

বুকের ভেতর সযত্নে রাখা-ভাঁজ করা চিঠিখানা চোখের সামনে পুনরায় মেলে ধরল। কথাগুলো রাজার মুধুস্রাবী কণ্ঠস্বর হয়ে হৃদয় তন্ত্রীতে বেজে যায়। মূর্ছনা থামে না যেন তার। চল্‌কে চল্‌কে চলে। উপছে পড়ে অবলীলায়। সুদূরলোক থেকে মহাসঙ্গীতের সুর হয়ে ভেসে আসে যেন। রাজা সমস্ত হৃদয় দিকে ডাকছে তাকে "মার্গারেট, ভারতের কাজে তোমার এক বিরাট ভবিষ্যৎ রয়েছে। ভারতবর্ষ এখন মহীয়সী নারীর জন্মদান করতে পারছে না—সেজন্য অন্য জতির থেকে তাব ধার করতেই হবে। তুমি ঠিক সেই নারী যাকে ভারতের প্রয়োজন। এদেশে এলে দেখবে চারদিকে অর্ধনগ্ন অগণিত নরনারী, জাতি ও স্পর্শ সম্বন্ধে তাদের উদ্ভট ধারণা, শ্বেতাঙ্গদের এড়িয়ে চলে ভয়ে বা ঘৃণায়। অন্যদিকে শ্বেতাঙ্গরা তেমার গতিবিধি সন্দেহের চোখে দেখবে। এসব সত্বেও যদি তুমি কর্মে প্রবৃত্ত হতে সাহস কর, স্বাগত তুমি—শতবার স্বাগত। ঝাঁপ

দেবার আগে রীতিমত ভেবে দেখবে। যদি ব্যর্থ হও কিংবা বিরক্তি আসে আমি আমরণ তোমার পাশে আছি।" গভীর আবেশে মার্গারেটের দু'চোখ বুজে এল। পরম মমতায় বুকের ওপর সযত্নে চেপে ধরল রাজার চিঠিখানা। কেমন একটা আচ্ছন্নতার মধ্যে ডুবে গিয়ে গভীর গাঢ় গলায় সঘন প্রেমে অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করল ঃ রা-আ-জা-আ-আ। আমার রাজা! অদ্ভুত ভাবাবেশে দু'চোখের কোন বেয়ে জলের ধারা নামল। রাজার হস্তাক্ষরের ছোঁয়াও যে এক স্পর্শহীন ছোঁয়া জানত না মার্গারেট। এই মুহূর্তে মনে হল কে যেন সমস্ত অনুভূতির ভেতর, আদর্শ, সেবা, ত্যাগের শতদল মেলে ধরেছে। এক অনাস্বাদিত প্রাপ্তির সুখে ভরে যেতে লাগল তার অন্তঃকরণ। খুশি, আনন্দ মজার এই অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ কার সৃষ্টি? তার মধ্যে এই আবেগের সূচনা করল কে? কে?

অজস্র প্রশ্নে তার বুকটা ঝড়ো হাওয়ায় উথাল পাথাল গাছের মতই তোলপাড় করতে লাগল। মার্গারেটের সব ভাবনা চিন্তা ঘুরছে রাজাকে কেন্দ্র করে। শ্রদ্ধা ও পূজোর সঙ্গে মিশে গেল সেই অদ্ভুত অত্যাশ্চর্য ভালোলাগার অনুভূতি। ভালোলাগার এক আশ্চর্য প্রাপ্তির সুখেও তৃপ্তিতে ভরে যেতে লাগল তার ভেতরটা। বড় কৃতার্থ মনে হল নিজেকে। জীবনের আস্বাদটা মাত্র ক'দিনে আশ্চর্যভাবে বদলে দিল ভারতের মহাযোগী।

মাত্র দু'বছর আগের কথা। ১৮৯৫ সালের অক্টোবর মাস। সেসিম ক্লাবের পাঠকক্ষে একগুচ্ছ সংবাদপত্র নিয়ে রোজকার মত সংবাদ পড়ছিল মার্গারেট। দি ওয়েস্ট মিনিস্টার গেজেট, দি লন্ডন ডেলি ক্রনিকাল, দি স্টান্ডার্ড পত্রিকাগুলো ফলাও করে ভারতের এক হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণ ছেপেছিল। মার্গারেট মনোযোগ দিয়ে সেগুলো অনেক সময় ধরে পড়ল। তারপরে বেশ ক'দিনের সংবাদপত্র আলমারি থেকে বার করল। সব সংবাদগুলি তার মনকে গভীরভাবে স্পর্শে করল। বারংবার মনে হচ্ছিল এই অসামান্য মানুষটি এ জগতের হয়েও সর্বাংশে এ জগতের কেউ নন যেন। সব কাগজই তাঁকে একজন স্বতন্ত্রপুরুষরূপে বর্ণনা করেছিল। যে অজ্ঞতারহস্যময় দেশ থেকে যুগে যুগে মহাপ্রতিশ্রুতি পালনের জন্য বুদ্ধ আসেন পৃথিবীতে, যীশু আসেন ; সে দেশেরই যেন তিনি এক চিরন্তন অধিবাসী। তথাপি কী আশ্চর্য! এই দুঃখের হাসি-কান্না মায়ায় ঘেরা সংসারের সঙ্গে বত্রিশ নাড়ীর বন্ধন তাঁর।

মার্গারেটের দুই চোখে তন্ময়তা। শত শত যোজন বিস্তৃত সমুদ্র অতিক্রম করে ভারতবর্ষের মানচিত্রকে দেখছিল। সন্ধানী চোখ দুটো সারা ভারতবর্ষের ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে পূর্বপ্রান্তে সমুদ্র উপকূলস্থ একটা ছোট্ট দেশের উপর স্থির হয়ে রইল। ঐ দেশ এবং তার মানুষজন সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না। ভারতবর্ষ নামটিই জানে। সে দেশ তার স্বদেশভূমি আয়র্ল্যান্ডের মতই

পরাধীন। এবং বৃটিশ শাসিত এক উপনিবেশ। তার স্বদেশ ও স্বজাতির মত ঐদেশের মানুষদেরও অনন্ত দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়। তাদের মতই ভারতীয়রাও দুর্ভাগা, উৎপীড়িত, শোষিত এবং নির্যাতিত। মার্গারেটের কোমল প্রাণ সমবেদনায় আর্দ্র হল। নিজের অজান্তে সহানুভূতিসূত্রে বাধা পড়ল মন। সেই মনটি সংবাদপত্রের বিবরণ অনুযায়ী কল্পনায় হিন্দু সন্ন্যাসীর এক ছবি আঁকল। গৈরিক আলখাল্লা গায় সর্বত্যাগী এক সন্ন্যাসী মাথায় ও কটিতে কমলা রঙের উষ্ণীষ এবং কোমরবন্ধ পরে দাঁড়িয়ে আছে। আঁখিদ্বয়ে তাঁর অপূর্ব জ্যোতি। চাহনিতে স্বর্গীয় শান্তিসুধা, কান্তিময় নিষ্পাপ মুখে যীশুর সারল্য।

দি ওয়েস্ট মিনিস্টার গেজেটের সাংবাদ ভাষ্য এবং বিশ্লেষণ মার্গারেটের নজর কেড়ে নিল। কথাগুলো তার কাছে ভীষণভাবে সত্য বলে বোধ হল। ধর্মের প্রভাব মানুষের মনে কত গভীর এবং ব্যাপক হিন্দু সন্ন্যাসীর মত এমন করে উপলব্ধি আগে কেউ করিনি। গৈরিক উষ্ণীষধারী ভারতীয় হিন্দু সন্ন্যাসী পাশ্চাত্যের মাটিতে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট ভাষায় প্রথম শোনালেন পাশ্চাত্যের কলকব্জা, মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে মানুষের যে মঙ্গল এবং কল্যাণ হয়েছে তা অতি সামান্য। তার চাইতে যীশুখৃষ্ট এবং বুদ্ধের কয়েকটা কথায় মানব সমাজের ঢের বেশি উপকার হয়েছে। কথাগুলো মন্ত্রধ্বনির মত মার্গারেটের হৃদয় মন আলোড়িত করল। ধর্মপ্রাণ মনটি তার ভীষণভাবে নাড়া খেল তাতে। বারংবার মনে হতে লাগল তবে কি এই তরুণ সন্ন্যাসীর কণ্ঠে বিধাতা আহ্বানের শক্তি দিয়েছেন? এই শক্তির প্রতি মার্গারেটের অন্তরে শ্রদ্ধার উদ্রেক করল। নিজেব অজান্তে মার্গারেটের বুকের ভিতরটা কাঁপল। কেন কাঁপল কে জানে? টেবিলের ওপর পেনসিল আর কাগজ ছিল একখণ্ড। সেটা টেনে নিয়ে কখন যে আপন মনে হিজিবিজি কাটতে লাগল নিজেই জানে না।

ক্লাব থেকে বেরোনোর সময় লেডি নেল হ্যামণ্ড দেখল, টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে মার্গারেট নিবিষ্ট হয়ে কাগজে হিজিবিজি কাটছে। বেশ একটা অন্যমনস্কভাব তার মুখে চোখে প্রকট হয়ে উঠেছিল। নেল হ্যামণ্ড ছিল মার্গারেটের বিশিষ্ট বান্ধবী। মার্গারেট কী করছে দেখার কৌতূহল নিয়ে চুপি চুপি মার্গারেটের পিছনে এসে দাঁড়াল। মার্গারেটের ছবি আঁকার একটা ঈশ্বরদত্ত হাত ছিল। হিজিবিজি রেখাও তার হাতে ছবি হয়ে যায়। অসংখ্য জটপাকানো রেখার মধ্যে মনুষ্যাকৃতি একটা মুখাবয়ব ফুটে বেরোল। জটপাকানো রেখার মধ্যে দৃপ্ত দুটি চোখ, আর কপাল ছাড়া অল্প আলোয় নেল ভাল করে কিছু ঠাওর করতে পারল না। এক অপার্থিব মাধুর্যে ভরপুর সে চাহনি। যেন কোন স্বপ্ন সায়রে অথৈ সলিলে নিমগ্ন। সবিস্ময়ে নেল নিজের মনে প্রশ্ন করল ও কে? ও কার চোখ? দেবতার আর্শীবাদ নিয়ে ও কোন মন ভোলানো মানুষ

এল পৃথিবীতে! ও যীশুও নয়, বুদ্ধও নয় ;-তাহলে করুনাঘন দুই চোখ এঁকে মার্গারেট কী বোঝাতে চাইছে? কুণ্ডলীকৃত জটপাকানো রেখাগুলো ঘূর্ণিঝড়ের প্রতীক যেন। নেলের মনে হতে লাগল প্রলয়ঙ্করী ঝড়ের মধ্যে দুটি নির্ভয় চোখ অভয় দিচ্ছে যেন সকলকে। নেলের খুব ইচ্ছে হল তন্ময়তা ভঙ্গ করে তাকে কিছু জিগ্যেস করে। কিন্তু পারল না। সঙ্কোচের সঙ্গেই তার পিঠে হাত রাখল। তার হাতের ছোঁয়ায় মার্গারেটের ভেতরটা শিহরিত হল। আত্মমগ্নভাবটা ভঙ্গ হল। অপ্রস্তুত হাসি ফুটল অধরে। নেল হাসল। বললঃ গতকাল পিকাডিলির প্রিন্সেস হলে ভারতের হিন্দু সন্ন্যাসী যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, ছোট বড় সব ডেলি নিউজ'এ তা ছাপা হয়েছে। তুমিও দেখে থাকবে।

মার্গারেট নিস্পৃহভাবে বলল ঃ হ্যাঁ ক্লাবে বসেই দেখলাম। তবে, আহা মরি কিছু নয়। খুবই মামুলি। ধর্ম সম্পর্কে সাধারণ কথাবার্তা। তবু খ্রীষ্টের দেশের কাগজগুলো তাকে অহেতু ফোকাস করে খবরের শিরনামায় নিয়ে এসেছে। এতখানি বাড়াবাড়ি না করলেই ভাল হত। হঠাৎ ওঁর মধ্যে কী দেখল তারাই জানে। আমি তো আলখাল্লা পরা সন্ন্যাসীর গেরুয়া বসন, কমলা রঙের উষ্ণীষ আর কটিবন্ধের বর্ণনা ছাড়া মন কাড়া কোন খবর পেলাম না।

নেলের ঠোঁটে টেপা হাসি। বলল ঃ তুমি নিরেপেক্ষ হতে পারলে না। কাগজগুলো তাঁর বক্তব্য যদি পুরোপুরি কভার করত তা-হলে ভাবের রাজ্যে তোমার বড় ধরনের এক বিপর্যয় ঘটে যেত। তাঁর মিশনে যোগ দেওয়ার তর সইত না তোমার।

মার্গারেট সবিস্ময়ে উচ্চারণ করল ঃ তাই বুঝি?

একটুও বাড়িয়ে বলছি না। একদিনেই আমেরিকাবাসীর হৃদয় মন হয় করে নিলেন। কী বিপুল জয় তুমি ভাবতে পারবে না। তারপর আর ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে। কারণ তিনি সকলের থেকে আলাদা এক ব্যক্তিত্ব। তিনি এ জগতের নন। তিনি আলোকিত পুরুষ। গুণী-জ্ঞানী, পণ্ডিত আমেরিকানরা মনে করত, বিধাতার অলঙ্ঘ্য নির্দেশে ঈশ্বরের দূত হয়ে তিনি ভারত থেকে এসেছেন আমেরিকাবাসীকে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যেতে। তাই তাঁর কণ্ঠস্বরে বিধাতা আহ্বানের শক্তি দিয়েছেন। কণ্ঠস্বর তো নয় ইয়োলিয়ান বীনার মধুর গম্ভীর ধ্বনি তরঙ্গ। উনি যখন কথা বলেন, চুপ-চারদিকে গহন নীরবতা, সে এমন মন্থরতা যাকে বুঝি স্পর্শ-করা যায়—বিশাল জনমণ্ডলীর শ্বাসের শব্দটুকু পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে। মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতাদের আত্মার ওপর এক অনৈসর্গিক আলো এসে পড়ল। সেই আলোয় তারা নিজেকে দেখল। সে এক অভূতপূর্ব আবিষ্কার। ভাবতে অবাক লাগে আমেরিকার মত বস্তুতান্ত্রিক দেশ, যেখানে ধর্মের জন্য কারো মাথা ব্যথা নেই ; ভোগের মধ্যে ডুবে আছে যারা, বলনাচ, পানভোজন.

উত্তেজক আনন্দ, যতরকম নিত্যনতুন মজায় যারা সুখ অনুভবর করে, ঐশ্বর্য সম্পদ ফ্যাশান নিয়ে যেদেশের মানুষ রাতদিন মেতে আছে, রাজনীতি যাদের মনে শিকড় গেঁড়ে বসে আছে সে দেশের মানুষ মেঝেয় পা মুড়ে বসে, ভক্তিতে হৃদয়পূর্ণ করে স্বামীজির বক্তৃতা শুনছে, আমেরিকার কাগজে এসব সংবাদ ইংলন্ডের মানুষকে অবাক করে দিয়েছে। স্বামীজির ব্যক্তিত্বের চৌম্বিক আকর্ষণ এবং প্রাণমন কাড়া ভাষণের মধ্যে এমন এক নতুন জীবনদৃষ্টির অনুশীলনের উন্মোচন প্রয়াসী যা ইংলন্ডের বিদ্গ্ধ পণ্ডিত, দার্শনিক গবেষকের মনকেও মাত্র কয়েক দিনে সজোরে নাড়া দিয়েছে। দরিদ্র এবং আত্মসংকুচিত ভারতের মধ্যে লুকোনো মণিমুক্তার সৌন্দর্য সম্বন্ধে ইংরাজদের চোখ খুলে দিয়েছেন। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার অধ্যাপক ডয়সন, চার্চ অব ইংলন্ডের যাজক রেভারেন্ড এইচ আর হাউইস এর মত ব্যক্তিরা তাঁর অনুরাগী এবং ভক্ত হয়ে গেল। এই তরুণ সন্ন্যাসীর মধ্যে তাঁরা এক আচার্যের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। এটা কম কথা! ভারতের প্রভু দেশ হয়েও ইংলন্ড সেই দেশের একজন যোগ্যতাসম্পন্ন গুণীকে যথাযোগ্য সম্মান দিতে কার্পণ্য করে না। ইংরেজ চরিত্রে এই মহত্ব প্রচারের ভূমিকা নিয়েছে ইংলণ্ডের সংবাদপত্রগুলো।

মার্গারেট মনোযোগ দিয়ে তার কথাগুলো শুনছিল। হঠাৎই প্রশ্ন করল ভারতের সন্ন্যাসী সম্পর্কে আমেরিকার পত্র-পত্রিকার ভূমিকা ইংলন্ডের তুলনায় অনেক বেশি স্বার্থশূন্য। আমেরিকানরা করেছে প্রাণের তাগিদে, ইংলন্ড যা করছে নিজের দেশ ও জাতির প্রচারের স্বার্থে।

নেল কথা খুঁজে পায় না। আমতা আমতা করে বলল ঃ মুখ ফস্কে বলাটাই কি সব! প্রাণের টানে মানুষ তাঁর বক্তৃতা শুনতে সমবেত হত। কাজ কর্ম ফেলে তাঁর ব্যক্তিত্বের চুম্বক আকর্ষণে তারা আসত। ওঁর বক্তৃতা চার্চের পাদরীদের মত প্রাণহীন ভাবাবেগসর্বস্ব নীতিকথা কিংবা অনুশাসন নয়। প্রাণ থেকে ভালবাসার বাণী ফোয়ারার মত ফিনকি দিয়ে উৎসারিত হয়! বুকের মধ্যে জমে থাকা গভীর অনাস্বাদিত বোধগুলোকে হঠাৎ করে গলিয়ে দিয়ে এক মুগ্ধতায় চমকে দেয় তাদের। মার্গারেট, এমন করে হৃদয় নিঙড়ে দেয়া ভালবাসা দিয়ে শ্রোতার হৃদয় জয় করে নেওয়ার একজন বক্তাও ইংলন্ডে আমি দেখিনি। অমন করে আপনার বলে কাছে টানতে আর কোনো মানুষ পারবে না।

মার্গারেট বলল ঃ সবই কাগুজে সংবাদ। তুমি নিজে তাঁর বক্তৃতা শুনেছ।

শুনেছি। তিনি শুধু দেখার মানুষ নয়, শোনারও মানুষ। তাঁর ভাষণ শুনে জীবন আমার সার্থক হয়ে গেছে। গতকাল প্রিন্সেস হলে তাঁর বক্তৃতা আমার নিজস্ব ভাবনা চিন্তা যুক্তিতর্কের কেন্দ্রটা শিথিল করে দিয়েছিল। এতকালের ধ্যানধারনা সব মুর্হুমুহু বদলে যেতে লাগল। কেবলই মনে হচ্ছিল, এই ক্ষণটুকু

যেন শেষ না হয় কখনও। তাঁর বুকে প্রেমের কল্লোল এখনও শুনতে পাচ্ছি আমি। সে বক্তৃতা শুনলে তোমার কোনো সংশয় থাকবে না। যীশুর প্রতি কী আগাধ প্রেম তাঁর বুকে! কী অমেয় শ্রদ্ধা! বুক ফুলিয়ে ধর্মযাজকদের সামনে নিন্দে করলেন ধর্মধ্বজী ভণ্ড ধর্মযাজকদের ভণ্ডামিকে। তাঁদের গোঁড়ামি এবং কুসংস্কারকে। তুমি যেভাবে চিন্তা কর অনেকটা সেভাবেই খ্রীষ্টের দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে অকম্পিতবুকে তীব্রভাষায় নিন্দে করলেন ধর্মব্যবসায়ী এবং মিশনারীদের অসাধুতা, নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা এবং হৃদয়হীনতাকে। তারপর বললেন, যীশু বলেছেন মানুষ যেমন নিজেকে ভালবাসে তেমনি ভালবাসবে তার প্রতিবেশীকে। কিন্তু হায়। যীশুর ভক্তেরা শুনল না তাঁর কথা। তাঁর কথায় কান না দিয়ে অবাধে প্রতিবেশীকে শোষণ করেছে, বঞ্চিত করেছে ;-দারিদ্র্যে, দুর্ভিক্ষে তাদের শৃঙ্খলিত করে রেখেছে। এইসব খৃষ্টানদের নিন্দে করলে খ্রীষ্টধর্ম অশুদ্ধ হয় না। বি পিওর, হ্যাভ ফেথ বি ওবিডিয়েন্ট।

মার্গারেট চুপ করে রইল। তার যুক্তিবাদী সংশয়ী মনটা আসলে মনের মত একটা জবাব খুঁজছিল। নেলের আবেগ এবং উচ্ছ্বাস নিছকই একধরনের ভালবাসা যা তার চার্চ নিয়ন্ত্রিত ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের প্রতি একপ্রকার বীতস্পৃহা থেকে জাত। এখানে তার হৃদয়াবেগ যতখানি সক্রিয়, বুদ্ধিবৃত্তি ততখানি নয়। তাই হিন্দু সন্ন্যাসীর প্রত্যেকটি কথায় অবাক হয়েছিল। মার্গারেট তার কথায় প্রতিবাদ করল না। বেশ একটু অস্বস্তি নিয়ে বলল ঃ জান নেল, মানুষের স্বভাবই হল নতুন কথা শুনলে গলে পড়ে। তাকেই ধ্রুব সত্য মনে করে। কিন্তু মন্দ কথা শুনলে তৎক্ষণাৎ বিশ্বাস করে। হিন্দু সন্ন্যাসীর কথা বিশ্বাস করা তোমার কোনো অন্যায় হয়নি। কথাগুলো বলা শেষ করে শুকনো ঠোঁটে বিজ্ঞের হাসি হাসল মার্গারেট।

নেল হ্যামণ্ড আশাহত দৃষ্টিতে মার্গারেটের দিকে চেয়ে রইল। থমথমে গম্ভীর গলায় বলল ঃ তুমি অবিশ্বাস কর!

বিশ্বাস করার মত যে কথাগুলো আছে তা অত্যন্ত মামুলী। এমনিতে লন্ডনের মানুষের মনে ইদানীং খ্রীষ্টধর্মের প্রতি একধরনের বিরাগ বীতস্পৃহা প্রবল হচ্ছে। তাদের মনে প্রশ্ন জেগেছে এই যাজকীয় সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে আর কোনো উদার মানবীয় ধর্ম কী পৃথিবীতে নেই? লোকচরিত্র অভিজ্ঞ হিন্দু সন্ন্যাসী গণমনের সেই প্রতিক্রিয়া সম্বল করে খুব সহজে লন্ডনবাসীয় মন জয় করে নিল। তোমরা তাঁর চালাকিটা ধরতে পারলে না।

মার্গারেট বিশ্বাস করা না করা প্রত্যেকের নিজের ব্যাপার। কারো ওপর তাঁর ধারণা চাপিয়ে দিচ্ছেন না। এ তাঁর নিজের কথা। চিরন্তন সত্যের উপলব্ধি। এর ভেতর কোনো চালাকি নেই। প্রতারণা করারও কোনো চেষ্টা নেই।

মার্গারেট নিজের যুক্তিতে অবিচল থেকে বলল ঃ আমাদের দোদুল্যমান মানকে দুলিয়ে দিয়ে বিপর্যস্ত করা। অন্য এক ধর্মমতের কথা বলে তাকে আর্ত করে তোলা তাঁর উচিত কাজ নয়। আমার প্রতিক্রিয়া খোলা মনে বলার সঙ্গে অবিশ্বাসের কোনও সম্পর্ক নেই। আমি শুধু বলতে চাই—আমার বিশ্বাস, যুক্তি, চোখ, কান, মগজ কারো কাছে বাঁধা দিইনি।

নেল তার কথায় মর্মাহত হল। এমন অদ্ভুত কথা জন্মেও শোনেনি যেন। একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে সবিস্ময়ে বলল ঃ এ কেমন কথা তোমার মার্গারেট। হিন্দু সন্ন্যাসী বলেছেন, তর্ক করে ধর্ম, ঈশ্বর কোনোটা মেলে না। এ হল বিশ্বাসের ব্যাপার। যে যত যুক্তিবাদী তার সংশয় তত প্রবল। তুমি জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ তার। সত্যিই তুমি একটু আলাদা। অসাধারণ নও, আবার সাধারণ বলতে যা বোঝায় তাও নয়। মানে, একটু অন্যরকম।

মার্গারেটের অধরে একফালি হাসি দেখা দিল। বলল ঃ কী জানি? আমার মধ্যে কী অসাধারণত্ব আছে, তোমরাই জান।

নেল বেশ একটু গম্ভীর গলায় অভিযোগ করে বলল ঃ মার্গারেট নিজেকে ফাঁকি দিও না। নিজেকে প্রতারণা করাও পাপ। তোমার সামনে সাদা কাগজটা কি শুধুই কতকগুলো হিজিবিজি রেখা? না, তুমি তো মানুষের মনস্তত্ব বিশেষ করে শিশু মনস্তত্ব ভাল করেই জান। মানুষের সব কাজেই মনের একটা বড় ভূমিকা থাকে। অবচেতন মনের অনেক কিছুই নিজের অজান্তে, অসতর্কভাবে কখন যে বাইরে বেড়িয়ে পড়ে নিজেও জানতে পারে না। ঐ রেখাগুলো তেমনি তোমার মনকে মেলে ধরেছে। বহুবিধ চিন্তা-ভাবনা, সংশয়-জিজ্ঞাসার যে জট তোমার মনকে উত্তাল করেছে তা রেখার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে মুদ্রিত হয়েছে। আসলে তুমি একটা জালের মধ্যে রয়েছ। এই সংবাদপত্রগুলো পড়ে তোমার মনে হয়েছে ঐ হিন্দু সন্ন্যাসী তোমাকে পথের সন্ধান দিতে পারে। কারণ তোমার বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়েছ, ওঁর কণ্ঠস্বরে-বিভিন্ন বক্তৃতায় আলোচনা সভায়, মানুষের আলাপ-আলোচনায়। বিবেকের কাছে, আত্মার কাছে তুমি সতত প্রশ্ন কর—সত্য কি, ধর্ম কি, ধর্ম ও সত্য কি এক? সেই ধর্ম কোথায়-যে ধর্মে সকলের স্থান, সকলকে বুকে টেনে নিতে পারে। যে ধর্মে মুক্তি কেবল কয়েকজন মানুষের জন্য নয় জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে সকলের লভ্য, সেই মুক্ত দৃপ্ত মহাপ্রেমের প্রার্থনা করে তুমি। ভারতের এই হিন্দু সন্ন্যাসী সেই মহাপ্রেমের বাণী বহন করে তোমার হৃদয়ের বদ্ধকপাটে করাঘাত করেছেন। আর তুমি অভিমান করে কপাট বন্ধ করে বসে আছ। এখন কী তোমার অভিমান করা সাজে? ওঠ, জাগ, এগিয়ে চল তোমার অভীষ্ট লক্ষ্যের পথে।

নেলের কথা শুনে মার্গারেট একটুও অভিভূত হল না। কৌতুক করে বলল ঃ চমৎকার। তোমার কথাগুলো মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম। কল্পনা হিসেবে খুবই উৎকৃষ্ট। আবেগের কাছে এর একটা বিরাট মূল্য আছে। কিন্তু কোনো বাস্তবতা নেই।

বেশ একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে নেল বলল ঃ তর্ক করতে তোমার ভাল লাগে। কিন্তু হৃদয়ের অনেক কিছুই বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা হয় না। আগামী নভেম্বর মাসে ঐ সন্ন্যাসীকে লেডি ইসাবেল মার্জেসন তাঁর গৃহে আমন্ত্রণ করেছেন। দিন স্থির হলে তোমাকে জানাব। সেদিন তাঁর কাছে আসল-নকল, সংশয়-অবিশ্বাস সব যাচাই করে নিও। তাঁর কথা শোনার পরেই মনে হবে এতদিন যাকে খুঁজছিলে, সেই পরশ পাথর পেয়ে গেছ হাতে। রাত হয়েছে। ঠাণ্ডাও পড়েছে খুব। আজ তা হলে আসি।

মার্গারেট মুখ টিপে হাসল। বলল ঃ এস। আমিও ওঠব।

নেলের পিছন পিছন মার্গারেটও বেরোল। একটা ভাড়া ফিটন গাড়ী নিয়ে বাড়ীর দিকে চলল। সারাটা পথ নেলের কথাগুলো তাকে আচ্ছন্ন করে রাখল।

অশ্বখুরের আওয়াজ তুলে ফিটন গাড়িগুলো দুলকি চালে পথ দিয়ে হনহনিয়ে চলেছিল। তার দুই ঘোড়ার ফিটনকে পিছনে রেখে মোটরগাড়িগুলো হুশ হুশ করে একর পর এক চলে যাচ্ছিল। প্রতিযোগিতায় একালের গাড়ির সঙ্গে সেকালের গাড়ি পেরে ওঠছিল না। ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ল। পথের দিকে চাইলেই জীবনের গতিটাকে ভীষণভাবে অনুভব করা যায়। চলমানের সঙ্গে মনটাও চলতে থাকে। এজগতে কেউ কোথাও থেমে নেই। সবাই চলেছে যে যার নিজের গন্তব্য পথে, একেই বলে জীবন। জীবন মানে জীবন্ত থাকা। প্রতিমুহূর্ত নদীও তার গতি বদলে চলেছে। চলার মধ্যে একধরনের আনন্দ আছে, যারা থেমে থাকে স্থবিরতার শিকার হয়েছে, তারা হয়তো জানে না সে কথা। কিন্তু মানুষের সভ্যতা এক চলমান পৃথিবী। তা হলে, তার ধর্ম, সংস্কাব, আচার-প্রথা, বিশ্বাস, গোটা সমাজব্যবস্থা অচলায়তনের নিগড়ে বাঁধা কেন? মানুষের জগৎ প্রতিদিনি বদলে যাচ্ছে। আজ যেটাকে নিশ্চিত সত্য বলে জানে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে কালই সেটাকে পরম ভ্রান্তি বলে মেনে নিতে হয়। হয়তো এমন না হলে মানুষের জানার ইতিহাস এক নিশ্চল বিন্দুতে স্থির হয়ে থাকত। তা হলে হাজার হাজার বছর আগের ধর্মীয় বিধি-বিধান মানুষের কাছে কোন চিরন্তন সত্যকে পৌঁছে দিল যা অপরিবর্তিত থাকবে যুগযুগান্ত ধরে? মানুষ তো নিরন্তর সত্যকে সন্ধান করে ফিরছে, কোনো সত্যই অপরিবর্তিত নয়। তাই একটা অতৃপ্তি নিরন্তর পূর্ণতার দিকে চলেছে। পরিপূর্ণতাই মুক্তি। তিনিই পরিপূর্ণ, যিনি কোনো কিছুর দ্বারা বদ্ধ নয়। বদ্ধ ধারণাই মানুষকে মুক্তির তৃষ্ণায় আকুল করে। অনরূপ এক আকল করা মন নিয়ে মার্গারেট ঘরে ঢুকল।

রাতের খাবার খেয়ে ফায়ার প্লেসের ধারে বাইবেল হাতে করে বসল। পেজ্ মার্ক করা ইফিষীয়দের কাছে পৌলের চিঠির অংশটা পড়তে পড়তে নিজেকে প্রশ্ন করল ভারতের হিন্দু সন্ন্যাসী কি যীশুর ইচ্ছেয় মানব ধর্মের মহিমা প্রচার করতে ইংলন্ডে এসেছেন। যীশুর কৃপা ভিন্ন এত সহজে খৃষ্টানদের হৃদয় জয় করতে পারত না সন্ন্যাসী এই জয়ের পিছনে অলৌকিক কোনো ঘটনা ছিল না। সমকালীন একটা বদ্ধ অবস্থায় মানুষের ভাবনা-চিন্তার আকাশখানা ছোট হয়ে গেছিল। খাঁচায় বন্দী পাখীর মত মুক্তির জন্য তার ভেতরটা ছটফট করছিল। ঠিক তখনই হিন্দু সন্ন্যাসী নাজারেথের যীশুর কায়দায় মনের বদ্ধ দরজাটা খুলে দিল। যীশুর বাণী ধ্বনিত হল তাঁর কণ্ঠে ; "এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন স্বপ্ন ছেড়ে দাও যে তোমরা নীচ তোমরা দরিদ্র। মনে কর না যে তোমরা দাসের মত পদদলিত ও অত্যাচারিত, কিন্তু তোমাদের মধ্যে এমন কিছু আছে যাকে কখনও নিপীড়িত করা যায় না, পদদলিত করা যায় না। যন্ত্রণা দেওয়া যায় না, হত্যা করা যায় না। তোমরা সব ভগবানের সন্তান, অমর আত্মা। স্বর্গরাজ্য তোমাদের ভেতরেই আছে। আমি ও আমার পিতা একই। এই আত্মোপলব্ধির পথেই আমাদের সকলের মুক্তি। কস্তুরীমৃগের মত কথাগুলোর সৌরভ তার চেতনার মধ্যে ছড়িয়ে গেল।

মার্গারেটের খুব আশ্চর্য লাগল, ভারতের হিন্দু সন্ন্যাসী এমন করে তাকে আচ্ছন্ন করল কি করে। তাঁকে তো চোখেই দেখিনি, বক্তৃতাও শোনেনি, খবর কাগজের পাতাতে যেটুকু জানা যায় তার বেশি জানে না। তবু মনে হচ্ছে ছবিতে দেখা আল খাল্লা পরা সেই মানুষটা হাসি হাসি মুখে চেয়ে আছে তার দিকে। বাইবেলে তার আর মন নেই। নিস্তরঙ্গ সময় প্রবাহের মধ্যে তার মনটা উত্তাল। প্রতিমুর্হূত আলোড়িত হচ্ছিল তার ভেতরটা। তার আবর্ত থেকে একটা তীব্র তীক্ষ্ণ অনুভূতি ওঠে এল। বর্তমানের মধ্যে স্থির থাকতে দিল না তাকে। সুদূর অতীতের মধ্যে সে নিজেকে দেখতে লাগল।

মার্গারেটের মনে পড়ল না সেটা কোন মাস, কোন দিন। তবে সেই প্রথম বাবার ভারতর প্রত্যাগত এক ধর্মযাজক বন্ধুকে দেখল তাদের টরেন্টন বাসগৃহে। তখন তার বয়স আট বছর। বিশ বছর আগের মার্গারেটের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছে। কুয়াশার মধ্যে ফুটে ওঠেছে আট বছরের বালিকার শরীর। বড় বড় নীল ধূসর জ্যোর্তিময় চোখ দুটি-নীল আকাশের উজ্জ্বল তারার আলোর মতই দ্যুতিময়। হাল্কা সোনালি পিঙ্গল কেশে লাবণ্যের ছটা! রোগা গড়নের শুভ্রবর্ণা মেয়েটি আঠাশ বছরের মার্গারেটের মধ্যে ভীষণভাবে বর্তমান। বিশবছরের মধ্যে একবারও সেকথা মনে হয়নি। ও কি আর এক মার্গারেট! চেহারাটা তার পুরনো হয়ে গেছে কিন্তু সত্তা, ব্যক্তিত্ব, মন? সময়ের অতীতে

যা কিছু ঘটেছিল জীবনে সে তো ব্যক্তিত্ব বিকাশের খতিয়ান। আঠাশ বছরের মার্গারেটের মনকে স্পর্শ করে আছে সেই অতীতটা। বিশ বছর পরে হঠাৎ সেই বিস্মৃত স্মৃতির দীপটা জ্বলে ওঠল। মার্গারেট স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল টরেন্টনের গ্রামে তাদের সাদামাটা বাড়ির বারান্দায় ডেক চোয়ারে মুখোমুখি বসে আছে স্যামুয়েল আর তার ভারত প্রত্যাগত বন্ধু ধর্মযাজক। দু'খানা লম্বা বেঞ্চে বসে ছিল কিছু গাঁয়ের লোক, স্যামুয়েলের অনুরাগী এবং ভক্ত। ধর্মযাজক কাকা ভারতবর্ষের গল্প বলছিল। আর শ্রোতারা উন্মুখ হয়ে শুনছিল। এমন সময় ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম সাজিয়ে মার্গারেট সেখানে এল। টিপাইর ওপর সন্তর্পনে ট্রে'টা রাখল। তারপর নিজের হাতে চা ঢালতে লাগল কাপে।

স্যামুয়েল বন্ধুকে উদ্দেশ্য করে বলল ঃ আমার কন্যারত্ন। গোটা সংসারটাকে একা সামলাচ্ছে।

মার্গারেট লজ্জা পেয়ে বলল ঃ বাবা, তুমি যেন কী!

স্যামুয়েল হেসে বলল ঃ মার্গারেট ইনি হলেন আমার বন্ধু। আমার মত ধর্মযাজকের বৃত্তি নিয়ে ও ভারতবর্ষে ছিল। ইংলন্ডে ফিরেই আমাকে দেখতে এসেছে।

বড় বড় নীলচোখ মেলে মার্গারেট অগাধ বিস্ময়ে তাঁর নতুন আঙ্কেলকে দেখল। ভারতবর্ষের নামটা খবর কাগজে অনেকবার দেখেছে। কিন্তু ওই আজবদেশ সম্পর্কে কিছু জানে না। জানার কৌতূহল হল। বলল ঃ ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। কেমন দেশ? ঠাকমার মুখে শুনেছি আর্য়ল্যান্ডের মতই এক দুর্ভাগা দেশ। ইংলন্ডেরই একটি অধিকৃত রাজ্য। কিন্তু অনেক দূরে!

আঙ্কেল ধর্মযাজক বলল ঃ না মেয়ে। সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে জাহাজে পৌঁছতে সে দেশে এক মাসেরও বেশি সময় লাগে।

অত দূরের দেশ ভারতে ইংলন্ড রাজ্য স্থাপন করল কী করে?

পৃথিবীর তিন চতুর্থাংশ ভূখণ্ড তো ইংলন্ড একা শাসন করছে। করবে না কেন বল? স্বেচ্ছায় নিজের দেশকে যদি কতিপয় মাতব্বর মানুষ নিজের স্বার্থে ইংরেজকে শাসন করার অধিকার দেয়, তাহলে সে দেশের প্রভু হয়ে বসা তো ইংরেজের কোন অন্যায় নয়।

মার্গারেট মুখ নিচু করে মন দিয়ে পেয়ালায় চা ঢালছিল। কাপটা বাবার বন্ধুর হাতে দিয়ে বলল ঃ আঙ্কেল চা। কাপে চুমুক দিতে দিতে ভারতবর্ষের গল্প বলুন।

একটা মোড়া টেনে মার্গারেট নতুন আঙ্কেলের সামনে বলল। চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে সন্তর্পণে ঠোঁট রাখল। বেশ একটা লম্বা টান দিয়ে আরাম সূচক শব্দের সঙ্গে উচ্চারণ করল চমৎকার। তোমার হাতে জাদু আছে মা। চায়ের দেশ ভারতবর্ষে এমন সুস্বাদু চা পান করিনি।

মার্গারেট বিব্রত লজ্জায় মাথা হেঁট করল। স্যামুয়েল উদ্দীপ্ত হয়ে বলল ঃ মা আমার সাক্ষাৎ মেরী। সংসারের অভাব, দারিদ্র্য, কষ্টকে হৃদয়ের মাধুর্যে ভরে রেখেছে। ঠিক আমার মায়ের মতো। মায়ের নামে নাম মিলিয়ে ওর নামও মার্গারেট এলিজাবেথ রেখেছিল।

মার্গারেট আদুরে গলায় বলল ঃ বাবা! আঙ্কেল, ভারতবর্ষের সম্পর্কে কি যেন বলছিলেন?

এক অদ্ভুত দেশ ভারতবর্ষ। এর সভ্যতা সংস্কৃতি প্রাচীন। এখানকার মানুষগুলো বড় নিরীহ, আর ভাল। ভীষণ শান্তিপ্রিয় জাত। অশান্তি ভয়ে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলে। সকলের সঙ্গে মিলে মিশে শান্তিতে বসবাস করে। আমার দেশ আমার জাতি-এই বোধটা একেবারে নেই। স্বাধীনতা সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই। দেশের শাসক কে হবে তা নিয়ে কোনো মাথা ব্যাথা নেই। ইংরেজের কৃপা পেলে ধন্য হয়ে যায়। সেজন্য ধনীরা, শ্রেষ্ঠীরা, রাজন্যবর্গ যে কোন মূল্য দিতে প্রস্তুত। নিজেদের সুখ এবং নিরাপত্তার জন্য বিদেশীর হাতে দেশের শাসনভার তুলে দিয়ে সত্বভোগ করতে পারলেই তারা খুশি। ইংরজেরাও বিনিময়ে ভারতবর্ষের ধন, সম্পদ যথেচ্ছভাবে লুণ্ঠন করে নিজের ও দেশের ধনের ভাণ্ডার ভরে তুলছে। অথচ, সেজন্য কোথাও কোনো প্রতিরোধ নেই। দেশের নাগরিকদের অসহিষ্ণুতা বিদ্রোহে রূপন্তরিত হয় না। বড় আত্মসন্তুষ্ট জাত। নিজের সুখ নিজের স্বার্থ, নিজের শান্তিটুকু নিয়ে মগ্ন। দেশ, জাতীয়তা, নাগরিক দায়িত্ব, কর্তব্য সম্পর্কে ভারতবর্ষের মানুষ একটুও সচেতন নয়। স্বাধীনতা নীলাম করার জন্য তাদের কোন অনুশোচনা নেই, পরাধীন হওয়ার জন্য নেই কোন কাতরতা।

মার্গারেট স্তম্ভিত হয়ে গেছিল। নিজের মনের ভেতর তার অনেক প্রশ্ন — স্বদেশ, স্বজাতিকে ভালোবাসে না-এমন দেশ হয় পৃথিবীতে! স্বার্থহীন প্রানে আত্মনিবেদন করতে পারে এমন সন্তান যে দেশের মাটিতে জন্ম নেয় না, সে দেশের মত দুর্ভাগা দেশ হয় না। নাভিমূল থেকে ওঠে আসা একটা বিষণ্ণ লম্বা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে কথাগুলো পাক দিয়ে দিয়ে মনের মধ্যে গুঞ্জিত হতে লাগল শুধু। সখেদে উচ্চারণ করল ঃ আঙ্কেল, ভারতবর্ষ সত্যিই দুর্ভাগা। তার হতভাগ্য সন্তানেরা মানুষ হয়ে ওঠেনি। তারা ঘুমিয়ে আছে। ওদের জন্য করুণা হয়।

স্যামুয়েলের বন্ধু পাদরীর অধরে স্মিত হাসি। সস্নেহে বললঃ তোমার উতলা হওয়ার কিছু নেই মা। ভারতবর্ষ তার নিজের পথেই চলবে। সেজন্য তাকে হয়তো আরো অনেকদিন অপেক্ষা করতে হবে। অনেক মূল্যও দিতে হবে। বিনামূল্যে কিছু কি পাওয়া যায় মা?

আঙ্কেল ভারতবর্ষ আমি দেখিনি। কিন্তু তার নাম শুনেই সে দেশের প্রতি কেমন একটা মমতা অনুভব করছি। ওদেশের মানুষের ঔদাসীন্য এবং স্বার্থপরতা দূর করার জন্য ভারতবর্ষের একজন ধর্মযাজক হয়ে তুমি কী করেছ আঙ্কেল।

আমি খৃষ্টধর্মের সেবক। অসহায়, উৎপীড়িত মানুষকে খৃষ্টের সেবক করাই আমার কাজ। ভারতের কোনে কোনে যীশুখৃষ্টের নাম ও ধর্ম পৌঁছে দেয়ার ব্রত আমার। রাজার প্রাসাদ থেকে দরিদ্রতম অপাক্তেয় অসহায়, আশ্রয়হীন মানুষের গৃহে খ্রীষ্টধর্মকে পৌঁছে দেয়াই আমার কাজ।

আঙ্কেল, তাতে ভারতবর্ষের মানুষের কী উপকার হল? তারা তো যে তিমিরে ছিল সেই তিমেরই থাকল। নিজের ভালো বোঝে না এ কেমন মানুষ। আঙ্কেল, যে মানুষ নিজেকে রক্ষা করতে পারে না তাকে বাঁচাবে কে? তুমি একজন ইংরেজ ধর্মযাজক, তোমার কোনো কর্তব্যই নেই।

স্যামুয়েলের পাদরী বন্ধু কথা খুঁজে পেল না। মুগ্ধ চোখে মার্গারেটের দিকে চেয়ে বলল ঃ স্যামুয়েল তোমার মেয়ের মত এমন স্বতস্ফূর্ত ভারতপ্রীতি ভারতীয়দেরই নেই। অথচ, সে দেশ দেখল না, জানল না তার মানুষদের প্রতি ওর দরদ সহানুভূতি আমাকে অভিভূত করে।

ধর্মযাজক আঙ্কেল কথাগুলো তার বালিকা মনকে আপ্লুত কিংবা অভিভূত করেনি। নিতান্তই সাধারণ ভালো লাগার সৌজন্যসূচক কথা। মনকে নাড়া দেয়নি। কিংবা ভূলেও কোনো কালে স্মরণ করেনি। তথাপি, অবচেতনের গভীরে কথাগুলো যে ভীষণভাবে সুপ্ত ছিল বিশ বছর পরে হঠাৎই সেই হারানো কণ্ঠস্বর তার সমস্ত শ্রবনেন্দ্রিয়ের মধ্যে সজাগ হয়ে উঠল। অতীত ও বর্তমানের মধ্যে কোনো ফাঁক নেই। ঈথারে পূর্ণ। ঈথার কী জিনিস মার্গারেট জানে না। তবু সে-ই নিশ্চয় অদৃশ্য হাতে তাদের মধ্যে যোগাযোগ ঘটচ্ছে ; না-হলে বিশবছর পরে এতবেশি করে মনে পড়বে কেন? এই প্রথম মনে হল কাল দ্রুতগতিতে অতীতের মধ্যে শুধু বিলীন হয় না পুরনোকে নতুন করে। অতীতে যা কিছু ঘটে তা শুধু ঘটনা কিংবা জীবনের অভিজ্ঞতা নয়, বাস্তব অনুভূতি। মনের মণিকোঠায় তার স্পর্শ লেগে থাকে। শান্ত স্রোতহীন স্থির জীবনের মাঝখানে হঠাৎই একটি লোষ্ট্রপাত যে তরঙ্গ বলয় সৃষ্টি করে অনেকক্ষণ ধরে তার আবর্ত হতে থাকে। তেমনি একটা আবর্ত সৃষ্টি হয় তার মনের মধ্যে। চোখ বন্ধ করে দেহটা চেয়ারে এলিয়ে দিল। নিজেকেই প্রশ্ন করল ঃ এই চিন্তায় হঠাৎ মনটা এমন আকুল হল কেন? এর সঙ্গে বর্তমানের সম্পর্ক কি? মন সত্যই কী চায় তার কাছে।

চটি জুতোর শব্দে চোখ দেখল মা দরজার কপাটে হাত দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। ফায়ার প্লেসের মরা আলোয় তার নীল বর্ণের ধূসর

তারা দুটো স্পষ্ট দেখতে পেল মেরী ইসাবেল। আস্তে আস্তে চেয়ারের ধারে এসে দাঁড়াল। ভয়ে ভয়ে বলল ঃ রাত হয়েছে। এবারে ঘুমুতে যাও। এভাবে রাত জেগে পড়াশোনা করলে শরীর ভেঙে পড়বে। তোর কোথায় কষ্ট, কতরকমের ব্যথায়-বেদনায় বুকের ভেতরটা জ্বলছে মায়ের চেয়ে বেশি কেউ জানে না। কিন্তু তবু কিছু মানিয়ে নিতে হয় জীবনে! মনের কষ্টের সঙ্গী বই হয় না। মন তাতে আর্ত হয়।

মার্গারেটের দু'চোখ সহসা জলে ভরে যায়। যথাসম্ভব নিজেকে সংযত করে স্বপ্নাচ্ছন্ন গলায় বলল ঃ বাবার বন্ধু ভারত প্রত্যাগত ধর্মযাজকের কথা তোমার মনে আছে?

ভুরু কুঁচকে ইসাবেল বলল ঃ বাবার বন্ধু!

হাঁ টরেন্টনের গ্রামে যখন থাকতাম বাবাকে দেখতে এসেছিলেন। হঠাৎই তাঁকে খুব বেশি করে মনে পড়ছিল। বিশ বছর পরে তার জন্য ব্যাকুলতা অনুভব করলাম। কেন জানি না, ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর কথাগুলো সময়ের সমুদ্র পেরিয়ে আমার বুকে জলপ্রপাতের কল্লোল হয়ে বাজছে। কী আশ্চর্য! তাঁর প্রত্যেকটি কথা আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি ; স্যামুয়েল তোমার এই মেয়ের ভারত প্রীতির মধ্যে কোনো ফাঁক নেই। মনে হচ্ছে, রক্তের কল্লোলে আমি তার কথাগুলো নতুন করে শুনতে পাচ্ছি। কেন যে এমন হয়-কে জানে?

তার কথা শুনে ইসারেলের বুকের ভেতরটা কিরকম থরথর করে কেঁপে গেল। মাথার ওপর ছাদ না থাকলে মানুষ যেমন অসহায়বোধ করে আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে তার অবস্থাও সেরকম হল। কিন্তু অল্প আলোর জন্য মার্গারেটের তা চোখে পড়ল না। মৃদু ধমক দিয়ে ইসাবেল বলল ঃ ওসব কথা ভেবে রাতের ঘুম নষ্ট করে কেউ? পাগলী মেয়ে! জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যার কোনো সার্থকতা নেই বাস্তব জীবনে।

অথচ সেই অবাস্তব অনর্থক ঘটনাগুলো দিয়েই মানুষের ভাবনার জগৎটা তৈরি। আজ মনে হচ্ছে। নিজের মধ্যে মানুষই একমাত্র বিশ্বরূপ দেখার অধিকারী। জান মা আমার সামনে কোনো অতীত নেই, বর্তমান নেই। অগ্র পশ্চাত নেই। সব মিলিয়ে এক অখণ্ড আমি শুধু আছি। উজ্জ্বল নীলাকাশে কালপুরুষের মত দাঁড়িয়ে আমার পথের নির্দেশ দিচ্ছে।

ইসাবেল, রীতিমত মেয়েকে শাসন করে বলল ঃ আর কথা নয়। এবার লক্ষ্মী মেয়ের মত শুয়ে পড়। ভোর হতে বেশি দেরী নেই।

আমার কথার জবাব হল না মা।

সব কথার জবাব হয় না।

মা,

ইসারেল চেয়ার থেকে জোর করে তাকে টেনে তুলে বলল ঃ এখন ঘুমোতে যাও। এখন তোমার কোনো প্রশ্নের উত্তর দেব না। কিছুতে না। জেদাজেদি করলে মিথ্যে কথা বলব।

মার্গারেট আদুরে গলায় বলল ঃ সত্য যত কঠিন হোক, আমার মা কখনও মিথ্যে বলবে না। কথাটা বলা শেষ করে মায়ের গালে চুমু দিল।

ইসাবেলের স্বর কঠিন, স্নেহলেশ শূন্য। বলল ঃ এলিজাবেথ কি হচ্ছে? ছাড়। সব কিছু নিয়ে কি জবরদস্তি করা যায়? নিষ্ঠুরতার একটা সীমা আছে!— নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সশব্দে তার ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল।

পরেরদিন ঠিক ঘুম ভাঙল মার্গারেটের। সকাল সকাল স্নান করা মার্গারেটের অভ্যাস। স্নানঘরে ঢুকলে একটু বেশি সময় লাগে তার। চৌবাচ্চা ভর্তি জলের সামনে দাঁড়িয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ। নৈঃশব্দকে অনুভব করার ওই মন থাকে না সকলের। যাদের আছে, তন্ময়তার ঐ সময়টুকু বোধ হয় স্নানের সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্ত। সব সৌন্দর্যের শেষ থাকে। ফুরিয়ে যায় এক সময়। ফুরিয়ে যাওয়ার আগে নৈঃশব্দের শব্দহীন মৌন ভাষার অনুভূতি বিদ্যুৎ চমেকর মত এক তীব্র ভালোলাগায় হঠাৎই হৃদয় বাঁধা পড়ে। খুশিতে ভরে যায় ভেতরটা। মগ ভর্তি জল উপর্য্যুপরি গায়ে ঢালতে ভীষণ ভালো লাগে তখন।

দরজা বন্ধ থাকলেও স্নানঘর থেকে মার কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিল। কাজের ফাঁকে ফাঁকে চলতে ফিরতে মেরী ইসারেল মুখস্থ বুলির মত বার বার আওরে যাচ্ছিল ঃ ওরে মে ওঠে পড়। অনেক বেলা হয়েছে মা। হাঁরে রিচমণ্ড তোকে বাজারে যেতে হবে, ঘরে আনাজ নেই। আর দেরি করিস না বাবা। ও মার্গারেট এখনও স্নান হয়নি তোর। একটা বাথরুম। এতক্ষণ আটকে থাকলে অন্যেরা কখন করবে? ব্রেকফাস্ট দেয়া হয়েছে। চা বসিয়েছি। এবার দয়া করে বেরোও। তোমাদের জন্য বকর বকর করে আর পারিনা। একা-কতদিক সামলাই বলত?

সোনালী চুলের ওপর তোয়ালে ঘষতে ঘষতে বাথরুম থেকে বেরোল মার্গারেট। একগাল হেসে মাকে জড়িয়ে ধরে বলল ঃ তুমি আমাদের সোনা মা। সারাজীবন আমাদের দিয়েছ শুধু। অনেক কিছু দিয়েছ এই জীবনে। এখনও দিচ্ছ সুখ, আরাম, স্বাচ্ছন্দ্য, স্নেহ, মমতা, দয়া, করুণা, ভালোবাসা! কিন্তু আমরা সন্তান হয়ে তোমাকে কি দিলাম?

মেরী ইসাবেল অবাক মুগ্ধতায় মার্গারেটের দিকে চেয়ে থাকে। চিবুক ধরে আদর করল, চুমু খেল। সস্নেহে বলল ঃ তোরাও অনেক দিয়েছিস মা। তোদের ভালোবাসায়, শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে আমার পাওয়ার ঘর ভরে গেছে। আমার কোনো ক্ষোভ, দুঃখ্যু নেই। সন্তানদের কাছে এমন করে আদর খাওয়া আর আদর

পাওয়া এক রোমান্টিক ব্যাপার। মিছে মিছে সময় নষ্ট হচ্ছে। একটু পরেই নাকে মুখে গুঁজে তো স্কুলে ছুটতে হবে।

জীবন ভোর আমরা সবাই ছুটছি। রাত পোহাল তো আবার চলা শুরু হল। এমন করে জন্মাবার পর থেকে হাঁটা শেখা, বড় হওয়া, জ্ঞান হওয়া থেকে চলেছি তো চলেছি—কাজে, ছুটিতে, জাগরণে, ঘুমে। একটানা এই দীর্ঘ পথ চলা বড় ক্লান্তিকর, একঘেয়ে এবং যন্ত্রনাকর। ভালবাসা স্নেহ, মমতা, সমবেদনা, সহযোগিতা আমাদের নতুন করে প্রাণ দেয়। আমাদের নবীকৃত করে-তাই না মা!

ইসাবেল মুখ টিপে হেসে বলল ঃ তোর মত এত গভীর করে মন আলো করা কথা বলতে পারি না আমি।

মার্গারেট ব্রেকফাস্টের-ডিশে মন-সংযোগ করল। একগুচ্ছ রডোড্রেন জানলার ধারে ফুটে আছে। মন্থর বাতাসে ফুলের স্তবক মৃদু মৃদু আন্দোলিত হচ্ছে। জানলা দিয়ে ঘননীল আকাশ চোখে পড়ছে। একটা বাজপাখী একা একা উড়ছে। গোটা আকাশখানা সে একাই পাক দিয়ে বোড়াচ্ছে। তার ধারে-কাছে কেউ নেই। একেবারেই একা। অত নীলের মধ্যে যে কী খুঁজছে কে জানে? নীল তো রঙহীনতা। রঙহীনতার মধ্যে কোন্ রঙ খুঁজে বেড়াচ্ছে সে? মার্গারেটের হঠাৎই মনে হলো হিন্দু সন্ন্যাসীর মত সোনালী ডানার বাজপাখীও একা। সন্ন্যাসীর কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। ত্রস্তে বেসিনে গিয়ে হাত মুখ ধুলো।

মেরী ইসাবেল তার দিকে চেয়ে বলল ঃ দুধটুকু কার জন্যে ফেলে রাখলি আবার? ওটুকু খেয়ে আমায় উদ্ধার কর। কথাগুলো বলতে বলতে গ্লাসটা তার মুখে ধরল। ঢক্ ঢক্ করে নিঃশেষে পান সমাপ্ত করে বাইবেল নিয়ে টেবিলে বসল। মনটা যখন বেশি অশান্ত হয় তখন বাইবেল পড়লে মন গভীরতায় প্রশান্ত হয়। অনাবিল সুখে হৃদয় মন ভরে যায়। বাইবেলের সঙ্গে তার আবাল্যের সম্পর্ক। বাইবেল তার নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে, বিশ্বাসে-সংস্কারে, শ্রদ্ধায় এবং ভক্তিতে এমন ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে যে, তার একটু ছোঁয়াতেই মনই নির্মল হয়। সে যে আইরিশ ধর্মযাজক পরিবারের মেয়ে এই বোধে অনুভাবিত হয়ে এক অন্য মানবীতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। খৃস্টান কালচার, বিশ্বাস এবং সংস্কারের মধ্যেই সে বড় হয়েছে। পিতামহ, পিতা দু'জনেই ধর্মযাজক। পড়াশুনাও করেছে পাদরীদের স্কুলে। জ্ঞান হওয়া থেকে বাইবেল তাকে মহৎ চিন্তায় এবং মহত্তম আদর্শে পরিপূর্ণ করে। সমস্ত বোধশক্তিকে চারদিক থেকে আবৃত করে রেখেছে। এর বাইরের জগতে যে অনন্ত আনন্দ বিরাজমান তার স্বরূপকে উপলব্ধি করা এবং প্রকাশ করাই হল আত্মার মুক্তি। তার প্রকাশের বাধাতেই দুঃখ। সেখানেই তার পাপ। এই অদ্ভুতবোধ মনটাকে তার বড় করে দিল। 'দি এশিয়ান লাইট'-এ বুদ্ধের জীবন ও বাণী মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকে এতবড় করে দেখল যে

মার্গারেটের বুদ্ধিদীপ্ত মনটা তার প্রতি আকৃষ্ট হল। বুদ্ধের মুক্তি সাধনাই ছিল স্বার্থ, ক্রোধ ও অহঙ্কার ত্যাগের সাধনা—ক্ষমায়, প্রেমে, দয়ায়, মানবিকতায় সুন্দর হওয়ার সাধনা। এই মহৎ উপলব্ধির মধ্যে কোন সঙ্কীর্ণতা নেই ; সমস্তকেই সে সত্যময় করে, পূর্ণতম করে। নিজেকে পূর্ণের মধ্যে সমর্পণ করার কোনো বাধাই মানে না। হঠাৎ এই অনুভূতিতে তার মন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। বাইবেলটা তার হাতেই ধরা রইল শুধু। চোখ দুটো ছিল বাইরের দিকে। গাছের ডালে পাখি ডাকছে নিজের খুশিতে। কে তার গান শুনল, না শুনল তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই।

দু'সাল আগের কথা বলেই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মনে পড়ছিল। সব দৃশ্যই সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল। উৎসুক, কৌতূহলী মনটা কেবলই হিন্দু সন্ন্যাসীর সঙ্গে নীরবে নিভৃতে গড়ে ওঠা সম্পর্কসূত্রগুলিকে অন্বেষণ করছিল। আর একটার পর একটা ঘটনার মধ্যে প্রবেশ করছিল। আশ্চর্য দু'বছরের ভেতর একবারও এত গভীর করে নিজেকে তন্ন তন্ন করে দেখার দরকার হয়নি। ভারতবর্ষের কাজে রাজা তাকে আহ্বান করেছে। তার উপস্থিতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। সহকর্মী হওয়ার অধিকার দিয়েছে তাকে। চুপ করে থাকা তার মুস্কিল হল। বর্তমানের মধ্যে কিছুতে স্থির থাকতে পারছিল না। বারে বারে তার সমস্ত অনুভূতির মধ্যে ; উপলব্ধির গভীরে, বিভিন্ন ঘটনা সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালার মধ্যে নিজের আত্মাকে খুঁজছিল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখার মত রোমাঞ্চকর সে অনুভূতি। অজান্তে মন ভেসে যায় কোন সুদূরে।

বহুবছর মাড়িয়ে মার্গারেট তার ছোটবেলার দিনগুলোর মধ্যে ফিরে যাচ্ছিল। কিসের টানে যে অতীতচারণ করছিল নিজেও জানে না।

এখন মার্গারেটের বয়স আঠাশ। কম দিন হল না। অতদিনের সব কথা মনে থাকার নয়। তবু মাঝে মাঝে খুব ইচ্ছে হয় গোটা অতীতটাকে মনে করতে।

মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজনের মুখে শোনা ছোটবেলার কথা মনে করতে না পারলে কতখানি এগোল এতবছর ধরে তার পরিমাপ করা যায় না। একজন মানুষ -তো জীবন ভোর পথ চলে কোনো কিছু প্রত্যাশা নিয়েই। কিন্তু প্রত্যাশার কথাটা গভীর করে টের পায় না। কিন্তু নিজের অজান্তে, নীরবে নিভৃতে নিজেকে অবিরাম সৃষ্টি করে চলে মানুষ। বিধাতার মত সেও যে একজন স্রষ্টা মার্গারেট এই প্রথম অনুভব করল। তার ভেতর এই সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা তাকে স্থির থাকতে দেয় না। প্রতিদিনের নানা ঘটনার মধ্যে অজান্তে সে কিভাবে আর এক মানুষ হয়ে ওঠল অতীতের মধ্যে তাকেই খুঁজল। এই অয়ন পথটা সে নিজেও ভাল করে জানে না। মার্গারেটও বোঝে না অলক্ষ্যে তার আয়োজনটা কী করে কী হল। এখনও অনেক পথ চলা আছে জীবনে। সব পথটুকু পাড়ি না দেয়া পর্যন্ত কেউ জীবনের রূপরেখাটা সম্পূর্ণ সফল বলে দাবি করতে পারে না। তবু মুক্তির স্বাদ নিতে যতটা পথ পরিক্রমণ করলে বুকের মধ্যিখানে তার স্মৃতিটুকু থাকে, তার দাবিদার হতে না পারলে পথশ্রান্তি বেশি বোধ হয়। এই অনুভূতির কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে মার্গারেট তার শৈশবকে কল্পনায় দেখতে লাগল। এ সবই বড় হয়ে পরিবারের লোকজন এবং আত্মীয়স্বজনের কাছে শুনেছিল সে। কী আশ্চর্য সেই সব বিচ্ছিন্ন ঘটনা একটার সঙ্গে একটা গ্রথিত হয়ে সময় প্রবাহে মনের মধ্যে উত্তাল হয়ে ওঠল। আর সে একটার পর একটা ঘটনার মধ্যে প্রবেশ করল। সে চলেছিল ভবিষ্যতে নয়, বর্তমান থেকে অতীতে।

চার বছরের শিশু মার্গারেটকে সে দেখতে পাচ্ছিল উত্তর আয়র্ল্যান্ডের ডানগ্যানন শহরের ছোট্ট বাড়িতে। কী আশ্চর্য! কল্পনায় দেখছিল ; নীলাসের গলা জড়িয়ে মুখের ওপর মুখ রেখে আদর করছে। আর সেই মুহূর্তে নীলাসের ভেতর কীসব ঘটে গেল। অপত্যস্নেহ হঠাৎ উৎসারে ফোয়ারার মত ফির্নকি দিয়ে বেরিয়ে এল। এক দারুণ মুগ্ধতায় তাকে বুকে টেনে নিল। চিতল হরিণী যেমন বর্ষার তাজা কোমল ঘাসে মুখ ডুবিয়ে দেয় তেমনি নীলাসও তার কচি কোমল শরীরে মুখটা চেপে ধরে গায়ের ঘ্রান নিল। আর এক অসামান্য সুখের ভেতরে ডুবে যেতে যেতে বলল ঃ আমার মিষ্টি দিদিভাই! আমার মানিক, আমার সোনা।

একটা ছোট্ট আনন্দের বিদ্যুৎ মার্গারেটের শরীর মনের ভিতর এক মুহূর্তের জন্য ছুঁয়ে গেল। চব্বিশ বছর আগেকার অনুভূতিটা ঠিক আজকের মত হয়েছিল কিনা মার্গারেটের জানা নেই। তবে বুকে তোলপাড় করা একটা কিছু হয়েছিল বলেই আজও তার স্পর্শটা হৃদয়ে লেগে আছে। অথবা তার কৌতূহলী, উৎসুকী মনটা নতুন করে মনের অভ্যন্তরে তাকে সৃষ্টি করেছে। যে কাল পিছনে ছিল, সে কাল সম্মুখে ফিরে আসাটাও কালের সৃষ্টি। কাল শুধু পুরোনোই হয় না, পুরনোকে নতুনও করে।

স্মৃতির অবচেতনের গভীরে মার্গারেট যাকে নির্বাসনে পাঠিয়েছিল, চব্বিশ বছর বাদে স্মৃতিসত্তায় নতুন করে ফিরে এল। নীলাসের গলা শুনতে পাচ্ছিল মার্গারেট। পরিচিত নাম এবং মুখগুলি একে একে মনে পড়ল। বুকে একটু একটু করে ধাক্কা লাগছে। আর একটার পর একটা ঘরের খিড়কী খুলে যাচ্ছে যেন। বাইরের আলো ভিতরের অন্ধকারকে খান খান করল। দপ করে স্মৃতির দীপ জ্বলে ওঠল। বহু বছর মাড়িয়ে তার ছোটবেলার দিনগুলোর মধ্যে ফিরে যাচ্ছিল। কিসের টানে কেন যে অতীত চারণা করছিল নিজেও জানে না।

মার্গারেট নিজেকে দেখতে পাচ্ছিল ডানগ্যান শহরে তাদের বাগানবাটিতে। ফুল আর বাহারী গাছ দিয়ে সাজানো বাগান। তার খুব প্রিয় জায়গা। রোজ ঠাকমার সঙ্গে গাছের তদারকি করে। ফুলের পাঁপড়ির ওপর গাল রেখে শাসন করে। তাদের সঙ্গে কথা বলে। লতানো গাছগুলো তার অভিভাবকত্ব মানে না বলে আদর করে। কচি ডগাটা ধরে সোহাগও জানায় আবার। পাপড়ির ওপর কোনো প্রজাপতি বসলে মার্গারেট তর্জনী তুলে শাসন করত। নিজের মনে বক বক করত। ধরার জন্য পিছুন পিছুন তাড়া করে বেড়াত উদ্যানময়। লুকোচুরি খেলায় প্রজাপতি ধরা না দিলে খুব রাগ আর অভিমান হত তার। সারাক্ষণ দৌড়ে ক্লান্ত হয়ে ঘাসের ওপর হতাশ হয়ে বসে পড়ত। ফ্যাল ফ্যাল করে অসহায় চেয়ে থাকত। এই উদ্যানের সব অতিথির সঙ্গে তার ভাব। তাকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য নাইটিংগেল পাখিরা কালরব জুড়ে দিত। সবুজ ঘাসের ওপর রাজহাঁসেদের সঙ্গে পাখিদের খেলাটা ভীষণ উপভোগ করত। হাঁসেরা প্যাঁক প্যাঁক করে পাখির দিকে তেড়ে গেলে তারা উড়ে একটু তফাতে গিয়ে মজা করত। তারপর খেলার মজাটা যখন ফুরিয়ে যেত তখন উড়ে যেত আকাশপানে। খেলাটাকে এইভাবে মাঝপথে মাটি করে দিয়ে ভেগে পড়ার জন্য রাজহাঁসগুলো হতাশ হয়ে করুণ চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকত তাদের গন্তব্যপথের দিকে। মার্গারেটের মনটাও তাদের মতই খারাপ হয়ে যেত। এসব দৃশ্য রোজই দেখে, তবু একঘেয়ে কিংবা পুরনো হয় না তার কাছে। প্রতিদিন নতুন করে উপভোগ করত তাকে। ফুলের সুবাস, প্রজাপতির রঙ বাহারী ডানা, পাখির কাকলির রহস্যময় আকর্ষণে প্রকৃতিলোক পরিপূর্ণ। বিধাতার প্রসাদেই পৃথিবীটা এত সুন্দর। এরকম একটা অনুভূতিতে তন্ময় হয়ে বিকেলের আকাশ দেখছিল। পশ্চিমের আকাশে তখন সবে লালের ছোপ লেগেছে।

তাকে খুঁজতে উদ্যানে এসেছিল নীলাম। চাপ চাপ ঘাসের ওপর ধ্যানস্থ প্রতিমার মত বসেছিল। পরনের সাদা স্কার্টের ঘেরটা গোলাকৃতি হয়ে এমনভাবে ঘাসের ওপর বিছানো ছিল মনে হচ্ছিল শুভ্র পদ্মের ওপর দেবী ভেনাস যেন, উদ্যান আলো করে বসে আছেন। সৌন্দর্যের দেবীর দুচোখে বিভোর বিহ্বলতা।

অপাপবিদ্ধ চোখের উৎসুক চাহনিতে ভালবাসা এবং মমতার নির্ঝর। ওভাবে তাকে বসে থাকতে দেখে পিতামহী নীলাস থ হয়ে গেল। নাতনীর চোখের ওপর মুগ্ধ দুটি চোখ পেতে রাখল। মনে হল, মার্গারেটের মধ্যে যীশুকে দেখছে সে। সমগ্র সত্তার মধ্যে যীশু এক অদৃশ্য বন্ধনে বাঁধা পড়ে যেন। বোধ হয় চারপাশের প্রকৃতিই ঈশ্বরের এক অদৃশ্য শক্তি সম্বন্ধে সচেতন করছে তাকে। নীলাসের গভীর এক আধ্যাত্মিক অনুভূতি হল। গভীর আচ্ছন্নতার মধ্যে ডুবে যায় কণ্ঠস্বর। অস্ফুট গলায় ডাকল ঃ মার্গারেট। তোকে কোন্ নামে ডাকব আমি? তুই মেরীও না, ভেনাসও না, যীশুও না। তা'হলে কে তুই? তোর মধ্যে ও কার দিব্য প্রভা?

ঠাকমার কথা বাঁধা লাগল তার। বলল ঃ তোমার দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নামছে? কেন-কী হল তোমার! এত ভালবাসা, এত প্রীতি, এত আদর, চতুর্দিকে এত খুশি, এত প্রাণের মেলা-এসব দেখে কী কারো কান্না আসে? চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিলে ঈশ্বরের করুণা, তার অপার মমতা, কানভরা সব সুর অনুভব করবে কেমন করে? মনটা আপনা থেকে দীন হয়ে আসে। মাথা হেঁট হয়ে যায় সেই পরম করুণাময়, অমৃতময় পুরুষের পদতলে। এই অনুভূতির ভেতর যীশুকে পাওয়া হয়।

নাতনীর হাত ধরে উদ্যানটা পাক দিতে দিতে নীলাম থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। মার্গারেটের দিকে মুগ্ধ চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে অনেকক্ষণ। উইলো গাছের পাতার মত শিশু মার্গারেটের নিটোল মসৃণমুখ, তার সরল নিষ্পাপ দুই চোখ নীলাস দেখতে লাগল। বিচলিত কণ্ঠে বলল ঃ কত অসাধারণ জিনিস কত অসামান্য হয়ে ওঠে তোর চোখে। যীশুর অপার করুণা তোকে একদিন মস্ত মানুষ করে দেবে। যীশু বলতেন, আমি বলিদান চাই না, চাই দয়া। মায়া মমতা ক্ষমা ছাড়া দয়া হয় না। তোর বুকে যীশুর দয়া, মায়া আর মমতা।

যীশুর কথা ওঠতেই মার্গারেট বায়না ধরল ঃ ঠাকমা যীশুর গল্প বল। যীশুতো মানুষকে ভালবেসে ছিলেন। তবু মানুষ হত্যা করল তাঁকে। কী দোষে নিহত হল মানুষের প্রাণের ঠাকুর।

নীলাস নিচু হয়ে মার্গারেটের গালে চুমু দিল। আদর করল। হাত ধরাধরি করে ওক গাছের নিচে বসল। শেষ বিকেলের আলো পুণ্যের মত ঝরে পড়ছিল ওদের মুখে। বাতাসে ফুলের সুগন্ধ। নীলাসের মনে হল এসব হয়তো যীশুর ইচ্ছেতে হচ্ছে। অমৃতময় পুরুষের জীবনের স্মৃতিচারণের এক আশ্চর্য মুহূর্ত যেন প্রকৃতি রচনা করেছে। এক মহৎ ও বিশাল অনুভূতিতে আবিষ্ট হয়ে গেল নীলাসের অন্তঃকরণ। অভিভূত গলায় বলল ঃ যীশুর মত মানুষেরা অপরাধ করে না, অপরাধী তাদের করা হয়। যীশু শুধু মানুষের ভাল চেয়েছিল। বিপদে

আপদে, দুঃখে দারিদ্র্যে যে মানুষ অসহায়, জীবজন্তুর মত খেয়ে, না খেয়ে বেঁচে আছে সেই মানুষগুলোকে মানুষের অধিকার এবং গৌরব দিয়ে মানুষের মত বেঁচে ওঠার পথ নির্দেশ করেছিলেন। তাদের অন্তরে ভয়, সংশয়, দ্বিধা, দুর্বলতা জয় করতে বলেছিলেন। মানুষকে যারা অমানুষ করে রেখেছিল তার যীশুকে শত্রু ভাবল। তাঁকে হত্যা করার মতলব আঁটল। কিন্তু সব সময় প্রচুর ভক্ত ঘিরে থাকে তাঁকে। তাদের চোখ এড়িয়ে কিছু করার সুযোগ হচ্ছিল না। অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন করে যীশুকে কথার ফাঁদে ফেলতে চাইল। কিন্তু সুভাষিত বাক্যে যীশু তাদের হতাশ করল। তাদের কথাতেই হারাল তাদের। তবু ষড়যন্ত্র চলতে থাকল। কুৎসা, অপবাদ, মিথ্যের স্তূপে চাপ পড়ে গেল যীশুর-প্রচারিত সত্য।

মার্গারেট নিবিষ্ট হয়ে গল্প শুনছিল। তবু তার কৌতূহলী উৎসুক মনটা হঠাৎই প্রশ্ন করল নীলাসকে ঃ কেন ঠাকমা?

নীলাস তখন যীশুর নাম কীর্তনে বিভোর। নাতনির চোখে চোখ রেখে বলল ঃ মানুষের মন তো। সাদাসিধে সহজ সরল অজ্ঞ মানুষগুলোকে যা বোঝানো যায় তাই বোঝে। তাদের নিজস্ব কোনো চিন্তাভাবনা নেই। কথাগুলো তাদের মনের কথা হলেই হল। পুরোহিতদের প্রতি লোকের আস্থা প্রবল হওয়ার আগেই তাকে বিনাশ করার জন্য পুরোহিতেরা ঐক্যবদ্ধ হল। সাধারণ মানুষের মনে বহুকালের প্রভাবকে তারা কাজে লাগাল। যীশুর কথাগুলো একটু অন্যরকম, একেবারে নতুন। সেগুলো শুনতে ভাল. কিন্তু তাৎক্ষণিক প্রমাণ করা কঠিন। সাধারণ লোকের মনকে বিক্ষিপ্ত করতে এবং যীশুর প্রতি তাদের আস্থা ভাঙতে তাঁর নামে নানা অপপ্রচার, কুৎসা, নিন্দে রটনা করা হল। যীশুও বুঝতে পারলেন মানুষের বিশ্বাসে সন্দেহ, বন্ধুত্বে অবিশ্বাস, প্রেমে বৈরীতা। একদিন মুর্খ জনতা যীশুকে ভয় পেল। অপপ্রচার, মিথ্যের জয় হল। তারাও বলতে আরম্ভ করল যীশুর মধ্যে একটা শয়তান আছে। ভালো মানুষের ছদ্মবেশ ধরে তাদের পাপে প্ররোচিত করছে। মানুষটা শুধু ধর্মদ্রোহী নয়, রাজদ্রোহীও। রাজা হওয়ার লোভে তাদের বিপথে টানছে, ভেল্কিবাজি করে নিজেকে মহিমান্বিত করেছে। নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলে মিথ্যাচার করছে। আশ্চর্য, যীশুর হয়ে একজনও এইসব অভিযোগ খণ্ডন কিংবা মিথ্যে রটনার প্রতিবাদ করল না। অথচ বলতে পারত, শয়তান তাঁকে যখন বলল, তুমি রাজা? যীশু প্রতিবাদ করে বললেন, না আমি মানুষের পুত্র। কিন্তু প্রিয় বারোজন শিষ্যদের একজনও সেকথা বলল না।

যীশু মানব চরিত্র জানেন বলেই আশ্চর্য হলেন না। এজন্য কারও ওপর তাঁর রাগ হল না। আবার ক্ষোভে অসহিষ্ণু কিংবা নির্দয় হল না তাঁর অন্তঃকরণ। ভক্ত এবং অনুরাগীদের মন আকুল করতে কিংবা তাদের অশান্ত চিত্তকে

তাঁর অনুকূলে আনার কোনো চেষ্টা করলেন না। মনের দুঃখে বললেন ঃ এ পৃথিবীতে আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। আমার চলে যাওয়ার সময় হয়েছে। অনেক কিছুই ঘটবে জীবনে। রাজার লোকেরা তোমাদেরও ধরে নিয়ে যাবে, নির্যাতন করবে, কয়েদ করবে। আমার জন্যই তোমরা এসব যন্ত্রণা ভোগ করবে। এটা আমার যেমন দুঃখ, তেমনি এক পরম প্রাপ্তিও বটে। সেদিনই তোমরা অনুভব করবে কোনো কোনো ঘটনা বাইরে থেকে যা দেখায় তাই তার যথার্থরূপ নয়। একই ভালবাসা যা মানুষকে স্বর্গের ছবি দেখায়, তারই আবার এমনরূপ আছে যা মানুষকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে, সম্পূর্ণ ধ্বংস করে। বাইরে থেকে উভয়কে দেখতে একই, যেন দুই যমজ ভাই,—একজন প্রাণ দেয়, অন্যজন হরণ করে। তবু বলছি ভয়ে ভীত হয়ো না মানব, অন্ধকার থেকে সত্যে ফেরা বড় যন্ত্রণার। রাতের পেঁচা দিনের আলো সহ্য করতে পারে না। দিনটা তার কাছে মন্দ। তাই বলছিলাম, সত্যকে চেনার জন্য অনেক মূল্য দিতে হয় জীবনে। বিনা মূল্যে জীবনে কিছু পাওয়া যায় না। সত্যকে তো নয়ই। বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালেই তোমরা বাঁচতে পারবে। যুদ্ধ কিংবা নির্যাতনের কথা শুনে ভয় পেও না। এসব জিনস ঘটবেই। কিন্তু সেটাই পৃথিবীর শেষ অবস্থা নয়। জন্মান্তরের আগের মুহূর্ত। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাক, তাহলে ভয় পালাবে, তোমরাও বাঁচবে।

যীশুর সব আবেদন-নিবেদন নিষ্ফল হল। কেউ শুনল না তাঁর কথা। মজার কথা, যে জনতা-যাজক আর শাস্ত্রীদের মুণ্ডুপাত করে, ভয় পায় ;—তারাই তাদের পক্ষে যোগ দিল। অথচ, এদের মুক্তির জন্য, সুখের জন্য কত কী করলেন যীশু। তবু বিপক্ষে দাঁড়াল তারা। শেষবারের মত অজ্ঞতা থেকে চৈতন্যে ফেরার জন্য বললেন ঃ তোমরা ঘুমিয়ে থাকলে বিশ্বাসঘাতকেরা মানবপুত্রকে হত্যা করবে। তোমরা জাগ, যে মানুষটি আজ কিছুক্ষণের মধ্যে আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, সেই লোকটি তোমার আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তোমরা চোখ বুজে আছ বলেই তাকে দেখতে পাচ্ছ না।

শিষ্যদের সঙ্গে যীশু যখন এসব কথা বলছিল তখন অনেক সান্ত্রী-এসে তাঁকে ঘিরে ধরল। তাদের হাতে ছিল লণ্ঠন, মশাল আর অস্ত্রশস্ত্র। যীশু রহস্যময় দৃষ্টিতে যুদার দিকে তাকাতে তার মুখখানা করুণ দেখাল। যীশু হাসলেন। কৌতুকের হাসি। যীশু একটুও বিচলিত না হয়ে সহজ ভাবেই তাদের জিজ্ঞাসা করল ঃ তোমরা কাকে খুঁজছ?

তারা বলল ঃ নাজারেথের যীশুকে।

যুদা মাথা হেঁট করল এক গভীর অপরাধবোধে। সেই মুহূর্তে যীশুর এক শিষ্য সীমোন তরবারি দিয়ে প্রধান যাজকের চাকরকে আঘাত করল। সেই আঘাতে তার কান কেটে গেল। যীশু স্বস্থানে তার কানটাকে জুড়ে দিলেন।

ততক্ষণে সৈন্যেরা যীশুকে ঘিরে ধরেছিল। তাদের দিকে করুণাঘন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল ঃ আমি কি ডাকাত? আমাকে ধরার জন্য এত লোকজন, তরোয়াল, লাঠি দরকার হল কেন? আমি তো সর্বক্ষণ মানুষের মধ্যে থেকেই তাদের বুকে প্রেমের আলো জ্বালাই। পৃথিবীতে প্রেমের আলো সবচেয়ে জ্যোর্তিময়। অপ্রেমের রাহুর ছায়া যখন প্রেমের আলো ঢেকে ফেলল, চারদিক থেকে অন্ধকার নামল তখনই তোমরা আমাকে কয়েদ করতে পারলে।

বন্দী করে যীশুকে প্রধান পুরোহিতের বাড়ী আনা হল। তখন নিবিড় অন্ধকারে চরাচর ঢেকে ছিল। আকাশে একটি নক্ষত্রও ছিল না। ঠাণ্ডার মধ্যে খোলা জায়গায় রাতটা কাটাতে হল। উঠোনের মাঝখানে আগুন জ্বেলে যীশুকে ঘিরে সকলে আগুন পোহাতে লাগল।

অন্ধকারের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে যীশুর এক শিষ্য পিতরও পিছু পিছু তাঁকে অনুসরণ করেছিল। দলটির সঙ্গে মিশে সেও আগুন পোহাচ্ছিল। আগুনের লকলক শিখার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাবছিল, যীশু তো ধরা পড়েছে এবার কী হবে তার? অথচ, একটু আগে গর্ব করে তাঁকে বলেছিল, প্রভুর সঙ্গে সে জেলে যেতে এবং মরতেও প্রস্তুত।

তার কথা শুনে যীশু হেসেছিল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল ঃ পিতর, তোমার কথা শুনে ভাল লাগল। কিন্তু তুমি যা বললে তা সত্য নয়। তুমি এখনও ভয় জয় করতে পারনি। মনও তোমার তৈরি নয়। সময় যখন আসবে তুমি নিজেও আশ্চর্য হবে। বলা বাহুল্য তার আর দেরী নেই। আজ ভোরের মোরগ ডাকার আগে তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার করে বলবে, আমায় তুমি চেন না। একথাটা তিনবার উচ্চারণ করার পরেই মোরগ ডাকবে।

সত্যদর্শী যীশুর ভবিষ্যৎ বাণী মিথ্যা হল না। যীশু ধরা পড়ায় পিতরের মত দুর্বল প্রকৃতির অনেক লোক নিজেদের অত্যন্ত বিপন্ন এবং অসহায় বোধ করল। অভয় দেবার মত কোনো মানুষ তাদের পাশে থাকল না। এখন নিজেকে যীশুর শিষ্য বলে পরিচয় দেওয়া মুর্খতা। বিপজ্জনকও। তার অনুগামী হওয়ার জন্য হয়তো কোনো কঠিন দন্ড হতে পারে তার। পিতর ভয় পেল। যীশুর ভবিষ্যৎবাণী তাহলে সত্যি হল। মনটা তার ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। থমধরা বিষণ্ণতা নিয়ে হাঁটুর ওপর মুখ গুঁজে সে আগুনের শিখা দেখছিল।

ওদের কথাবার্তার মধ্যে হঠাৎই মহাযাজকের গৃহের একজন পরিচারিকা পিতরের দিকে আঙুল তুলে বলল ঃ হাঁ, এই লোকটিও ওর সঙ্গে ছিল।

পিতর তার কথা শুনে চমকাল। আগুনের প্রজ্বলিত শিখায় চাপ চাপ অন্ধকারে কাউকে ভাল দেখা যাচ্ছিল না। তাই পিতরের চমকানো কারো নজরে পড়ল না। পিতর তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করল। বলল ঃ উঁহু তুমি ভুল করছ?

কাকে দেখতে কাকে দেখেছ তোমার মনে নেই। আমি তো ওঁকে চিনি না। 'আমি চিনি না' বলার সময় গলার স্বরটা একটু কেঁপেছিল।

তৎক্ষণাৎ, অন্য একজন সৈনিক ভাল করে তাকে নিরীক্ষণ করে কেমন একটু দ্বিধাজড়িত সংশয়ে বলল ঃ আমারও মনে হচ্ছে নাজারাথের যীশুর সঙ্গে তোমাকে দেখেছি।

পিতর এবার মুশকিলে পড়ল। মুহূর্তে তার সব দ্বিধাগ্রস্ততা ঝেড়ে ফেলে প্রফুল্লিত হয়ে বলল ঃ না হে না। তুমিও ভুল করছ।

তবু ওদের সন্দেহ দূর হল না। সবাই তার আপাদমস্ত ভাল করে নিরীক্ষণ করতে লাগল তাদের উৎসুক কৌতূহলী, অনুসন্ধিৎসু চোখগুলো অন্ধকারে ভাল করে দেখা যাচ্ছিল না ; দেখতে পেলে বোধ হয় পিতর হাতে নাতে ধরা পড়ত। সময়ের গতি তখন দুরন্ত। পিতরের শ্বাস দ্রুত হল। বুকের ভেতর হৃৎপিন্ডের ধক ধকানিটা প্রবল হল। পাছে তাদের কাছে ধরা পড়ে যায়, তাই চোখ বুজে সে ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন হওয়ার ভান করল। ঠিক সেই সময় সৈনিকদের মধ্যে তাকে একজন হঠাৎ প্রত্যয়ের সঙ্গে বলল ঃ তুমিই সেই লোক। ওই লোকটার সঙ্গে তোমাকে দেখেছি।

পিতরের গলা শুকিয়ে গেল। হৃপিণ্ডের গতি দ্রুত হল। চট করে বেসামাল অবস্থাকে সামলে নিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে বলল ঃ মশাই, বলছি তো আমি সে নই। তবু জোর করে ওই লোকটার সঙ্গী বলে আমার স্বীকারোক্তি আদায় করতে চাইছেন। আবার বলছি, আপনাদের সন্দেহভাজন লোক আমি নই। ওই লোকটাকে আগে কখনো দেখিনি আমি। চিনিও না। শেষ কথাটা বলার সময় তার কণ্ঠ কে চেপে ধরেছিল যেন। এক গভীর অপরাধবোধে তার মাথাটা হেঁট হয়ে গেল। অন্ধকারের ভেতর কেউ তার মুখ দেখতে পেল না।

পিতরের কথা বলার পরেই মোরগ ডেকে ওঠল। বুকটা হাহাকার করে ওঠল তার। মনে হল মোরগের ডাক হয়ে তার সেই হাহাকার পৃথিবীময় ছড়িয়ে গেল। অনুতাপিত হৃদয় নিরুচ্চারে বলল ঃ হে পরমপিতা আমার ক্ষমা করে দাও। এ হল যীশুর নিয়তি আমার অদৃষ্টের লিখন। আমি নিরুপায়।

নাভিমূল থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ওঠে এল নীলাসের। শ্বাসের সঙ্গে বুক হাহাকার করা শূন্যতা এবং যন্ত্রণা নিয়ে বলল ঃ নিয়তি না হলে, নির্দোষ যীশু জনতার দাবিতে শুধু শুধু ক্রুশবিদ্ধ হবে কেন? অদৃষ্টে লিখনে বারব্বাসের মত খুনী ডাকাত, রাজদ্রোহী, ফাঁসির আসামিও মুক্তি পায়। তাই বোধ হয় যীশু মানুষের কৃপা কিংবা করুণা ভিক্ষা করিনি। তাদের পাপের বিরুদ্ধে কোন নালিশও করেনি। পরম পিতার কাছে অর্ন্তভেদী কান্নায় নিবেদন করেছে ঃ প্রভু, ইহারা জানে না কী করিতেছে, তুমি ইহাদের ক্ষমা করিও।

মার্গারেটের মনটা কেমন বিষন্ন আর করুণ হয়ে গেল। ভারাক্রান্ত গলায় অস্ফুট স্বরে বলল ঃ ঠাকমা, যীশু তো ভগবান। মানুষের রোগ ব্যাধি, যন্ত্রণা যাঁর স্পর্শে নিরাময় হয় তাঁর মত ক্ষমতাবান মানুষ পরম পিতার কাছে নিজের জন্য একটু প্রার্থনা করলেই তো বিপম্মুক্ত হতে পারতো।

নীলাস তার ভাবপ্রবণ নাতনীটিরি দিকে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। বলল ঃ ভগবান তো স্বর্গ থেকে মর্তে নেমে আসে না। মানুষই শ্রেষ্ঠগুণগুলি নিয়ে ভগবান হয়ে যায়। ভগবানের অনুরূপ শক্তি ক্ষমতা নিজেই অর্জন করে। প্রেম হল সে শক্তি। যীশুর শক্তির উৎস প্রেম। তিনি প্রেমময়। প্রেমের জ্যোর্তিময় আলো মানুষের অর্ন্তলোক উদ্ভাসিত হয়। তিনি আলোর দূত। এ আলো যে জ্বালাতে জানে তার কাছে সব মানুষই ঈশ্বরের সন্তান। মানুষের প্রতি তার কোনো বিদ্বেষ থাকে না। হায় রে অদৃষ্ট! এই সহজ কথাটা মানুষ জটিল করে তুলল। ক্ষমতা হারানোর ভয়ে যাঁরা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে ভেবেছিল নশ্বর দেহের মৃত্যুতেই সব চুকে বুকে যাবে তারা জানে না আত্মাকে হত্যা করা যায়না, আত্মা মরে না। তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে। কার সাধ্য তার গতিরোধ করে? সাড়ে আঠার শোরও বেশি বছর ধরে সবার কাছে তিনি প্রিয়তর হয়েছেন। এতে ভালবাসা আগে কেউ বাসেনি তাঁকে। আজ সব মানুষের প্রভু তিনি। রাজাও হাঁটু গেড়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করে। মৃত্যুর পাত্রে খৃষ্ট যেদিন মৃত্যুহীন প্রাণ উৎসর্গ করলেন তারপরেও কেটে গেছে বহুবছর। শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা ও ভক্তির আলো পড়ে তিনি হয়ে গেলেন মানুষের প্রেমের দেবতা। নিত্যধাম থেকে নেমে এলেন মর্তধামে। মানুষের হৃদয়ের সব বন্ধ দরজা ভেঙে তাদের অন্তরে প্রবেশ করলেন। সমগ্র জীবনের বিশ্বাসের সঙ্গে, ধ্যানের সঙ্গে, কর্মের সঙ্গে একাকার হয়ে গেলেন। মরুভূমিতে বিশ বছর সাধনা করে যে সত্যোপলব্ধি করলেন তার বাণী প্রচারের সময় আঠারো মাসও পেলেন না। আঠারো মাস ঈশ্বরের বাণী প্রচারের জন্য কাঁটার মুকুট পরিয়ে যাঁকে অপমান করা হল, ক্রুশবিদ্ধ হয়ে দুঃসহ যন্ত্রণার বেদনা নিয়ে যিনি আর্ত্তকণ্ঠে বললেন ঃ হে ঈশ্বর কেন আমাকে ত্যাগ করলে?—সেই মানুষ মৃত্যুর আঠারশো বছর পরেও কী দারুণভাবে বেঁচে আছেন মানুষের অন্তরে। তার মাহাত্ম্য শোনার জন্য মানুষ পাগল। তাঁর করুণাও কৃপায় ধন্য হতে চায়। তিনিই মানুষের জীবন, শান্তি, সুখ, আরাম, তৃপ্তি। ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ভিতর দিয়ে আমরা তাঁকে হৃদয়ে লাভ করেছি। কী তাঁর দীপ্তি, কী তাঁর সৌন্দর্য, কী তাঁর পবিত্রতা। কত দুঃখের দহনে সে মূর্তি সোনা হয়ে গেছে।

অভিভূত আচ্ছন্নতায় মার্গারেট কেমন হয়ে গেছিল। বেশ মনে আছে। নীলাস মমতা ভরা হাত দিয়ে তার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বুকের ভেতর চেপে ধরল আদরে, সোহাগে, আনন্দে।

সেই সময় স্যামুয়েল এসে তার শিয়রে বসল। কৌতুক করে বলল ঃ ওরে দুষ্টু, আমাকে ফাঁকি দিয়ে চুপি চুপি আমার মার আদর খাওয়া হচ্ছে।

মার্গারেট খিল খিল করে হাসল। বলল ঃ বারে! তুমি তো বড় হয়ে গেছ। বড়দের বুঝি কেউ আদর করে?

মার্গারেটের গাল টিপে ধরে সস্নেহে বলল ঃ পাকা বুড়ি।

নীলাস হাসি হাসি মুখ করে স্যামুয়েলের দিকে তাকিয়ে বলল ঃ মার্গারেটকে তাহলে নিয়ে যাবি? মেরী একা সব দিক সামলাতে পারবে? একটি কোলে, আর একটি পেটে। কদিন পরে তিনটি বাচ্চা নিয়ে হিমসিম খাবে। তার চেয়ে বরং আরো কয়েকটা বছর আমার কাছে থাকুক না। তার মধ্যে ওরা বড় হয়ে ওঠবে। যে আসছে সেও সামালানোর মত বড় হবে।

স্যামুয়েল মাথা হেঁট করে আঙুলের নখ ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলল তোমার কথা ঠিক। কিন্তু তোমারও বয়স হচ্ছে। মেয়েরও লেখাপড়ার দিকে মন দিতে হবে। সেই একবছর বয়সে তোমার কাছে রেখে ম্যাঞ্চেস্টারে চলে গেছি। তিনটে বছর ধরে কত রকমের ঝাক্কি-ঝামেলা তোমাকে পোহাতে হয়েছে। আর কত কাল তুমি টানবে?

তুই আমাকে পর পর ভাবছিস কেন? আমারও তো ভালো লাগে। ব্যবসাপত্তর তুলে দিয়ে যে দিন ম্যাঞ্চেস্টারে গেলি সেদিন স্বার্থপরের মত ওকে যেতে দেইনি। আমার দুঃসহ একাকীত্ব এবং নিঃসঙ্গজীবনের একমাত্র সঙ্গী ছিল ও। আমার সমস্ত সময়টা ভরে রাখত। আজও তেমনি আছে। কোথা দিয়ে সময়টা ফুরিয়ে যায় টের পাই না! ওকে নিয়ে গেলে আমি কি নিয়ে থাকব? মার্গারেট চলে গেলে আমার কোনো অবলম্বনই থাকবে না। একেবারে একা হয়ে যাব। আর একটা বছর আমার কাছে রাখ।

মা, তুমি অবুঝ হয়ো না। তোমার কষ্ট হবে বুঝি। কিন্তু ওর গোটা জীবনটাই পড়ে আছে। তার কথাটা তো ভাবতে হবে। আরো কটা বছর থাকলে আরো মায়া পড়বে। তখন ছাড়তে তোমার বেশি কষ্ট হবে। সে সময় তোমার বয়সও বেশি হবে। আজ যে কষ্টটা ক'দিনে সামলে ওঠতে পারবে, আগামী দিনে বয়সের কারণে সেই বিচ্ছেদটা আরো দুঃসহ বোধ হবে।

তবু, আমার কথাটা একবার ভেবে দ্যাখ বাবা।

মা, মার্গারেটের ক্ষতি হয় এমন কিছু আব্দার কর না। বেশিদিন বাবা-মার স্নেহ-ভালবাসা বঞ্চিত হয়ে থাকলে ওর শিশু মনে নানারকম সমস্যা দেখা দেবে। আমাদের সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠবে না। ভবিষ্যতে আমাদের সহ্য করতে পারবে না। বাবা মার দায়িত্ব পালন, কর্তব্য করার একটা প্রভাব শিশু মনে অবশ্যই পড়ে। মায়া করে, সেটা তৈরি হতে না দেয়া একটা মস্ত অপরাধ। মার্গারেটের মঙ্গলের কথা ভেবে তুমি ওকে যেতে অনুমতি দাও।

নীলাসকে চুপ করে দিল। তার চোখের কোনটা অশ্রুপাতে চিক চিক করছিল। স্যামুয়েল মায়ের খুব কাছে সরে এল। হাতের ওপর আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। বলল ঃ মা, তোমাকে ছেড়ে থাকতে ওর খুব কষ্ট হবে। কিন্তু কী করি বল। চার বছর বয়স হল। এবার লেখা পড়ার দিকে নজর দিতে হবে তো।

নীলাস কান্না কান্না কান্না গলায় বলল ঃ ঠিক। বয়স হলে মানুষ বড় স্বার্থপর হয়। শুধু নিজের কথা ভাবে। হাঁ বাবা, তোদের মেয়ে তোরা নিয়ে যা। আমি কে? আমার অধিকারই বা কী? নাতি নাতনীরা দাদু-দিদার কাছে খেলার পুতুলই শুধু। বলতে বলতে শব্দ করে কেঁদে ওঠল।

স্যামুয়েল মায়ের চোখের জল মুছে দিয়ে বলল ঃ মা ; অমন অসহায়ের মত কাঁদতে নেই। তোমার জীবনের ওপর দিয়ে কত ঝড় গেছে, তবু ভেঙে পড়নি। আজ এত উতলা হচ্ছো কেন? তোমাকে কাঁদতে দেখে মার্গারেটও কাঁদছে। এত কাঁদার কী আছে। সে তো তার বাপ-মায়ের কাছেই থাকছে। আর তুমি তো তার নামের সঙ্গেই থেকে গেছ।

তারপর বেশ কিছুক্ষণ ধরে তাকে ও মার্গারেটকে শান্ত করল। বলল ঃ একটা বড় অসুখ করলে ঐ দুরন্ত মেয়েকে কে দেখবে? আমাদের সঙ্গে তুমিও চল।

নীলাস শূন্য দৃষ্টিতে স্যামুয়েলের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। উদাস, বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল ঃ না, জনের স্মৃতি বিজড়িত এজায়গা ছেড়ে অন্য কোথাও মরে আমি শান্তি পাব না। তোমরা বরং যাও।

সেটা কোন মাস মার্গারেটের মনে পড়ে না। তবে মনে আছে বাবাকে কাছে পাওয়ার এক অদ্ভুত অনুভূতি। বলতে কি, জ্ঞান হওয়ার পর বাবা-মাকে সেই প্রথম দেখল। বাবা পণ্ডিত ব্যক্তি। একজন অসাধারণ বাগ্মীওও বটে। জন নোবলের মত তিনিও একজন ধর্মযাজক। যাজকগিরি করতেই তিনি ম্যাঞ্চেস্টারে যান। অল্প সময়ের ভেতর এই রোমান ক্যাথলিক ম্যাঞ্চেস্টারের ছোট-বড়, গুণী-জ্ঞানী মানুষের মনে দাগ কাটতে সমর্থ হলেন। ধর্মমতে তিনি ছিলেন উদার এবং সংস্কারমুক্ত। ক্যাথলিকদের গোঁড়ামি তাঁর ছিল না। প্রোটেস্টান্টদের মত তিনি ছিলেন প্রগতিশীল। বোধ হয় তাঁর সমাদরের পেছনে এটাই ছিল জনপ্রিয় হওয়ার অন্যতম কারণ। সেজন্য তিনি ছিলেন সর্বাধিক আলোচিত ব্যক্তি। যে কোনো ব্যক্তিকে অল্প সময়ের মধ্যে বিতর্কে হারিয়ে দিতে পারেন। এবং এ ধরনের কৌতূহলী প্রশ্নের আলোচনায় এবং বিতর্কে তিনি বেশ মজাও পেতেন। মজার কথা হল, তর্কে যারা পরাস্ত হতেন তাঁরা অপমানিত মনে করে কখনও স্যামুয়েলের কাছ থেকে দূরে সরে যেত না। বরং এক গভীর শ্রদ্ধায় তাঁর একজন

অনুরাগী হয়ে যেত। তিনিও তাদের সম্মান করতেন। একধরণের মমত্ব অনুভব করতেন। বোধ হয় এই গুণেই মানুষ তাঁকে ভালবাসত।

বাবার ভালবাসা এবং স্নেহে স্বাদ পেল মার্গারেট। তাকে নিয়ে সর্বক্ষণ মেতে রইল ক'দিন। পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করল স্যামুয়েল। তাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করা যত না প্রয়োজন ছিল, তার চেয়ে বেশি ছিল মেয়েকে দেখানো। বন্ধুদের কেউই মার্গারেটেকে দেখেনি। তাই তাদের গৃহে যাওয়ার সময় মার্গারেটকে সঙ্গে নিয়ে যেত। তাকে দেখিয়ে সগর্বে বলত ঃ এই দ্যাখ আমার কন্যারত্ন। কী সুন্দর কথা বলে জান। এক্কেবারে পাকা বুড়ি।

বন্ধুরা তার গালটা টিপে দিয়ে বলত ঃ তুমি কি ভালবাস মা?

ফুল, প্রজাপতি, গাছ, মাঠ, আকাশ দেখতে ভাললাগে।

স্যামুয়েল একবুক গর্ব নিয়ে বললে, শুনলে তো ওর ভাললাগার পৃথিবী। একেবারে পাকা বুড়ি।

বন্ধু পত্নীদের কেউ কেউ স্মিত হেসে বলে ঃ আর পাঁচটা মেয়ের মত নয়। সকলের থেকে একটু আলাদা। কোন পরিবারের মেয়ে দেখতে হবে তো। জন নোবলের নাতনী বলে কথা। ওকে সাধারণ হওয়া মানায় না। তাই এমন স্বতন্ত্র। তোমার মতই তার্কিক। কথায় তোমাকে কেউ হারাতে পারে না। এবার মেয়ের কাছে তোমার হার হবে।

স্যামুয়েল হাসি হাসি মুখে করে বলল ঃ বড় সুখের হার ম্যাডাম। এ হারের মধ্যে পরাভাবের গ্লানি নেই, অপমানের যন্ত্রণা নেই।

হঠাৎই বন্ধুদের একজন জিগ্যেস করল ঃ তুমি কী আবার ম্যাঞ্চেস্টারে ফিরে যাবে?

ম্যাঞ্চেস্টার নয়, ওল্ডহ্যামে। কন্যাকেও সঙ্গে নিচ্ছি।

তোমার মার খুব কষ্ট হবে।

হ্যাঁ। ওরও হবে। তাই ওল্ডহ্যামে যাওয়ার তারিখটা একটু পিছতে হল। ছাড়াছাড়ির কষ্টটা ওদের দু'জনকে যাতে পীড়িত না করে. তাই আরো কিছুদিন থেকে ওদের মনটাকে সহিয়ে নিচ্ছি।

একটু চুপ করে থেকে বাল্যবন্ধু বলল ঃ ম্যাঞ্চেস্টারের কনগ্রিগেশনালিস্ট চার্চে যোগ দেওয়া তোমার কী খুব জরুরী ছিল। চার্চ অব আর্য়ল্যান্ড কী দোষ করল? তুমি তো আর্য়ল্যান্ডের লোক। আর্য়ল্যান্ডের স্বাধীনতা যুদ্ধের বৈপ্লবিক নেতা জন নোবলের পুত্র। ইংরাজদের চার্চে গোলামী করা তোমাকে মানায় না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে পুনরায় বলল ঃ বাল্যবন্ধু বলেই নিজের অধিকারে কথাগুলো বললাম। সেখানে কেমন আছ জানি না। কিন্তু এখানে তো বেশ ছিলে। ব্যবসা ভালই চলছিল। হঠাৎ সব বিক্রী করে ইংলন্ডে ছুটলে। আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু ছেড়ে বিদেশ বিভুঁইতে থাকার সার্থকতা কি আমার জানা নেই।

স্যামুয়েল কথা খুঁজে পেল না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল ঃ বন্ধু সবার জন্য সব কিছু নয়। প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব যেমন আলাদা আলাদা তৈরি তেমন প্রত্যেকের বিচার-বিবেচনা, ভাললাগা-মন্দলাগাও স্বতন্ত্র। কারো সঙ্গে কারো মিল নেই। এটা বোঝানোও যায় না।

বন্ধুপত্নী কথাটা অন্যদিকে ফেরানোর জন্য বলল ঃ তোমার শরীর কিন্তু ভেঙে গেছে। নতুন জায়গায় মানিয়ে নিতে একটু সময় লাগে।

বন্ধু বলল ঃ তিন বছর ধরে ম্যাঞ্চেস্টারে যাজকগিরি করছ। এখনও মানিয়ে নিতে পারলে না যখন, আর পারবে না কোনো কালে। কয়লাখনি এলাকার ধর্মযাজকদের শরীর বলে কিছু থাকে না।

শিল্পাঞ্চলের মানুষগুলো কি মানুষ নয়?

অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অসুখ-বিসুখ নিয়ে জীবনের সঙ্গে লড়ে টিঁকে আছে তারা। তোরও একই হাল হয়েছে। মুখে না বললেও শরীর দেখে তো বোঝা যায় ; গরীব মুর্খ শ্রমিকদের মত হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে নিজের অস্তিত্বকে কোনোভাবে টিকিয়ে রেখেছিস। পারলে একটা রুটিন চেক আপে থাকা মঙ্গল।

স্যামুয়েল স্মিত হেসে বলল ঃ শরীরের নাম মহাশয়। যা সহাবে তাই সইবে।

স্যামুয়েলের ওপর বিরক্ত হয়ে বাল্য বন্ধুটি বলল ঃ এখন বুঝতে পারছ না। দু'দিন বাদে বুঝবে। শরীর তোমার হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দেবে। শরীরের যা পাওনা তা তোমাকে দিতে হবে। না দিলে সুদ সমেত আদায় করে ছাড়বে। এজন্যেই বলে শরীরের নাম মহাজন।

মহাজন য ক্ষণ পাওনাদার হয়ে না আসছে, ততক্ষণ তো এভাবে চলুক।

বন্ধু পত্নী বলল ঃ অদ্ভুত কথা. এখন বেপরোয়া আর বোহেমিয়ান হয়ে যা খুশি করতে পার না। বিয়ের আগে এসব তবু মানাতো। এখন নিজের জন্য না হলেও তোমার সন্তানদের জন্য ভাবতে হবে, তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে দায়িত্বসম্পন্ন হতে হবে।

আমার দায়িত্ব, কর্তব্যবোধ সম্পর্কে তোমার কী কোনো সংশয় আছে?

আমি কিন্তু সেকথা বলিনি। তোমার শরীর স্বাস্থ্য ভেঙে যাচ্ছে, তার প্রতি নজর দিতে বলছি শুধু। গোটা সংসারটা তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে! এরকম অপব্যাখ্যা করবে জানলে চুপ করে থাকতাম।

ওসব কথা থাকুক। দু'দিন আছি। তারপর ওল্ডহ্যামে ফিরে যাব ; আর দেখা হবে কিনা জানি না। তোমাদের মত বন্ধু ওখানে নেই। এমন করে স্বাস্থ্যসম্পর্কে শাসন করার মানুষ তোমরা ছাড়া নেই। ম্যাডাম তোমার কথাটা আমার মনে থাকবে। কিন্তু—

উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠা নিয়ে বন্ধু পত্নী প্রশ্ন করল ঃ থামলে কেন? কিন্তু আবার কি—

দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে স্যামুয়েল বলল ঃ ও কিছু না।

বন্ধু পত্নী ওর হাত ধরে, চোখে চোখ রেখে বলল? উহুঁ। আমাকে গোপন করলে শুনব না। বন্ধুর মত সমব্যথী কেউ নেই।

ম্যাডাম সবই তো বোঝ। প্রশ্ন করে বিব্রত করছ কেন? ধর্মযাজকের আয় খুবই সামান্য। বাড়তি পরিশ্রম না করলে ওই সামান্য উপার্জনে কারো সংসার চলে? সত্যি বলতে কি, একাজে আমি আনন্দ পাই। ব্যবসায় পয়সা ছিল, কিন্তু আনন্দ ছিল না। প্রতিমুহূর্ত মনে হতো মানুষকে ঠকিয়ে গ্রাসাচ্ছাদন করছি। ন্যায্য দামের চেয়ে বেশি দাম আদায় করে অন্যায় করছি। প্রতিদিন এক গভীর মর্মযন্ত্রণার ক্ষত বিক্ষত হতাম। বিবেকের সঙ্গে লড়াই করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। একদিন মেরী ইসাবেলকে সব বললাম। ও কি বলল জান? তোমার মন যাতে সায় দেয় না, সে কাজ করবে না। বিবেককে হত্যা করলে মানুষের মনুষ্যত্ব মরে যায়। বেঁচে থাকার কোন সম্বল থাকে না। বাকি জীবনটা কী নিয়ে বেঁচে থাকবে? তার চেয়ে যে কাজে আনন্দ পাবে মনে কর, যা করলে কোন পাপ অনুভূতিতে তোমার মন আর্ত হবে না, তেমন কাজই কর। ধর্মযাজকের বৃত্তি গ্রহণ করলে যদি তোমার তৃপ্তি হয় তা হলে ধর্মযাজক হয়ে যাও। বলতে পার, মেরী আমাকে নবজীবন দিয়েছে। দুঃখ কষ্টের ভাগ নিয়ে ধন্য করেছে।

মার্গারেট, স্যামুয়েলের পাশে বসে চুপটি করে শুনছিল। বাবার বন্ধুর ছেলে মেয়ে খেলার জন্য কতবার ইশারা করে ডাকল তাকে, কিন্তু মার্গারেট নড়ল না। বাবার কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে স্থির হয়ে রইল।

ছোট বেলার স্মৃতি খুবই অস্পষ্ট। তবু কুয়াশার ভিতর থেকে একটু একটু করে স্পষ্ট হয়ে ওঠল তার ছবি। ওল্ডহ্যামে মাকে এবং বোনকে প্রথম দেখতে পাওয়ার আনন্দেই যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ডানগ্যাননে তার মন বসছিল না। রোজই ওল্ডহ্যামে যাওয়ার জন্য বায়না করতে লাগল। অগত্যা স্যামুয়েলকে নির্দিষ্ট দিনের আগেই রওনা হতে হল।

মার্গারেটের ব্যস্ততায় নীলাস খুব অবাক হল। অভিমান করে বলল ঃ জ্ঞান হওয়া থেকে মাকে চোখেও দেখিস নি। তবু নাম শোনা মাত্র সে তোর সব হলো। আমি আর কেউ না। একেবারে পচে গেছি। হাঁরে মেয়ে, ওটা যে তোর মা কী করে চিনবি?

চটপট জবাব দিল মার্গারেট। বারে, মাকে চিনিয়ে দিতে হয় না। কাছে গেলেই চেনা হয়ে যায়। মনটাই চিনিয়ে দেয়।

বাবা চিনিয়ে দিলেই চিনবি ওটা তোর মা।

মোটেই না। আমি এসেছি শোনামাত্র সব কাজ ফেলে দৌড়ে এসে আমাকে কোলে নেবে। আদর করবে। কত কী জিগ্যেস করবে!

নীলাস হাসি হাসি মুখ করে বলল ঃ সে তো আমিও করি। তাহলে আমি মা নই কেন?

বারে, তুমি তো বাবার মা। আমার মা তোমার মত বুড়ী হবে কেন?

চোখ টান টান করে নীলাস বলল ঃ তাও বটে।

মার্গারেট হঠাৎ বিষণ্ণ গলায় বলল ঃ জান ঠাকমা, তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু মার কাছেও যেতে ইচ্ছে করছে। ছোট বোনটার জন্য মন কেমন করছে। কতদিন মাকে দেখি না। আমার কান্না পাচ্ছে ঠাকমা।

স্যামুয়েলের হাত ধরে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল মার্গারেট। মনে হচ্ছিল, সিঁড়ির ধাপে পা পড়ছে না। সে লাফিয়ে লাফিয়ে নামছে।

হঠাৎই মার্গারেট তাকিয়ে দেখল সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আছে জর্জ কাকা। সে শুধু স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সে চোখে নিষেধ নেই, আহ্বান নেই, আছে শুধু জিজ্ঞাসা।

মার্গারেট বাবার হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে দৌড়ে যাচ্ছিল গাড়ির দিকে। জর্জ ধরে ফেলল তাকে। বলল ঃ পাগলি, আমাকে দেখে পালিয়ে যাচ্ছিস কেন? আজ মুখ ফিরিয়ে থাকতে নেই রে। তারপর দু'গালে হাত রেখে মুখের দিকে চেয়ে বলল ঃ "শঙ্কিত চিত্ত মোর, পাছে ভাঙে বৃন্ত ডোর।"

মার্গারেট কথা বলতে পারল না। কেমন উদাসভাবে অন্য দিকে তাকিয়ে হাত ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করল। চোখে তার জল।

ওল্ডহ্যামের বাড়ীটা তাদের ডানগ্যাননের পাশে দাঁড়াতেই পারে না। চারপাশের পরিবেশটা মার্গারেটের ভাল লাগল না। বাড়ীর চারপাশে একটুও খোলা জায়গা নেই। সবটাই চাপা। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। একটা গাছ পর্যন্ত চোখে পড়ে না। বাড়ীটাও এঁদোপরা, রাস্তাগুলো অন্ধকার ঝুপসি। ডানগ্যাননের খোলামেলা পরিবেশ না পাওয়ায় তার মনটা হাঁফিয়ে ওঠল। সেখানকার ফুলে ভরা উদ্যানটি ছিল তার স্বর্গোদ্যান। যেদিকে তাকানো যায় রঙ বেরঙের গাছ আর ফুল। ঘুরে ঘুরে রোজ দেখত গাছে গাছে ব্লু-বেলগুলি কেমন দোল খায়, লিলির পাপড়িগুলি কেমন করে খুলে যায়, কি করে ঝরে যায়। প্রজাপতি তার ওপর কেমন করে বসে, কোন পাখি কোন সময়ে আসে সবই ও জানে। ওদের সঙ্গে ওর একটা চেনা জানা হয়ে গেছিল। জর্জ কাকাই তাঁকে গাছপালা চিনতে শিখিয়েছিল। কোন গাছের পাতা কেমন দেখতে, কোন ঋতুতে তার ফুল হয়, ফল হয়, পাতা ঝরে যায় এসবই জর্জ কাকা তাকে শিখিয়েছিল। জর্জ কাকার গাছপালা খুব প্রিয় ছিল। সারাদিন বনে বাদারে ঘুরে বেড়াত। তাকেও সঙ্গী করত। একেবারে প্রকৃতির মধ্যিখানে বসে তাকে গল্প বলত। কী অসাধারণ গল্প। আঠাশ বছর বয়সে চব্বিশ বছর আগের গল্পগুলিকে নতুন করে মনে পড়ল মার্গারেটের।

দুপুর বেলা। রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে চারদিক। অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে মার্গারেট গাছের ছায়ায় বসল। জর্জও তার কাছে বসল। কাকার কোলে মাথা রেখে মার্গারেট মাটিতে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল।

জর্জ তার চুলের মধ্যে বিলি কাটতে কাটতে বলল ঃ হাজার হাজার বছর আগের কথা। সে সময়ে আকাশে দশদশটি সূর্য ছিল। আগুন ঝরা রোদে খাঁ খাঁ করত পৃথিবী। রোদের তাপে পৃথিবীটা শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে গেল। কোথাও প্রাণের চিহ্ন নেই। তাই দেখে বিধাতা খুব মুস্কিলে পড়ল। এই পৃথিবী নিয়ে তাঁর কত স্বপ্ন কত আকাঙ্ক্ষা, দশদশটা সূর্য মিলে সব পণ্ড করে দেবে? একটা কিছু উপায় ঠাওরাতে অনেক দিন কেটে গেল।

তারপর একদিন বিধাতা রেগে গিয়ে সূর্যকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়তে লাগল। একটা সূর্য ছাড়া নয়টা সূর্য তীরে এ ফোঁড় ও ফোঁড় হয়ে গেল। অমনি ভয়ংকর বিস্ফোরণ হয়ে খসে পড়ল আকাশ থেকে। তক্ষুনি এক দুর্যোগ ঘটে গেল। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে লাগল। সে আগুন কী করে নেভাবে

ভেবে পেল না বিধাতা। অগত্যা অসহায়ের মত কাঁদতে লাগল। আর তার চোখের জল বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা হয়ে আগুন নিবিয়ে দিল। বিধাতার কান্না থামল না তবু। তার চোখের জল জমে বড় বড় গর্তগুলো ভরে গেল। দেখতে দেখতে সব গর্ত জলে থৈ থৈ করতে লাগল। একসময় তা ছাপিয়ে গেল। পৃথিবী হল এক মহাসমুদ্র।

বুড়ি-চাঁদ লাঠিতে ভর দিয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে এসে বলল ঃ লক্ষ্মী ভাইটি আর কেঁদ না। অনেক কেঁদেছ। তোমার চোখের জলে আকাশ ছুঁই ছুঁই করছে। এবার তোমার কান্নবন্ধ কর। নইলে, আমরাও ডুবব। আকাশ ভয়ে নীল হয়ে গেছে।

বুড়ি চাঁদের কথা শুনে বিধাতা চোখ মেলল। বলল ঃ ভাগ্যিস তুমি এসেছিলে। আমার কান্নার জলে পৃথিবীটা সমুদ্র হয়ে গেল। এখন কী হবে? মাটি না হলে গাছ হবে কেমন করে? জীব-জন্তু, মানুষ দাঁড়াবে কোথায়?

বুড়ি চাঁদ বলল ঃ তোমার ভাবনা নেই। সূর্যের সঙ্গে আমার খুব ভাব। ওকে বলব, বিধাতাকে পৃথিবীর মাটি ফিরিয়ে দাও।

বুড়ির চাঁদের কথামত সূর্য তার আলো আর তাপ দিয়ে উঁচু জায়গাগুলোর সব জল শুষে নিল। আর পৃথিবী দেরী না করে তার ওপর গাছের বীজ ছড়িয়ে দিল। বিশাল মাঠ জুড়ে অজস্র গাছ জন্মাল। নীচু জলা থেকে বিশালকায় কচ্ছপ ওঠে এসে দাবি করল পৃথিবীর প্রাণীদের মধ্যে সে অগ্রজ।

বিধাতা কচ্ছপকে বলল, তোমার বড় বড় কোদালের মত পা আর সাঁপলের মত মাথা দিয়ে পৃথিবীর মাটি ফালা ফালা করে চাষের জমি তৈরি করে দাও। আমি শস্য বুনব। শস্য না জন্মালে জীবেরা কি খেয়ে বেঁচে থাকবে? আমার সবুজ পৃথিবীর অধীশ্বর হল গাছ।

জর্জ কয়েক মুহূর্ত থামল। তারপর গাছের একটা ডাল হাতে করে বলল ঃ গাছ হল জীবকুলের ধরিত্রী এবং রক্ষক। পৃথিবীর সব বিষটুকু নিজে শুষে নিয়ে পৃথিবীকে নির্মল করছে। বেঁচে থাকার পরিবেশ তো গাছের সৃষ্টি। ফল, মূল শুধু জীবের আহার ও পুষ্টি জোগাচ্ছে না, নানা ধরনের ভেষজ গাছ-গাছড়া, শিকড় বাকল ও লতাপাতা প্রাণীকুলের রোগ নিরাময়ের ওষুধও বটে। তাই বোধ হয় বিধাতা সর্বাগ্রে গাছ সৃষ্টি করেছে। জলে স্থলে সর্বত্র গাছ-গাছালি। সমুদ্রের গভীরেও এক বিশাল অরণ্য, জলজ প্রাণীদের আহার জোগাচ্ছে, আশ্রয় দিচ্ছে, রোগ সারাচ্ছে। বনে বনে ঘুরে আমার জীবনদায়িনী গাছের সন্ধান করতে ভাল লাগে। কোন গাছে কোন রোগ সারে দেখলেই আমি বুঝতে পারি।

মার্গারেট মুগ্ধ হয়ে বলল ঃ তুমি তো ডাক্তার।

দূর বোকা, লোকে ডাক্তার বলে। আসলে গাছ-গাছালির পাতা, বাকল দিয়ে ওষুধ করে লোকের রোগ সারাই বলে ওরা আমাকে ডাক্তার বলে। আসলে আমি এক উদ্ভিদ বিজ্ঞানী।

বাড়িতে ফিরেও সে একই রূপকথা, লোক কথার গল্প শুনতে শুনতে মার্গারেট জর্জ কাকার কোলে কখন ঘুময়ে পড়ত নিজেও জানে না।

জানলার গরাদ ধরে মার্গারেট বাইরের দিকে চেয়েছিল। সকালের মিষ্টি উষ্ণ রোদ ছাড়া কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। লেডি ইসাবেল কখন তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল সে টের পায়নি। মেয়েটা আসা থেকে কেমন গম্ভীর। এখানকার কোনো কিছুতে ওর মন নেই। যেন এক মস্ত ঘটনা ঘটে গেছে ওর জীবনে। কেন যে এমন হল? ইসাবেল মেয়ের পিঠে হাত রেখে সস্নেহে বলল ঃ এভাবে একা দাঁড়িয়ে কী দেখছিস। ঠাকমার জন্য, জর্জ কাকার জন্য মন খারাপ করছে, তাই না?

মার্গারেট বড় বড় চোখ মেলে মায়ের দিকে তাকাল। মেরী ইসাবেল তার জল ভরা টলটলে দুই আঁখির ওপর চোখ রেখে তার দিকে চেয়ে রইল। বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে আদর করল। গালে চুমু দিল। তারপর কোলের ওপর বসিয়ে বিনুনিটা খুলে দিতে দিতে বলল ঃ গরীব বাবা-মার এই সংসারই তোর নিজের জায়গা। এখানে ডানগ্যাননের প্রাচুর্য নেই, ঐশ্বর্য নেই, খোলামেলা জায়গা নেই, বেড়ানোর মাঠ নেই, বাগান নেই। সবটাই ভীষণ চাপা। দম বন্ধ হয়ে আসে। তুই বোধ হয় এর মধ্যে হাঁফিয়ে ওঠছিস। খুব কষ্ট হচ্ছে তাই না, মা। দুদিন থাকতে থাকতে সয়ে যাবে সব। তখন এই জায়গাটাকে ভালবেসে ফেলবি। আমরা তোর নিজের লোক হব। আমাদের ওপর তোর টান আসবে। কটা দিন শুধু মানিয়ে নেয়া। আমাদের জন্য এটুকু পারবি না!

অভিভূত গলায় মার্গারেট বলল ঃ পারব মা। খুব পারব। বাবা-মার স্নেহ মমতা ভালবাসা এই তো প্রথম পেলাম। এসব ফেলে কোথায় যাব মা?

ইসাবেল বলল ঃ ডানগ্যাননের বাড়ীতে আমার কথা মনে পড়ত?

মার্গারেট মাথা নাড়ল। যার অর্থ না। আহত অভিমানবোধে ইসাবেলের গলার স্বরটা হঠাৎই ভার ভার হল। ঢোঁক গিলে বলল ঃ তোর আর দোষ কী? জ্ঞান হওয়া থেকে আমাকে তো আর দেখিস নি। আমাদের সঙ্গে তোর কোন সম্পর্ক গড়ে ওঠনি। ওভাবে তোকে একা ফেলে আসা আমার উচিত হয়নি। বড় স্বার্থপরের মত তোর কথা ভুলে, তোর বাবাকে নিয়ে মেতেছিলাম। মানুষটার দু'চোখে বড় হওয়ার স্বপ্ন। একজন আদর্শ মানুষ হওয়ার সঙ্কল্প। মানবসেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার প্রবল বাসনা তাকে পিছনে তাকাতে দেয়নি। আমিও কেমন যেন হয়ে গেছিলাম। পাছে মানুষটা ব্যর্থ হতাশ হয় তাই, তার

টানে বিষয় আশয়, কন্যার আকর্ষণ সব ফেলে তোর বাবাকে সার্থক করতে, পূর্ণ করতে ইংলন্ডে এসেছি। এখানকার দুঃখ, কষ্ট, দারিদ্র্য অভাব তার সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছি। স্ত্রীর কর্তব্য করতে গিয়ে সন্তানের প্রতি মায়ের দায়িত্ব পালন করা হয়নি।

ইসাবেলের গলাটা ধরে গেল। মার্গারেট এসব কথার মানে বুঝল না। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। ইসাবেল বলল ঃ আয় মা, চুলটা বেঁধে দিই। এবয়সে এতো চুল রাখলে কী সামলানো যায়?

ছোট বোন মেরী এসে দাঁড়াল সেই সময়। ইসাবেলের কোলে মার্গারেটকে বসে থাকতে দেখে ঈর্ষায় জ্বলে গেল তার ভেতরটা। মুখ চোখের রঙ পাল্টে গেল। হিংস্র রাগে ভয়ঙ্কর দেখাল তাকে। মার্গারেট হেসে হাল্কা করে দিতে চাইল। কিন্তু হাসতে চাইলে হাসা যায় না। ভয়ে কাঠ কাঠ হয়ে রইল। মেরী যে তাকে অপছন্দ করে মার্গারেট জানে। প্রথম দিন থেকেই মেরী তাকে দেখতে পারত না। ভীষণ ঈর্ষা করত। তার মধ্যে দয়া, মায়া, ক্ষমা বলে কিছু ছিল না। মার্গারেট নতুন এবং একা ; কথা বলার বিপদ আছে মনে করে মুখ বুজে তার জুলুম মেনে নিত। অসন্তোষ কিংবা বিরক্তি প্রকাশ করেনি। মেরীর কাছে তার নীরব অসহায় আত্মসমর্পণ স্যামুয়েলকে পীড়া দিত। একদিন সস্নেহে বলল ঃ মেরী তোকে ঈর্ষা করে খুব। আসলে এতদিন যা ছিল ওর একার সম্পত্তি, আজ যখন ভাগাভাগি হচ্ছে তোর এবং ওর মধ্যে, তখন মেনে নিতে পারছেনা। ওকে বুঝতে দিতে হবে যে, তুই ওর প্রতিদ্বন্দ্বী না। ওর মতই তুইও আমাদের একটা মেয়ে। সব কিছুতে তোরও সমান ভাগ এবং দাবি আছে। কিন্তু তা না করে, মাথা নিচু করে থাকলে মাথা নিচুর দিকেই চলে যায়।

হঠাৎ সেই কথাটা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করল তাকে। সাহস করে মায়ের কোলে বসে রইল। ভয়ও করছিল। মাত্র চার বছর বয়স হলে কী হবে, মার্গরেট তার অনুভূতি দিয়ে বুঝেছিল, যে এখনও মেরীর সামনে মাথা তোলার সময় আসেনি। মেরী আরেকটু বড় না হলে বুঝবে না। এই বয়স না বোঝার বয়স। এ বয়স বিচার মানে না। শুধু নিজেরটুকু বোঝে। তাই বোধ হয় খেপে গিয়ে প্রচণ্ড আক্রোশে তেড়ে এল তার দিকে। কোনো কিছু বোঝার আগে ঠাস ঠাস করে দু'খানা চড় কষাল জোরে। চিৎকার করে বলল ঃ শিগগিরি নেমে আয়। নেমে আয় বলছি। এটা আমার মা।

মার্গারেট আর মামলাতে পারল না। হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠল জোরে। বলল ঃ মাগো, মেরী কেন আমাকে মারছে? আমি কী করেছি।

ইসাবেল সহসা একটা অপরাধবোধে কুঁকড়ে গেল। মেরীর হাতখানা মুচড়ে দিয়ে তাকে থামাল। ধমক দিয়ে বলল ঃ কী হচ্ছে মেরী। ও তোমার দিদি। আমরা আর এক মেয়ে। আমিও ওর মা। খবরদার। দিদির গায়ে হাত তুলবে না।

রাগে দুঃখে অপমানে মেরী হাত পা ছুঁড়ে চিৎকারে করে কাঁদতে লাগল। ইসাবেল বিরক্ত হয়ে চোখ করে কটমট তাকাল। তাতে মেরী নিরস্ত হওয়ার বদলে ফুঁসে ওঠল। প্রাণপণ শক্তিতে ঐ ছোট্ট শিশু নিজেকে মুক্ত করার কসরৎ করতে লাগল। যত ব্যর্থ হয় ততই তার গলার জোর বেড়ে গেল। একটাই বুলি তার ওকে বক, ওকে মার।•ওকে তুমি আদর করবে না।

ছোট বোনের জন্য মার্গারেটের দরদ হল। মেরীকে জাপ্টে ধরে মায়ের কোলে বসিয়ে দিল। চোখের জল মুছিয়ে দিতে গেলে মেরী তাকে ঠেলে দিল। মার্গারেট জোর করে চোখ মুছে দিতে চেষ্টা করলে রাগে কামড়ে দিল তাকে। আঃ করে, ককিয়ে কেঁদে ওঠল মার্গারেট। তার বেদনার্ত আকস্মিক চিৎকারে ইসাবেল চমকে ওঠল। স্বগতোক্তির মত বলল ঃ কামড়ে দিয়েছে। কৈ দেখি।

মেরীর বেয়াদপি আর হিংস্র রাগে অতিষ্ঠ হয়ে ইসাবেল দু'ঘা কিল বসিয়ে দিল পিঠে। মেরী কাঁদল না। জেদ করে বলল ঃ বেশ করেছি।

ইসাবেল তার স্পর্ধা দেখে কান মুলে দিল। মেরীর তখনও রাগ পড়েনি। জোরে জোরে শ্বাস পড়ছিল। বলল ঃ ঠিক হয়েছে।

ইসাবেল তার কথাটা পুনরাবৃত্তি করে বলল ঃ ঠিক হয়েছে। দিদি কত ভাল, মেয়ে। তোকে কত আদর করল, আর তুই কামড়ে দিলি। পাজি মেয়ে। নেমে যা আমার কোল থেকে। একরকম জোর করে কোল থেকে তাকে নামিয়ে দিল।

মেরী মার ভর্ৎসনায় এবং অবজ্ঞায় একটুও দমল না। দারুণ একটা অভিমান নিয়ে দিদির দিকে কটমট করে চেয়ে রইল। মনে হল এখনি বুঝি চোখের আগুনে ভস্ম করে দেবে তাকে।

অজান্তে মার্গারেট একটার পর একটা ঘটনার মধ্যে প্রবেশ করছিল। কী করে যে অতীতকে এত গভীর করে অনুভব করছিল নিজেও জানে না। চব্বিশ

বছর আগের কথা। অনেক কিছুই হয়তো নিজের মত করে গড়ে নিচ্ছিল মনের মধ্যে। কিন্তু এসব ঘটনা শুধু স্মৃতি নয়, বাস্তব অভিজ্ঞতা। কিছু কিছু ঘটনা অদৃশ্য কালিতে লেখা হয়ে আছে মনের মুকুরে অব্যক্ত ভাষায়। চব্বিশ বছর বাদে শান্ত স্রোতহীন স্থির জীবনের মাঝখানে হঠাৎ রাজার পত্রাঘাতে যে তরঙ্গবলয় সৃষ্টি করল ছোট থেকে বড় বড় বৃত্ত হয়ে সেগুলো এক অতীত থেকে আর এক অতীতের দিকে ছড়িয়ে গেল। যতক্ষণ পর্যন্ত এ তরঙ্গবলয় বুকের অভ্যন্তরে সৃষ্টি হতে থাকবে ততক্ষণ তার আবর্ত থামবে না। এ একটা সুন্দর অনুভূতি তার বুক জুড়ে আছে; তার মুখে কথা দিচ্ছে, মনেতে নব নব অনুভূতি সৃষ্টি করছে। আর তার আত্মাকে খুঁজছে। যতক্ষণ তার উৎসে না পৌঁছবে ততক্ষণ পর্যন্ত এ আবর্ত থামবে না।

বইর পাতাতে মার্গারেটের দৃষ্টি স্থিরবদ্ধ। কিন্তু কিছুই সে দেখছিল না, পড়ছিলও না। ও দেখছিল ১৮৭১ সালের ছোট বোন অ্যানিকে। ওল্ডহামে আসার কয়েকমাস পরে মার কোল আলো করে অ্যানি এল। অ্যানির জন্ম এবং মৃত্যু দুটোই তার ভীষণভাবে মনে আছে। আর সে কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কী রকম একটা আবেগে তার ভিতরটা থর থর করে কাঁপছিল। আর সে চার বছর বয়সের মার্গারেটকে দেখছিল। ছবিটা খুবই ঝাপসা।

তবে, অল্প অল্প মনে করতে পারে বিকেল থেকে একটা অস্থির যন্ত্রণায় মা ছটফট করছিল। চোখের কোণ বেয়ে জল গড়াচ্ছিল। কেউ মুছে দেওয়ার ছিল না। সারা শরীরটা টানটান করে অসহ্য যন্ত্রণার সঙ্গে একা অসহায়ভাবে যুঝছিল। মুখ টিপে কষ্ট সহ্য করছিল। আর হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছিল। গলা দিয়ে একটা আর্ত স্বর বেরোচ্ছিল। তার পাশে যেসব বয়স্ক পড়শী মহিলারা ছিল মার্গারেটকে তারা কাছে ঘেঁষতে দিল না। ঘর থেকে বের করে দরজা বন্ধ করে দিল। দুঃখে, অপমানে এবং মায়ের কষ্টে তার চোখে জল এল।

স্যামুয়েলের সঙ্গে এক বুক উৎকণ্ঠা নিয়ে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়াল। বিকেলের আকাশে পড়ন্ত রোদের হলুদ আভা একটু একটু করে মলিন হয়ে যেতে লাগল। অন্ধকার নামল ধীরে ধীরে। আঁধার জাঁকিয়ে বসার আগেই চাঁদ ওঠে ছড়িয়ে দিল মিষ্টি শুভ্র জ্যোৎস্না। মার্গারেট চাঁদের দিকে মুখ করে আকাশের নক্ষত্র দেখছিল।

একজন মাসি এসে জানাল, মেয়ে হয়েছে এবারও। স্যামুয়েল হতাশ হয়ে করাঘাত করল মস্তকে। খুব আশা করেছিল দুই কন্যার পিঠে একটি ছেলে আসবে। গির্জায় কত প্রার্থনা করেছিল। তবু পরম পিতা তার ডাক শুনল না। স্যামুয়েলকে বিমর্ষ দেখে মার্গারেট সহসা উতলা হয়ে প্রশ্ন করল ঃ বাবা তোমার শরীর ভাল আছে তো। হঠাৎই তুমি কেমন হয়ে গেলে। মনে হচ্ছে তোমার কোনো অনুভূতি নেই, মন নেই, শুধু শরীর আছে।

মার্গারেটের অদ্ভুত প্রশ্নে স্যামুয়েলের মস্তিষ্ক যন্ত্রটি সজাগ হল। একগাল হেসে স্নেহময় কোমল হাতখানা তার কাঁধে রাখল। বলল ঃ আমি ভাল আছি।

মা ভাল আছে তো।

ওরে আমার সোনা। মার কোনো কষ্ট নেই আর।

তা-হলে, মাকে দেখে আসি। কথাটা শেষ করেই দৌড়ল। ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ ছিল বলে মন খারাপ করে বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। কপাটের ওপর কান রাখতে অনেকগুলো মহিলার হাসি ঠাট্টার কণ্ঠস্বর এবং মায়ের ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনতে পেল। একা একা দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মার্গারেট লম্বা করে শ্বাস নিল। কপাটের ওপর মুখ রেখে ঘরের অভ্যন্তরের বাতাসের ঘ্রাণ নিল বুক ভরে। মায়ের সান্নিধ্যেরও যে একটা সৌরভ আছে, মনে হল তার ঝাপ্টা এসে লাগল নাকে।

তারপরের দিনগুলো মার্গারেট নতুন বোনকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সর্বক্ষণ তার পাশে বসে পর্যবেক্ষণ করে তাকে। প্রতিমুহূর্ত তাকে আবিষ্কার করছে যেন। তার হাত-পা নাড়ানো, হাঁই তোলা, বুক তুলে আড়ামোড়া খাওয়া, মিট মিট করে চাওয়া, মৃদু মৃদু হাসা—সবই মার্গারেটকে আশ্চর্য করে। ইসাবেল তার অবাক বিস্ময়ের দিকে তাকিয়ে বলল ঃ একদিন তুইও এমন ছোট ছিলি। মার্গারেটের বিস্ময় লাগে। বিশ্বাসই হয়না সে কোনোদিন এরকম ছিল।

অ্যানি হওয়ার পর থেকে মেরীর ঘ্যান ঘ্যান করাটা বেড়ে গেল। সব সময় কাঁদে। তার কান্নার কোনো কারণ নেই। তবু সে কাঁদে। অ্যানিকে একেবারে সহ্য করতে পারে না। একটু সুযোগ পেলেই মারবে কিংবা চিমটি কেটে কাঁদাবে। তাই মার্গারেট সব সময় চোখে চোখে রাখে তাকে। কত বোঝায় মেরীকে। মে, তোর থেকে আমি মাত্র এক বছরে বড়। কিন্তু তোর ওপর আমার কোন ঈর্ষা নেই। তুই কিন্তু বড্ড কুচুটে। ছোট বোন অ্যানিকে মোটে সহ্য করতে পারিস না। ও তোর কি করেছে? ওকে দেখলেই তুই মারিস। তোর কষ্ট হয় না। জন্ম থেকে ও রুগ্ন। ওকে দেখলে দয়া হয়। ও ভাবে কাঁদালে বাঁচবে ও?

রাগে মেরী বলল ঃ ও মরে যাক।

ছি ঃ ও কথা বলতে নেই। মার্গারেট তাকে ধমকাল। বলল ঃ ও মরে গেলে কষ্ট হবে না তোর? তুই কাঁদবি না ওর জন্য?

মাথা নিচু করে মেরী চুপ করে রইল। মার্গারেট তাকে নীরব থাকতে দেখে বলল ঃ মে, কারো মরণ কামনা করতে নই। বেঁচে থাকা যত দুঃখ-কষ্টের হোক তবু সব প্রাণী বাঁচতে চায়। তাই মর বলতে নেই। যীশু দুঃখ পায়। পাপ হয়। ঈশ্বর পাপকে ক্ষমা করে না। পাপের জন্য নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। যীশু সকলকে ভালবাসতে বলেছে। ভালবাসা মানুষের ধর্ম। বাইবেলে বলেছে ভালোবাসই ঈশ্বর।

সেই মুহূর্তে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল মেরীর। একটা অপরাধবোধে তার মুখখানা করুণ দেখাল। অনুতপ্ত হয়ে বলল ঃ আমি আর করব না।

কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই মেরী তার শপথ ভুলে গেল। অ্যানিকে দেখলে তার ভেতরটা কী এক না পাওয়ার ব্যথায়, শূন্যতায় জ্বালা করে। সেই মুহূর্তে ঈর্ষাটাই তার সবচেয়ে ভাল লাগে। ঈর্ষা হলেই ওর ভেতরটা নিষ্ঠুর হয়।

ঘুমের মধ্যে শ্বাসরোধ হয়ে অ্যানি হঠাৎ মারা গেল। ইসাবেল এবং মার্গারেট তার খুব কাছে বসেছিল। চোখের সামনে দেখল ঘুমন্ত অ্যানি ছটফটিয়ে একবার জেগে ওঠেই আবার চোখ বুজল। শিশুরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলে অমন করে। ইসাবেল তার পায়ের ওপর হাত রেখে দিবা নিদ্রায় মগ্ন হল।

কিন্তু মার্গারেট ঝুঁকে ছিল ওর মুখের কাছে। শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে বুকের ওঠা নামা ছিল না অ্যানির। অমনি একটা অমঙ্গল আশঙ্কায়। বুকখানা তার ছ্যাঁৎ করে ওঠল। আর্ত কণ্ঠে চিৎকার করে ডাকল মা-অ্যানি কেমন শান্ত হয়ে গেছে।

বোনের মৃত্যুটা অনেকদিন তার মনে ছিল। মানুষের মন সহজে কিছু ভুলতে চায় না। প্রতিটি জাগ্রত মুহূর্তে প্রিয়জনের কত কথাই হয় তার নিজের সঙ্গে। জানলার গরাদ ধরে আকাশের দিকে তাকিয়ে নিজের মনে বলতে লাগল ঃ টুইংকল, টুইংকল লিট্‌ল স্টার, হাউ আই ওয়ান্ডার হোয়াট ইউ আর, আপ অ্যাবাভ দা ওয়ালর্ড সো হাই, লাইক এ ডায়মন্ড ইন দি স্কাই—বলতে বলতে তার কণ্ঠস্বর বুজে আসে।

অ্যানি মাত্র কয়েকটা দিন বেঁচে ছিল। তার মৃত্যুতে মার্গারেট একেবারে একা হয়ে গেল। সকলের মধ্যে থেকেও নিঃসঙ্গ বোধ করে। একা একা থাকে। এখনও পর্যন্ত মেরী তাকে মানিয়ে নিতে পারেনি। অথচ রাত্রিতে তার দু'জন এক ঘরে এক বিছানায় পাশাপাশি গা ঘেঁষাঘেঁসি করে শোয়। শুয়ে শুয়ে মেরীর সঙ্গে গল্প করে অনেক রাত পর্যন্ত। রূপকথার এক জগৎ তৈরি হয়।

তেপান্তরের ওপর দিয়ে কুয়াশা ঘনিয়ে আসছে। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামে। রাত ঘনায়। চারপাশে একটা রহস্যের আমেজ লাগছে। ঠাকুরমা সব কাজ সেরে ফায়ার প্লেসের ধারে বসেছে। আগুনের লালা আভা পড়েছে তার রাঙা মুখে, সাদা চুলে। ধবধবে সাদা চুলের ওপর কালো একটা লেসের ওড়না জড়ানো। কী অদ্ভুত দেখাচ্ছে ঠাকুরমাকে। মনে হচ্ছে, স্বর্গের দেবী নেমে এসেছে আমাদের ঘরে। চেনা ঠাকুরমা অন্য এক লোকের মানুষ হয়ে যায়। তাঁকে দেখলে ভক্তি হয়। পাড়া পড়শী সবাই ঠাকুরমাকে সমীহ করে, শ্রদ্ধা করে। ঠাকমার কোলে বসে গল্প শুনি আর তন্ময় হয়ে চেয়ে থাকি তাঁর দিকে। সময়টা কোথা দিয়ে চলে যায় জানতেও পারতাম না। ঠাকমা গভীর স্নেহে আর বুকভরা মমতায় আমার মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিত। ঘুমের পরীরা দু'চোখের

পাতায় আলতো পায়ে নেমে কখন আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিত টেরই পেতাম না। ঘুম ভাঙলে দেখতাম আমার বিছানায় শুয়ে আছি।

মেরী তখন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নাক ডাকছিল।

অনেক চেষ্টা করল মার্গারেট। তবু মেরীর সঙ্গে ভাব জমল না তার। বলতে কি তার ওপর অভিমান করে মার্গারেট বাড়ীর সব সময়ের আল্পবয়সের ভৃত্যের সঙ্গে অবসর সময়ে মনের সুখে গল্প করত। গ্রামের ছেলে সে। অত্যন্ত সাদাসিধে এবং নিরীহ গোছের ছেলে। ভূত প্রেতের সুন্দর গল্প বলে। তার গল্প বলার ভঙ্গিটি ছিল অনবদ্য। মার্গারেট একাগ্র হয়ে শুনত।

একবার ঘুমের মধ্যে অ্যানির মত তার শ্বাসরোধ হয়ে গেছিল। সে অমন ছটফটিয়ে জেগে ওঠতে দেখল একটা কিম্ভুত কিমাকার শয়তান ঝুঁকে আছে তার মুখের কাছে। ভয়ে তক্ষুনি চোখ বন্ধ করে জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছিল। অ্যানির থেকে বয়সে অনেক বড় বলেই শয়তানটা তার গলা চেপে ধরেও কিছু করতে পারেনি। কিন্তু তার বিশাল দুই থাবা দিয়ে চেপে ধরেছিল তার গলা আর বুক।

কৌতূহল দমন করতে না পেরে মার্গারেট বলল ঃ তুই মরলি না কেন।

মরব কেন? আতঙ্ক আর যন্ত্রণার মধ্যে মরিয়া হয়ে যীশুর নাম জপ করতে লাগলাম। অমনি যীশু হৃষ্ট পুষ্ট লম্বা চওড়া স্বাস্থ্যবান দুই অনুচরকে পাঠিয়ে দিল। বাজখাঁই গলায় তারা বলল ঃ যীশুর ভক্তকে ছেড়ে দে বলছি। নইলে কিন্তু ভাল হবে না। আমরা তোর ঘাড় মটকে দিতে পারি কিন্তু দেব না। যীশু করুণাময়।

শয়তানটা ফ্যাসফেসে গলায় বলল ঃ চুপ করে যা ছোঁড়া। আমি হলাম শয়তান। তোর যীশুও আমার হাত থেকে রেহাই পায়নি। বেশি ট্যা-ফ্যা করলে কিন্তু অক্কা পেয়ে যাবি। মানে মানে বিদায় হও বাবা।

সে কথা শুনে আমার ভয় হল খুব। যীশুর লোকদের মুখও কাঁচুমাচু হয়ে গেল। আমার অজ্ঞান হওয়ার মত অবস্থা। বেশ বুঝতে পারছি, আমি মরে যাচ্ছি। কথা বলার ক্ষমতা নেই। যীশুর লোক দুটির সাহস হল না শয়তানের সঙ্গে লড়াই করার। যীশুকে ওরা মানে না। তাই যীশু অনুচরদের মনের ভয়, সংশয় দূর করার জন্য অদৃশ্যলোক থেকে আমার প্রাণ হরণ করল।

মার্গারেট বেশ একটু উত্তেজিত হয়ে বলল ঃ তাহলে তুই বেঁচে থাকলি কী করে?

আমার গল্প বলা তো শেষ হয়নি। কথার মধ্যে কথা বলা তোমার একটা বদ অভ্যাস। কতবার বলেছি কথা বলার সময় প্রশ্ন করে মুড নষ্ট করে দিও না। কিন্তু কে কার কথা শোনে? আরে এত সত্যি গল্প নয়। স্বপ্ন। স্বপ্নের গল্পের মাথামুণ্ডু থাকে না কি?

মার্গারেট তৎক্ষণাৎ তার দোষ স্বীকার করে নিয়ে বলল ঃ বেশ, আর প্রাণহীন দেহটা আমার পরে রইল। শয়তানের অনুচরেরা গামছা দিয়ে প্রাণহীন দেহটাকে শক্ত করে বাঁধল। তারপর, চুল ধরে হ্যাচকা টান দিয়ে বলল ঃ চল।

আমি তো মরে গেছি। যাব কী করে?

তখন নেংটি পরা, খালি গায়, লাঠি হাতে লোকটা এগিয়ে সজোরে পিঠে লাঠির এক ঘা বসিয়ে দিল। মুখ দিয়ে একটা শব্দও বেরোল না। রাগে আমায় হাত পা দুমড়ে মুচড়ে ব্যথা দিয়ে পরখ করে দেখল সত্যি মরে গেছি কিনা? যখন কোনো ভাবে সাড়া পাওয়া গেল না তখন গাধার পিঠে চাপিয়ে একটা গভীর জঙ্গলের মধ্যে আমাকে ফেলে চলে গেল। যাওয়ার সময় গামছাটা খুলে নিয়ে গেল।

ওরা চলে যাওয়ার পর চুপি চুপি যীশু এল। তাঁর কোমল হাতের ছোঁয়ায় আমার ভেতরে প্রাণ এল। নিঃশ্বাস পড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

যীশুর অধরে অনির্বচনীয় হাসি। করুণাঘন দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বলল ঃ যে আমার শরণ নেয়, আমি তাকে রক্ষা করি। কথাগুলো বলে যীশু অদৃশ্য হয়ে গেল। আমার আর কোনো কষ্ট নেই। ঘুম ভাঙলে দেখি চিৎ হয়ে বিছানায় শুয়ে আছি। মাথার ওপর চাঁদ হাসছে। তার পাশে ঝিকমিক করছে কয়েকটা তারা।

মার্গারেটের কেমন একটা ঘোর লাগা আচ্ছন্নভাব। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কথা বলতে পারল না। অনেক কথাই মনে হচ্ছিল তার। অ্যানির মুখখানা ভেসে ওঠছিল চোখে। সাত দিনের শিশু বলেই অ্যানি জানত না, যীশু কে? যীশুর শরণাপন্ন হলে অ্যানি এমন করে অকালে চলে যেত না। নিজের অজান্তে চোখ ভরে তার জল এল।

পাঁচ বছর বয়স হতে না হতেই মার্গারেটকে ওল্ডহ্যামের ঘিঞ্জি পরিবেশে একটা ছোট স্কুলে ভর্তি করা হল। স্কুল বাড়ির সামনে ছিল একটা লন। সেখানে ফুলের গাছ ছিল। আর ছিল ওক, পাইন, দেবদারুগাছ। সাজানো গোছানো পরিপাটি একটি উদ্যান। কোথাও একটি গাছের পাতা পর্যন্ত পড়ে থাকে না। সব গাছই তরতাজা সবুজ। উদ্যানের আকর্ষণেই স্কুলে যেতে ইচ্ছে করত। ঐ খোলা জায়গায় এসে প্রাণ পেত। হাঁফ ছেড়ে বাঁচত।

এখানে এলে মার্গারেটের ড্যানগনন শহরে ছবির মত তাদের বাড়িটা চোখের ওপর ভাসত। এমন মুক্ত জায়গায় এলই অনুভব করা যায় জীবন ও প্রকৃতি একে অন্যের ওপর হাতে হাত রেখে এক মায়ার বাঁধনে বাঁধা আছে

যেন। মাথার ওপর নীল আকাশ, পায়ের তলার মাটি, গাছ, মানুষ দিগন্ত—সব জড়াজড়ি করে ঘনসন্নিবিষ্ট হয়ে আছে। এদের সঙ্গে আছে বলেই মানুষের অস্তিত্ব আছে। স্কুলের এই বাগানটা তার খুব প্রিয় জায়গা। এখানে থাকলে মনটা ছুটি পায়। উধাও হয়ে যেতে তখন আর কোনো বাধা থাকে না। আলাদা করে ভাবার একটা মন তৈরি হয়। ক্লাশ রুম তো নয়, যেন বদ্ধ কুয়া। বিশাল আকাশটাকে ছোট্ট করে দেয়। মনের চোখকে ঢেকে রাখে। কোনোভাবে মস্তিষ্ক কল্পনাকে কাজে লাগায় না, মনকে রাঙায় না। অথচ কী আশ্চর্য! খোলা আকাশের তলায় দাঁড়ালে আকাশখানা অনেক বড় হয়ে যায়। চারদিকে তার এত আলো, এত হাওয়া, এত ভালবাসা ফুলে ফুলে মৌমাছির গুঞ্জন, রঙ বেরঙের প্রজাপতির স্বচ্ছন্দ বিচরণ, মুক্তির শ্বাস, মার্গারেটকে অন্য এক মানবীতে রূপান্তরিত করে। এই উদ্যানে বসলে মনে হয় ওর মত অন্য শিওরাও হাতে স্বর্গ পেয়েছে।

মার্গারেটের ঐ ছোট্ট বেলাতেই মনে হত জীবনের আসল মানেটা হাওয়া ছিল মুক্তি। অথচ বেশিভাগ মানুষের জীবন যেন বাঘবন্দী খেলার ছককাটা ঘর। খাঁচায় বন্দী বাঘের মত কাতর নয়নে চেয়ে থাকে। চোখের ওপর ছবি ভাসে—ঝোপে ঝোপে লুকিয়ে বাঘের শিকার ধরার দৃশ্য, ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে ফড়িং কিংবা প্রজাপতি ভয়ে উড়ে গিয়ে সসম্ভ্রমে পথ করে দেয় তাকে। নদীর বুকে কোন গোপন প্রাণের ফোয়ারা উছলে এসে তাকে স্নান করিয়ে দেয়, তৃষ্ণায় জল খাইয়ে যায়। যখন ঝিকিমিকি রোদ ওঠে তখন বনের পথে ছপছপিয়ে ঘুরে ঘুরে শিকার খুঁজে বেড়ায়। ক্লান্ত হলে গাছ ছায়া মেলে দেয় নিশ্চিন্তে একটু ঘুমোনোর জন্য। সব কিছুতে তার রাজকীয় ভাব। পৃথিবীর রাজা হতে গিয়ে মানুষ নিজের জালে বন্দী হল। আজ তার ফেরার উপায় নেই, তাই বাঘবন্দী খেলার ছক কাটা ঘরে চিৎ হয়ে পড়ে আছে।

স্কুলের বদ্ধ ঘরে মার্গারেটের মনটা হাঁফিয়ে ওঠত। পড়াশুনার পরিবেশ ছিল না সেখানে। পড়ুয়াদের চিৎকার, চেঁচামেচি, গণ্ডগোল, হৈ-চৈ, নালিশ, দুষ্টুমি, খুনসুটি সামলাতে বিদ্যালয়ের অল্পবয়সী তিন দিদিমণি হিমসিম হয়ে যেত। স্কুলটা কোনোদিন পড়ুয়াদের মত হয়ে ওঠেনি। তাই পড়তে ভাল লাগত না। বিদ্যালয় কক্ষে পা দিলে মার্গারেটের ভীষণ ক্লান্তি বোধ করত। মনটা বিষণ্ণ হয়ে যেত। স্কুলে যেতে ইচ্ছে করত না। প্রতিদিন স্কুল যাওয়ার সময় সারা শহরটা প্রায় চক্কর দিয়ে মুক্তির শ্বাস নিতে নিতে সে শ্রেণী কক্ষে ঢুকত। বিদ্যালয়ে বন্দী থাকার চেয়ে খোলা আকাশের নিচে নিজের মত স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ানো তার কাছে অনেক প্রিয় ছিল। তবু পড়াশুনা শেখার জন্যই বিদ্যালয়ে যেতে হত। পরের বোন মেরীত রোজ তার সঙ্গে স্কুলে যেত। বলতে কি, বিদ্যালয় সংলগ্ন উদ্যানের টানে আর সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে মেলামেশার

আকর্ষণে বিদ্যালয়ে না এসে থাকতে পারত না মার্গারেট। প্রতিদিন ক্লাশে সেন্টজনের সুসমাচার থেকে উপদেশাত্মক গল্প শোনাতে হত তাকে। গল্প বলার একটা আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তার। গল্প যখন বলত সবাই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেত। মনে হত শ্রোতারা কল্পনেত্রে দৃশ্য ও ঘটনার ছবিগুলো দেখতে পাচ্ছে। সব গল্পের শেষ থাকে। ফুরিয়ে যায় এক সময়। শেষ হওয়ার পরে কেমন একটা স্তব্ধতা থমথম করত। এই নিঃশব্দ শব্দময়তাই বোধ হয় শ্রোতার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। নৈঃশব্দের ঐ ক্ষণটুকু মার্গারেটের সবচেয়ে ভাললাগার মুহূর্ত। শ্রোতাদের ছটফটানিহীন শান্ত, ধীর, স্থির ভাবটি ভীষণ ভাল লাগে মার্গারেটের। এমন যে চঞ্চল বালক বালিকা, সেও গল্পের আকর্ষণে পুরোপুরি শান্ত ও তন্ময় হয়ে যেত। তার সঙ্গে শ্রোতার হৃদয়ের এক নিবিড় যোগাযোগ মুহূর্তে ঘটত। কেমন একটা অভিভূত আচ্ছন্নতায় আবিষ্ট হয়ে থাকত। চোখের তারায় এক জ্যোর্তিময় যীশুর দেহবয়ব পরিস্ফুট হয়ে ওঠত। আর বহু বহুদূর দিগন্ত থেকে যেন বাতাসের হাওয়ার হয়ে ভেসে আসত তাঁর মধুস্রাবী কণ্ঠস্বর ঃ হে ঈশ্বর আমাকে কেন ত্যাগ করলে?

মার্গারেটের হঠাৎই একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল, ঈশ্বর তো মানুষকে সৃষ্টি করেন, আর মানুষ প্রতিমুহূর্ত নীরবে নিভৃতে নিজেকে অবিরাম সৃষ্টি করে চলেছে। বিধাতার মত সেও একজন স্রষ্টা। তার ভেতর এই সৃষ্টির যাত্রা তাকে শান্ত থাকতে দেয় না। প্রতিদিনের নানা ঘটনা, অজান্তে তাকে এক অন্য মানুষ করছে। এই অয়ন পথটা সে নিজেও ভাল করে জানে না। তবু সমস্ত চেতনা জুড়ে অতীতের এক জ্যোতিবিকীর্ণ মহোৎসব তাকে বর্তমানের মধ্যে স্থির হয়ে থাকতে দিচ্ছিল না। আত্মার অভিসারে বেড়িয়ে নিজেকেই দেখছিল তার কোনো অভাব নেই, দৈন্য নেই। জীবনের ধ্রুবতারার জ্যোতি এতটুকু নিষ্প্রভ হয়নি। উত্তর আকাশে দাঁড়িয়ে সব পথ ভোলা পথিককেই চিরদিন পথ দেখিয়ে এসেছে। মনের ভেতর তার পথের নির্দেশও ঐ উজ্জ্বল চিরন্তন তারার কাছ থেকেই পাচ্ছে। জীবনের বাঁকে বাঁকে দাঁড়িয়ে সে যেন পথ দেখাচ্ছে। সেখানে কত কী পরিবর্তন নিমেষে ঘটে যাচ্ছে চোখ খুলে দেখা হয়নি। একুশ বছর বাদে হঠাৎই তা যেন নতুন করে অনুভব করল।

মার্গারেটের বয়স তখন সাত। ওল্ডহ্যামে তিনটে বছর কাটিয়ে তারা এল টরেন্টন গাঁয়ে। অনেকদিন থেকেই স্যামুয়েলের শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না। দিন দিন কাহিল হয়ে পড়ছিল। শরীরটা দড়ির মত পাকিয়ে গেছিল। কোটরগত উজ্জ্বল দুই চোখের কোণে কালি পড়েছিল। খুক খুক করে কাশে সর্বক্ষণ।

বিকেল হলেই ঘুষঘুষে জ্বর হয়। তবু স্যামুয়েল গ্রাহ্য করে না। কারণ, উপায় ছিল না। দুঃসহ অভাব অনটনের সঙ্গে এক কঠোর সংগ্রাম করতে হচ্ছিল তাকে। এ ধরনের পরিশ্রমের জন্য যে ধরনের খাওয়া দাওয়া প্রয়োজন ছিল তা করার ক্ষমতা ছিল না। একটা গোটা সংসার তাঁর আদর্শের জন্য ডুবছে, একথা ভাবলে খুব কষ্ট হয় মার্গারেটের। তবু বাস্তব সত্য। রোজগার বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই স্যামুয়েল ওল্ডহাম থেকে ডেভেনশায়ারের টরেন্টন গ্রামে এল। যক্ষায় তখন ধুঁকছিল। শরীর পারত না। তবু কষ্ট করেই সাধারণ মানুষের অন্তঃকরণে খৃষ্টের মহিমার প্রতি তাদের অনুরাগ বর্ধন করল না শুধু, নিজেও তাদের হৃদয়ে আসন করে নিল।

এমনই অবস্থা হল, স্যামুয়েল মানুষের কাছে যেতে পারছিল না, গ্রামের মানুষই তার ঘরে ভীড় করছিল। ওদের সঙ্গে স্যামুয়েলের কথাবার্তার সময় মার্গারেটও বসত তাদের মধ্যে। ধর্ম থেকে রাজনীতি, সমাজনীতি, মানুষের নীতিবোধ, মূল্যবোধ সব কিছু নিয়ে। আলোচনা হত। সে সব শুনতে মার্গারেটের ভাল লাগত। স্যামুয়েলের কথাগুলো তার শ্রোতাদের বিশ্বাস ও ধ্যানধারণায় একটা ধাক্কা দিত। বাবার সেদিনের কথাগুলো তার কানে রিন রিন করে আজও বাজে। পৃথিবীর বাইরে স্বর্গ-মর্ত-পাতাল বলে কিছু নেই। স্বর্গও নেই আকাশে। নরকও নেই পৃথিবীর নিচে। সবই আছে মানুষের মনে। স্বর্গ-নরক ধারণার স্রষ্টা মানুষ। আবার এই মানুষই যদি ইচ্ছে করে নিজের মনটাকে নরক থেকে স্বর্গে-রূপান্তরিত করতে পারে।

মার্গারেটের কৌতূহলী উৎসুক মনটা হঠাৎই প্রশ্ন করল ঃ স্বর্গ তা-হলে নেই? ঈশ্বর, পরমপুরুষ কোথায় বাস করেন তা-হলে?

স্যামুয়েল হেসে বলল ঃ ঈশ্বরকে আমরা যেভাবে কল্পনা করি, সেভাবেই তিনি আমাদের মনশ্চক্ষে আবির্ভূত হন। তাঁর স্বরূপ যদি একই হবে, তাহলে এক এক ধর্মের দেবতাকে একএকরকম দেখতে হয় কেন? কারো দেবতার সঙ্গে কারো দেবতার আকৃতি এবং প্রকৃতির মিল নেই। দেবতা-তেবতা বলে কিছু নেই। এই বিশ্বের স্রষ্টার নাম বিশ্ববিধাতা। তিনি নিরাকার। তাঁর বউ-ছেলে নেই।

মার্গারেট উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের মত অবাক হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকত বাবার দিকে। কারণ, এতকাল ঠাকমার মুখে যে সব গল্প শুনেছে। তাতে সে জানত, মানুষ স্বর্গে যায়। নীল আকাশের ওপরে আছে স্বর্গ। সেখানেই দেবতারা বাস করেন। যীশুও সেখানে রয়েছে পরমপুরুষের সঙ্গে পরমানন্দে। মার্গারেটের মনে ধাঁধা সৃষ্টি হল। ঠাকমাও ধর্মযাজক জন রিচার্ড নোবলের স্ত্রী ; তিনি মিথ্যে বলতে পারেন না। আবার বাবার কথাটাও অবিশ্বাস করে উড়িয়ে দিতে পারছে না। কিন্তু বাবার কথা ভাবলেই ভয় হয়। মনটা অবলম্বনহীন হয়ে পড়ে। দুর্বল মানুষের একটা কিছু অবলম্বন তো চাই। স্বর্গ এবং দেবতাকে

অবিশ্বাস করলে মানুষের থাকল কী? স্যামুয়েলকে নিবৃত্ত করার জন্য ব্যাকুল হয়ে বলত ঃ বাবা এসব বলে মানুষকে ক্লান্ত কর না।

স্যামুয়েল হেসে বলত ঃ মাগো ধর্মশিক্ষা মামুলি বক্তৃতা নয়। প্রত্যক্ষ অনুভূতির। প্রমাণের মাধ্যমে মানুষের মনের অভ্যন্তরে তাকে পৌঁছে দিতে হয়। তা হলে শত শত লোক তোমার কাছে ছুটে আসবে, শুধুমাত্র তোমাকে দেখার জন্য, তোমার পদতলে নত হওয়ার জন্য। তাই তো আজ আমার ঘর মানুষের ভীড়ে উপছে পড়ছে। নিজের দেহের প্রতি বিন্দুমাত্র নজর না দিয়ে যে কটাদিন আছে ওদের জন্য নিজেকে উজার করে দিতে চাই। তাই তো বলি মা, তোরা আমাকে অসুখের অজুহাতে বাধা দিস না। যতক্ষণ আমি কথা বলতে পারব, শ্বাস নিতে সক্ষম থাকব ততক্ষণ মানুষকে ঈশ্বরকে অনুভব করা এবং তাকে লাভ করার উপদেশ দেব।

কাশতে কাশতে স্যামুয়েলের দম আটকে আসছিল। একটু বিরাম নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করলে মার্গারেট তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল ঃ তুমি চুপ কর বাবা। বেশি কথা বললে কাশিটা বাড়বে।

কথা বললে আমি শান্তি পাই। দি এশিয়ান লাইট পড়ে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি। এই প্রথম একজনের মুখে শুনলাম, ঈশ্বরকে দেখন নি। অথচ তাঁরই জীবনটা সাধনায় কেটে গেল। আত্মার সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্কই হল ধর্ম। ধর্ম আছে উপলব্ধির জগতে। তার জন্য মানুষকে সৎ, আদর্শ এবং ধার্মিক হতে হবে। পূর্ণতা অর্জনের জন্য নিজেকে শুচি হতে হবে। ধর্ম হল জলের মত স্বচ্ছ, বাতাসের মত উদার, ফুলের মত নির্মল। ধর্ম মানে কতকগুলো শাস্ত্রকথা কিংবা বিশ্বাস নয়—আধ্যাত্মিক উপলব্ধি। সেই উপলব্ধির মহাপুরুষেরা বলেন বিশ্বজগৎ যেভাবে প্রত্যক্ষ করি তার চেয়ে অনেক বেশি স্পষ্টরূপে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা যায়। ভারত প্রত্যাগত আমার এক ধর্মযাজক বন্ধু বলেছিল ; ভারতের ঈশ্বরোপলব্ধির সার কথা হল 'সোহং' অর্থাৎ আমিই্সে। মানুষের মধ্যেই তাঁর প্রকাশ। শ্রদ্ধায় ভালবাসায় মনের ভেতর একটা তদ্গত ভাব এবং ঈশ্বরত্ববোধ আপনা থেকে সঞ্চারিত হয়ে যায়। তখনই সাধকের মনে হয় ঈশ্বরের মতো তার অসীম ক্ষমতা—আমিই স্রষ্টা, পরিত্রাতা, রক্ষাকর্তা ;— আমিই সে। এই পৃথিবীর যা কিছু-সুন্দর, শ্রেষ্ঠ আমারই সত্ত্বার অংশ। এই অহঙ্কার ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ, ভক্তি, প্রেম এবং শ্রদ্ধা থেকে সৃষ্টি। ভক্তের ইচ্ছের ওপর পরমের আলো পড়ে মনটা যখন বড় হয়ে যায় তখন সেও বলে 'তত্ত্বমসি' অর্থাৎ তুমিই সে।

শ্রোতারা চুপ করে রইল। তাদের সুদূরপ্রসারী দুই চোখের তারায় কেমন একটা নিবিড়তা নামল। মার্গারেট স্বপ্নাচ্ছন্নের মত বসে রইল কয়েকমূহূর্ত। তারপর বলল ঃ তাহলে মানুষের মনে ঈশ্বরবোধের ধারণা সৃষ্টি হল কেন?

ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য পৃথিবীর মানুষ এত ব্যাকুল হয় কেন? ঈশ্বর যদি শুধু একটা উপলব্ধি হয় তাহলে আলাদা করে তাঁকে চেনাল কে?

স্যামুয়েলের চট জলদি জবাব ঃ মানুষের ভয়, দুর্বলতা অসহায়তা এবং একাকীত্ব। প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ যখন আর পাঁচটা জীবজন্তুর মত ঘুরে বেড়াত একা একা খাদ্যের অন্বেষণে, প্রবৃত্তির তাড়নায়, অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে। সেদিন এসব প্রশ্ন ছিল না তার মনে। আত্মজন বলেও ছিল না তার কেউ? ঈশ্বর কে? বিরাট পুরুষ কে। পরম পুরুষের স্বরূপ কি-এসব কিছুই জানত না। এমন কি নীতি, অনুশাসন, সংস্কার, কিছুই মানত না। তাঁর জীবনে কোন সমস্যাই ছিল না। বহু অভিজ্ঞতার মূল্যে মানুষ উপলব্ধি করল ঈশ্বর নামক এক অদৃশ্য শক্তির ক্ষমতাকে। ভীরু, দুর্বল, অসহায় মানুষ—পূজা, প্রার্থনা, উপাসনা করে এঁকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করল। তারপর বুদ্ধের মত, যীশুর মত সাধকের আর্বিভাব হল। তাঁদের জীবনের সব কিছুই কেমন অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য, অলৌকিক। বোধ হয় তাঁদের জীবনে ঐসব অপ্রাকৃত অদ্ভুত ঘটনাই সাধারণর মনে এক অলৌকিক শক্তিধর লীলাময় ভগবানের অনুভূতি এনে দেয়। নইলে এক অন্ধকার আস্তাবলে শিশুমেধ যজ্ঞের নায়ক হেরডেব সশস্ত্র বিশ্বস্ত প্রহরীদের দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে কী করে ঈশ্বরের পুত্র যীশু জন্মালেন? কোন মন্ত্রবলে তিনি মানুষের মনের আশ্রয় হয়ে ওঠলেন? ভাবতে অবাক লাগে একজন নিরস্ত্র মানুষ কী করে রাজার ঘুম কেড়ে নিল? এ কার শক্তি? মানুষের এত ক্ষমতা হয়? যীশু তো একজন সাধারণ মানুষ? তবু ধর্মধ্বজী পুরোহিতরা তাকে ঈর্ষা করে, ভয় করে, শত্রুতাও করে—কিন্তু সাধারণ মানুষ তাকে ঈশ্বর জ্ঞানে শ্রদ্ধা ভক্তি ও সম্মান করে। মানুষের হৃদয়ের পূজো পেয়ে যীশু তখন ঈশ্বরের পুত্র হয়ে গেছেন। তিনিই সাক্ষাৎ ঈশ্বর। যীশুর এই ঈশ্বরত্ব মানুষের সৃষ্টি। মানুষ নিজের অন্তরের মধ্যে বিশ্বাসের মধ্যে ঈশ্বরের শক্তি, ক্ষমতা, মহত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্বকে অনুভব করে বলেই শরণাগত হয় তাঁর। যীশুরও মনে হয় আমি সে। সমস্ত, ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ তাঁতেই অবস্থিত। তাই মানুষের ধারণা তাঁর শরণ নিলে আর কোনো মানসিক কষ্ট থাকবে না! ঈশ্বর নয় একজন মানুষের কাছে তুমি আমি নিজেকে সমর্পণ করে ধন্য হয়ে যাচ্ছি। কারণ তাঁর মধ্যেই এক জীবন্ত ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা যায়।

নীরব প্রগাঢ় আনন্দে ও পরিতৃপ্তিতে স্যামুয়েলের দু'চোখ বুজে রইল। সমস্ত চেতনার ভেতর ডুবে গিয়ে আত্মমগ্ন হয়ে বলত ঃ মার্গারেট দুঃখ-যন্ত্রণায় মন আর্ত না হলে, অসহায় বোধ না করলে তো মানুষ ঈশ্বরের শরণাগত হয় না। তিনি বায়ুর মতো প্রচ্ছন্ন এবং নির্লিপ্ত বলেই জগৎময় তাঁর অস্তিত্বকে টের পাওয়া যায় না। কিন্তু ঈশ্বরের পুত্র মানবী মাতার গর্ভে আর পাঁচটা শিশুর

মতো জন্মগ্রহণ করে। তাঁর জীবনে সব কিছুই অদ্ভুত। তাই জন্ম থেকেই মানুষের নজর কেড়ে নেওয়ার শক্তি ঈশ্বর তাঁকে দেয়। হয় তো আমিও তাঁর সব কিছু ভাল করে বুঝি না। তথাপি তাঁর জীবন ও কর্ম পর্যালোচনা করলে অজান্তে এক ঈশ্বরত্ববোধ সঞ্চারিত হয়ে যায়। তখন সত্যিই মনে হয় ঈশ্বরের মত অসীম তাঁর ক্ষমতা। উদ্ধার করতেই তিনি শুধু মানুষকে আহ্বান করেন।

এক দারুণ শান্তি ও সুখের তৃপ্তিতে অনুরাগে মার্গারেটের দু'চোখ দীপ্ত হয়ে ওঠল। কেমন একটা অনুরাগদীপ্ত তন্ময়তার ঘোর তার চাহনিতে। বাবার বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল ঃ বাবা, তোমার কথা শুনতে শুনতে আমার মনটা বড় হয়ে যায়। তুমিও তাঁর মত একজন শ্রেষ্ঠ, সুন্দর, মহান মানুষ— আমার ইষ্ট। আমার সমস্ত সত্তার ভেতর, ধ্যানের ভেতর আমি শুধু তোমাকেই দেখি। মনে হয় তুমিই আমার যীশু।

স্যামুয়েল তার শ্রান্ত চোখ দুটি ধীরে ধীরে উন্মোচন করল। স্নেহমধুর কণ্ঠে বলল ঃ ও কথা বলতে নেই মা। আমার প্রতি গভীর ভালবাসায় আপ্লুত হয়ে তুমি মর্মের মধ্যে পরমের সঙ্গে আমাকে একত্র করে ফেললে। মাঝে মাঝে এমন সব কথা বলে আমাকে বিপন্ন করে দাও যে, উত্তর খুঁজে পাই না।

মার্গারেট শান্তভাবে বলল ঃ বাবা তুমি তো বল ; প্রেয় হল অন্তরের। প্রেয় থাকে লোকদৃষ্টির অতীত। মানুষের বোধের সীমায় অনুভূতির যতটুকু সাধ্য মানুষের কাছে ততটুকুই ঈশ্বর বা ব্রহ্মের প্রকাশ। এই বিশ্বজগতে প্রত্যেকের মনের ব্রহ্মাণ্ড আছে। উপলব্ধির আলো পড়লে সেখানে সমস্ত মন গান গেয়ে ওঠে।

স্যামুয়েল এক স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখ মেলে চেয়ে আছে মার্গারেটের দিকে। এক মায়াবী আলো ঘিরে আছে তার মুখমণ্ডলে।

অনেককাল আগের কথা। তবু সব ঘটনাই অবিকল একরকম আছে। কোথাও এতটুকু পরিবর্তন হয়নি, কালের চিহ্ন লাগেনি তার গায়ে। জীবনের ছবিগুলো এত গভীর করে দাগ রেখে গেছে যে একুশ বছর পরেও সেইসব ঘটনা ও দৃশ্য তেমনি জীবন্ত এবং প্রত্যক্ষ। মার্গারেটের বিস্ময় লাগে, রাজার চিঠি না পেলে জানা হত না যে, এমন একটা জীবনী উপন্যাস জীবনের মধ্যেই অদৃশ্য কালিতে লেখা হয়েছে। আর সে পাতাটা উল্টে একটার পর একটা জীবনের ঘটনার মধ্যে প্রবেশ করছে।

নীলাসের শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না সংবাদটা পাওয়ার পরেই স্যামুয়েল ভাঙা শরীর নিয়ে ড্যানগানন যাওয়া স্থির করল। মার্গারেট সঙ্গে যাওয়ার বায়না নিল। বলল ঃ অনেককাল ঠাকমাকে দেখি না। তাঁর জন্য মনটা আমার ব্যস্ত হয়েছে। আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চল।

তারপরেই খুশিতে মার্গারেটের দু'চোখ ডগমগ করে ওঠল। স্যামুয়েলের গলা জড়িয়ে ধরে বলল ঃ জান বাবা, ওল্ডহ্যামের চেয়ে টরেন্টন গাঁয়ের এই বাড়িটা সব দিক দিয়ে ভাল। এখানটা বেশ খোলামেলা। চারদিকে অফুরন্ত মুক্তি। প্রাণের কোলাহল। ঠিক আমাদের ড্যানগননের বাড়ির মত। ঠাকমাকে তাই সর্বক্ষণ মনে পড়ে। মাঝে মাঝে কান্না পায়। জান বাবা, ঝোপে ঝোপে পাখির বাসা, তাদের কোলাহল, ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে কত না ঝিঁ ঝিঁ, কত প্রজাপতি বাগানময় ঘুড়ে বেড়াচ্ছে, কত ধরণের পাইন গাছ, বাহারী গাছ দেখতে দেখতে ঠাকমাকে শুধু মনে হয়। তুমি যাচ্ছ যখন আমাকে সঙ্গে নিতে দোষ কী! লক্ষ্মী বাবা আমার।

স্যামুয়েল আমতা আমতা করে বলল ঃ পাগলী মেয়ে। নিয়ে তো যেতে চাই, কিন্তু—

মার্গারেটের একবুক আশা নিয়ে চটপট বলল ঃ তা হলে একা যাওয়ার কথা ভাবছ কেন? তোমারও শরীর ভাল নেই। আমি থাকলে তোমার ভাল মন্দটা দেখতে পারব।

আলবৎ পারবি। তুই তো আমার প্রাণ। তোকে ছাড়া একদন্ড থাকতে পারি না। তবু, আমাকে ড্যানগ্যাননে একা যেতে হবে মা। নহিলে খরচ বাড়ে। বড় টানাটানি যাচ্ছে। সংসারের হাল তো তোর অজানা নয়। কী কষ্ট করে তোর মা সংসারটা চালায় সে তো আমি জানি। এখন কী করি মা, তুই বল।

এত অসহায়ভাবে কথাগুলো বলল স্যামুয়েল যে মার্গারেটের কথা যোগাল না। দু'চোখের কোন ছলছল করে ওঠল। স্যামুয়েলের অসহায় করুণ অবস্থা দেখে কষ্টে মাথা নেড়ে বলল ঃ তুমি যাও। তোমার তো মা।

স্যামুয়েলের হাত দুটি ওর গাল ছুঁয়ে রইল। বলল ঃ এভাবে তোকে রেখে যেতে বুক আমার ফেটে যাচ্ছে। সেখানে গিয়েও আমি শান্তি পাব না। তোর ঐ অসহায় চাহনি আমাকে তাড়া করে বেড়াবে।

যাওয়ার সময় মন খারাপ করতে নেই। আমাদের মত গরীবদের সদিচ্ছাটুকুই সব। ওইটুকু নিয়ে খুশিতে থাকতে হয়। ঈশ্বর বঁড় নিষ্ঠুর। সারা জীবন তাঁর সেবায় যে জীবন উৎসর্গ করল তার জন্য এতটুকু দয়া, করুণা, সহানুভূতি নেই।

দুঃখ-দারিদ্র্য, অভাব-যন্ত্রণা সব মানুষের তৈরি। এগুলি আছে বলেই আমরা ঈশ্বরকে ডাকি, তাঁর শরনাপন্ন হই, তাঁকে প্রাণভরে ডাকি। যেদিন দুঃখ, অভাব কষ্ট ভোগ থাকবে না, সেদিন ঈশ্বরের খোঁজ খবর করবে না কেউ। অন্ধকার আছে বলেই তো আলোর প্রার্থনা করে সে।

সারা জীবন মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোয় আনার জন্য কত কি করলে তুমি, তবু বিধাতা তোমার কপালে সুখ দেয়নি। মানুষের নিত্যনতুন দুর্ভোগ আর সমস্যা তোমাকে ঘিরে ধরেছে। তোমার শ্বাসরোধ হয়ে আসছে। তবু তোমার কাজের নির্মম সমালোচক, তুমি নও। আশ্চর্য তোমার সহিষ্ণুতা।

রাগে, দুঃখে, অভিমানে মার্গারেট পা দাপিয়ে হেঁটে গেল স্যামুয়েলের সামনে দিয়ে। যেতে যেতে বলল ঃ দেয়ার ঈজ্ এ ওয়াল্ বিফোর মী, দেয়ার ইজ্ এ ওয়াল্ বিফোর মী।

ক'দিন পরেই ড্যানগ্যানন থেকে ফিরল স্যামুয়েল। মনে হচ্ছিল, তার ওপর দিয়ে একটা বিরাট ঝড় বয়ে গেছে। আর তাতেই সে বিধ্বস্ত হয়েছিল। মুখে ও চোখে একটা বিষণ্ণ ক্লান্তভাব থমথম করছিল।

মার্গারেটের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারল না। অপরাধীর মত মাথা হেঁট করে নিজের ঘরে ঢুকল। তার এই উপেক্ষায় মার্গারেটের কান্না পেল। খুবই কাঁদতে ইচ্ছে করল। কষ্ট করেই কান্নাটা সংযত করল। অশান্ত মনটাকে শান্ত করতে স্যামুয়েলের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল ঃ বাবা তুমি চুপ করে আছ কেন? তোমার চোখের কোণে জল টলটল করছে কেন? ঠোঁট কাঁপছে কেন? বাবা, ঠাকমার কথা বলছ না কেন? আমার ঠাকমা ভালো আছে তো? ঠাকমার কিছু হয়নি তো? বাবা, চুপ করে থেক না, কথা বল।

স্যামুয়েল দু'হাতে মার্গারেটকে বুকে টেনে নিয়ে বলল ঃ মা নেই। অসহায়ের মত এক অব্যক্ত শোকে ও যন্ত্রণায় মাথা নাড়তে লাগল। বলল ঃ মা নেই।

বাড়ীতে কান্নার রোল ওঠল। কেবল মেরী কাঁদল না। ঠাকমাকে সে দেখিনি কোনোদিন। তার সঙ্গে কোন সম্পর্কও গড়ে ওঠেনি। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। সকলকে কাঁদতে দেখে সে একটু ভেবাচাকা খেয়ে গেছিল।

সব কিছু একসময় স্বাভাবিক হয়ে গেল। স্যামুয়েল কিছুটা প্রকৃতিস্থ হয়ে বলল ঃ ড্যানগ্যাননে পৌঁছতে সন্ধ্যে হয়ে গেছিল। দরজায় টোকা দিতে জর্জ খুলে দিল। আমাকে দেখেই জিগ্যেস করল-আমার পাকা বুড়ী এল না? ওর কথার কী জবাব দেব? বললাম ঃ মা কেমন আছে? জর্জ-থমথমে গলায় বলল ঃ তোদের অপেক্ষায় দিন গুনছে। মনটা দীন হয়ে গেল। মনের মনটা ককিয়ে কেঁদে ওঠল। জুতো জোড়াটা কোনোক্রমে খুলে মার শোওয়ার ঘরে ঢুকলাম। ফায়ার প্লেসের আগুনের আভায় ঘরখানা রক্তিম হয়ে ওঠেছে। খাটে শুয়ে আছে মা। বিছানার সঙ্গে মিশে গেছে বললেই হয়। দু'চোখের কালি পড়েছে। মণি দুটো গর্তে ঢুকে গেছে। মুখে পেলব, মসৃণ ভাবটা ছিল না। গালের চামড়া ঢিলে হয়ে গেছে। ত্বক ফেটে চৌচির হয়েছে। আমার চিরচেনা মাকে চিনতেই পারছি না। প্রতিদিনের সঙ্গী বাইবেলটা বুকের ওপর খোলা অবস্থায় রাখা। হাত নেড়ে তাঁর পাশে বসতে বলল আমাকে। চোখ দুটো কাকে খুঁজছিল। একটা লম্বা শ্বাস পড়ল। মিনমিন করে বলল ঃ সে কোথায়? ওকে সঙ্গে আনতে পারলি না? ওর জন্যে বেঁচে আছি। আর বোধ হয় দেখা হবে না।

মার্গারেট সহসা ককিয়ে কেঁদে ওঠল ঃ ঠাকমা।

কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে কাটল। তারপর ইসাবেলের দিকে চেয়ে স্যামুয়েল বলল ঃ জান ইসাবেল, এক আশ্চর্য মৃত্যু দেখলাম চোখের সামনে। পূণ্যাত্মাদের মৃত্যু এরকমই হয়, হয়তো। কথাগুলো বলে মা চোখ বুজল, আর খুলল না। মুখে স্মিত হাসি। মনে হচ্ছিল, মা ঘুমোচ্ছে। সারা মুখ থেকে জ্যোতি বেরোচ্ছে। বোধ হয় অন্তরে অন্তরে ইস্টের সঙ্গে মিলন হল, তাই বাইরে তাকানো আর অবকাশ রইল না। মার্গারেটই ছিল মার বড় বন্ধন। সে বন্ধনও আর ছিল না। তাই এক দারুণ তৃপ্তিতে মুখখানি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

মার্গারেট কাঁদল না। চোখের জল মুছে থমথমে মুখে ভিতরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। বুকের ভিতরটা তার পাথরের মত ভারি হয়ে রইল।

শীতের মিষ্টি রোদ্দুর পোহাচ্ছিল তার প্রিয় বাগানটি। যতদূর চোখ যায় খালি গাছ আর গাছ। সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। গাছের তলাটা ফাঁকা এবং পরিষ্কার থাকার জন্য অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল। জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে দূরে পাহাড়শ্রেণীর ওপর একটা পুরনো দুর্গ এখনও অতীতের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুর্গের চূড়ার দিকে চোখ দুটো ছড়িয়ে দিয়ে থমধরা এক বিষণ্নতায় যেমন আচ্ছন্ন ছিল তেমনি রইল।

ওল্ডহ্যামের দম আটকানো ঘিঞ্জি পরিবেশ থেকে তাদের নতুন বাড়িটি মুক্ত। এখানে সব কিছুই ভীষণ খোলামেলা-এত বড় আকাশ, এত আলো, এত হাওয়া, বনে বনান্তরে, প্রান্তরে, উপত্যকায় এত মুক্তির শ্বাস যে কোন কিছুই বিষণ্ন করতে পারে না। মনটাও মুক্ত এবং বড় হয়ে যায়। আর তখনই ড্যানগ্যানন

শহরের বাড়ীটার কথা বেশি করে মনে হয়। এখানে ড্যানগ্যাননের সবই আছে, কেবল ঠাকমা আর জর্জ কাকা নেই। ঠাকমা আর জর্জ কাকাই তো তাকে চিনিয়েছিল গাছ, লতা-পাতা, পাখি, ফুল প্রজাপতি। চিনিয়েছিল একটা ছোট্ট শিশুর মনের আবরণ খুলে তার আমিকে চেনাতে। কত ছোট ছিল তখন। তবু সব মনে আছে। একুশ বছর বাদে সেই মনটা আজও নীলাকাশে খোঁজে তার ভাললাগার মুহূর্ত্তকে। মাঝে মাঝে মনে হয় নীলাস মস্ত বড় আকাশ, আর জর্জ কাকা জঙ্গল আর পাহাড়শ্রেণীর মত বিরাট। অনন্তকালধরে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বড় থেকে আর বড় হতে হতে তার জীবনে এক জীবন্ত প্রহরীর হয়ে ধ্রুবতারার মত পথ দেখায়।

সময় দিয়ে থাকে মাপা যায় না তা হল স্মৃতি। এই আনন্দ বেদনা মনের অতলে থরে থরে সাজানো থাকে। যা কিছুতে শেষ হতে চায় না। সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করতে ভাললাগে তাকে। কিন্তু যে বয়সের মধ্যে মার্গারেটের মনটা প্রবেশ করল সেই সময় এবং আনন্দের কোনো কথা তার মনে থাকার নয়। তবু শিশুকালের কিছু কিছু ঘটনা এবং কথা থাকে যা পরিবারের মধ্যে অনেককাল ধরে বেঁচে থাকে। সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করা, ঘ্রাণ নেয়া এবং সমস্ত সত্তার মধ্যে চৈতন্যের মধ্যে সৌরভের মত ছড়িয়ে গিয়ে পুরনো কাল নতুন হয়ে ওঠে। কালচক্রের আবর্তনে তা ঘোরে না, সূর্যের মত স্থির হয়ে আছে। আট বছর বয়সের কত ঘটনাই স্থির বিন্দুবৎ হয়ে আছে এ জীবনে।

দুপুরের রোদ পড়েছে ঘরের মেঝেতে। জানলার পর্দা টেনে দিতেই উজ্জ্বল আলো হঠাৎ নরম আলোয় স্নিগ্ধ করল ঘরটাকে। পরিপাটি বিছানায় স্যামুয়েল হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে। মার্গারেট খুব সন্তর্পণে শিয়রের ধারে বসে চুলের মধ্যে আঙুল সঞ্চালন করতে লাগল।

সেই সময় বাইরে একটা 'চোখ গেল' পাখি ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। স্যামুয়েল অনেকক্ষণ ধরে তার আর্ত ডাকটাকে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করছিল। যতক্ষণ তার ডাকটা শোনা যাচ্ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত শুনতে লাগল। তার উৎকর্ণ অন্যমনস্কতার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বালিকা মার্গারেট বলল ঃ বাবা, অমন করে কী খুঁজছ?

বুকের গভীর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল স্যামুয়েলের। বলল ঃ ঐ পাখিটার ডাক শুনলে আমার বাবার কথা খুব মনে হয়। ঐ বুলিটা বাবার খুব প্রিয় ছিল। রোজই ঐ পাখি দেখত। এতবার করে বিভিন্ন ঋতুতে ওর এত ডাক শুনত তবু, বাবার সাধ মিটত না। চোখে, কানে, মনে লেগে থাকত ঐ পাখির রূপ, রঙ, আকৃতি কণ্ঠস্বর—সব। বাবা বলতেন, ওর গলার স্বরে বিধাতা আয়র্ল্যান্ডের মানুষের বোবা কান্না আর যন্ত্রণার আর্তি বয়ে বেড়ানোর শক্তি দিয়েছেন। ঐ পাখিটাই কেবল উড়ে উড়ে সকলকে মনে করে দেয় কেঁদে কেঁদে পরাধীন আয়র্ল্যান্ডের মানুষের চোখও অন্ধ হয়ে গেছে যেন। ঐ পাখির মত ইংরেজ শাসক যদি এ দেশের স্বাধীনতা প্রিয় মানুষের মনে পরাভবের যন্ত্রণাটা বুঝত তা-হলে আয়র্ল্যান্ডের মানুষকে আত্মগ্লানির বোঝা বয়ে বেড়াতে হত না।

মার্গারেট বিস্ময়ভরা অবোধ চোখ দুটো বাবার কোঠরগত ক্লান্ত দু'চোখের ওপর মেলে ধরে বলল ঃ আয়র্ল্যান্ডের মানুষের কী হয়েছে বাবা। তারা কাঁদে কেন? ঠাকুর্দাও বুঝি তাদের জন্য কাঁদত?

হাঁ মা কাঁদত। দেশের জন্য তোর ঠার্কুদার প্রাণটা কাঁদত। মাকে দেখতে না পেলে তুই যেমন আকুল হয়ে কাঁদিস তোর ঠাকুর্দা তেমনি দেশের মায়ের জন্য কেঁদে কেটে সারা হত।

ঠার্কুদার মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বড় মানুষও তা-হলে কাঁদে! মার্গারেটের ধারনা ছিল, কান্নাটা শুধু ছোটরা আর মেয়েরাই করে। সুতরাং ঠার্কুদার মত একজন বড় মানুষ যে সত্যিসত্যি কাঁদে এটা তার অভিজ্ঞতার বাইরে। তাই বেশ আশ্চর্য হল সে। বিস্ময় বিস্ফারিত দুই চোখ মেলে বাবার ক্লিষ্ট বিষণ্ণ মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বেশ একটু উৎসাহিত হয়ে বলল ঃ দেশ মায়ের কী হয়েছে বাবা? সেজন্য ঠার্কুদা কাঁদে কেন?

স্যামুয়েল মুস্কিলে পড়ল। অবোধ শিশুটিকে কী করে বোঝায় জন নোবলের কান্নার উৎসটা কোথায় এবং কত ধরণের। এ কান্নার মর্মার্থ গ্রহণের বয়স হয়নি মার্গারেটের। দেশ জিনিসটা যে কী তাই বোঝে না সে। দেশমাতা শব্দের তাৎপর্যটা বোঝায় কী করে? স্যামুয়েল ভেবে কুলকিনারা করতে পারল না। একটা বিষণ্ণ মন নিয়ে অসহায়ভাবে মার্গারেটের হাতের ওপর মুখ রাখল। স্নেহবৎসল হৃদয়ে গভীর গাঢ় স্বরে বলল ঃ সবাই মিলে আমরা যে বাড়িতে

থাকি সেটাই আমাদের ঘর। এই ঘরে কেউ যদি কষ্ট পায়, দুঃখ পায় তার জন্য আমাদের মনও কাঁদে। কেউ অসুস্থ হলে, ব্যথা পেলে তার পাশে বসে শুশ্রূষা করি। কেমন আছে জিগ্যেস করে তার কষ্টের প্রতি সমবেদনা জানাই এবং সান্ত্বনা দিই। সেও অনুরূপভাবে আমাদের জন্য ভাবে এবং একই আচরণ করে। এক ঘর মানুষদের নিয়ে একটা পরিবার হয়। সকলে একসঙ্গে না থাকলে, একে অন্যের হাতে হাত না রাখলে, সব-অমিল ভুলে না গেলে, এক হয়ে থাকা যায় না পরিবারে। মমতা, ভালবাসা এবং দরদের ওপরে পরিবারের বাঁচা আর বাড়া নির্ভর করে। দেশও এরকম একটা বৃহৎ পরিবার। এখানে বিভিন্ন বর্ণ, ধর্ম ও ভাষাভাষী মানুষের সঙ্গে সুবিধে অসুবিধের কথা ভুলে গিয়ে পাশাপাশি বাস করে। সবাইকে নিয়ে আর্য়াল্যাণ্ডও তেমনি একটা দেশ। দেশটা মাটি দিয়ে গাড়া নয়। মানুষ নিয়ে জীবন্ত। মানবী মায়ের স্নেহের মত দেশ-মায়ের মমতার অপার সুধা ছড়িয়ে আছে জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষ্যে। এর আকাশে, বাতাসে, আলোতে, বনে বনান্তরে, প্রান্তরে, পাহাড়তলিতে, উপত্যকায় নদী নালায় এত চোখ জুড়ানো সৌন্দর্য, মায়ের মমতা, ভালবাসা, দরদ ও আনন্দ লুকোনো আছে যে এসব ছেড়ে থাকতে ভাল লাগে না। শ্রদ্ধায়, ভালবাসায় কৃতজ্ঞতায় দেশের মানুষের মন দীন হয়ে যায়। এরই নাম দেশপ্রেম। সংসারে মায়ের প্রতি যেমন কর্তব্য থাকে তেমনি দেশের প্রতি দেশবাসীরও কিছু করার দায়িত্ব থাকে। সবাই মিলে পরিবারের সম্মান, মর্যাদা, গৌরব বাঁচিয়ে রাখার জন্য যেমন সর্বদা তৈরি থাকে তেমনি দেশের গৌরব, দেশের স্বাধীনতা, দেশের সম্পদ রক্ষার দায়িত্ব নেয় দেশের মানুষ।

স্যামুয়েলের শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে গেছিল। খুশ খুশ করে কাশছিল। মার্গারেট তাড়াতাড়ি করে জলের গ্লাসটা স্যামুয়েলের দিকে মেলে ধরল। তৃষ্ণার্তের মত বেশ খানিকটা জল ঢক ঢক করে খেল। তারপর জলের গ্লাসটা তার হাত থেকে নামিয়ে রাখল।

বাবা তার সুন্দর গল্প বলে। গলার স্বরে তার জাদু আছে যেন। গল্পে কথা বলার ভঙ্গীটাই সব। ভাবের পর্দার ওপর নিখুঁত ভাষা ব্যবহারের মুনসিয়ানায় গল্প জীবন্ত হয়ে ওঠে। ভাবও ভাষা নিজেই চলকে চলকে চলে শ্রোতাকে এক অদৃশ্য রহস্যলোকের দিকে নিয়ে যায়। সেই মুহূর্তটা শ্রোতার কাছে সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্ত। স্যামুয়েলের কথাগুলোতে এক আশ্চর্য তন্ময়তা সৃষ্টি হয়।

বিশ বছর আগের ঘটনা, তবু একটা ঘোরের মধ্যেই অতীতকে দেখতে পাচ্ছিল। একটা সুন্দর স্বপ্নের মত,-ডানা ঝাপ্টাতে ঝাপ্টাতে স্বপ্নের মানুষ অনেক পাহাড়, নদী, মাঠ পেরিয়ে উড়ে আসত। ঠাকুর্দা জন নেবেলের সঙ্গে স্বপ্নে মিলন হত। স্বপ্নের নায়কের মুগ্ধ করা কথাগুলো সে স্পষ্ট শুনতে পেত।

অভিভূত আচ্ছন্নতার ভেতর রূপ, রঙ, ছবি শিহরণ তুলে তাকে চমকে দিত। আশ্চর্য সেই মুখখানা স্থায়ী হত না, স্বপ্নেই হারিয়ে গিয়ে স্যামুয়েলের মুখে রূপান্তরিত হত। আর সে দেখত ঃ পাদ্রীদের সাদা আলখাল্লা পরা পোশাকে স্যামুয়েলও ভারতের সন্ন্যাসীর মত বুকের ওপর দু'বাহু বেষ্টন করে মার্গারেটের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছে। আর সে একাগ্রচিত্তে শুনছে। প্রিয়তম কন্যাটির যীশুর প্রতি ভক্তি দেখে স্যামুয়েল মৃদু মৃদু হাসছে যেন। ঐ হাসিতে তার মন ভেসে গেল সুদূরে। যাকে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, প্রাণে আনন্দ হয়, আত্মার তৃপ্তি হয়, বাতাস মধুর হয় সেই পিতা স্যামুয়েলকে সে দেখছিল। আঠারো বছর আগের ঘটনা। অথচ, কী আশ্চর্য ন'বছরের মার্গারেট সেই ঘরে পিতার খাটের পাশে বসে আছে। আর আঠাশ বছরের মার্গারেট তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে এবং তার সঙ্গে কথা বলছে। আর সে তা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে।

ক্ষয়রোগাক্রান্ত স্যামুয়েলের শীর্ণ, শ্রান্ত কঙ্কালসার দেহটা বিছানার সঙ্গে একেবারে মিশে গেছে। খক খক করে ঘনঘন কাশছিল সে। বাঁ পাশের পাঁজরের ওপর সজোরে চেপে ধরে কাশির বেগটাকে প্রাণপণে দমন করার চেষ্টা করছিল। তারই মধ্যে আদরের কন্যাটির সঙ্গে কথা বলার কী প্রানান্তকর চেষ্টা তার। কথা বলার সময় চোখ মুখ রাঙা হয়ে গেল তার। কষ্ট হচ্ছিল শ্বাস নিতে। হাঁফাচ্ছিল ভীষণ। মুখের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে মার্গারেট তার কষ্ট লাঘব করার জন্য বুকটা ডলে দিতে লাগল। স্যামুয়েল মুখের কাছ থেকে তাকে জোর করে সরিয়ে দিয়ে বলল ঃ আমার কাছে আসতে নেই মা। এই কালব্যাধি যাকে ধরে, শেষ করে ছাড়ে তাকে। সবসময় আমার থেকে দূরে থাকতে হয়।

মার্গারেটের বুকটা কেমন করে ওঠল। ব্যাকুল কণ্ঠে বলল ঃ বাবা ওসব কথা বল না, আমার ভীষণ ভয় করে। তুমি তো যীশুর সেবক। তিনি করুণা করবেন তোমাকে। তাঁর হাতের অমৃত ছোঁয়ায় কত কুষ্ঠরোগী, ক্ষয়রোগী আরোগ্য লাভ করেছে। তবু তোমার বেলায় তাঁর করুণার এত অভাব কেন? তাঁকে কত ডাকি দিনরাত। কত বলি, প্রভু আমার বাবাকে ভাল করে দাও। বাবাকে তুমি পরিত্যাগ কর না। তোমার দয়া, করুণা না পেলে তিনি বাঁচবেন কেমন করে? তোমার মহিমার কথা শোনাবে কে? প্রভু আমি কিচ্ছু চাই না, আমাদের সব দোষ, অপরাধ মার্জনা করে দাও। পাপ, অন্যায়, গ্লানি মন্থন করে তুমি আমাদের অন্তরে ফিরে এস। বাবাকে নতুন জীবন দাও। বলতে বলতে তার দু'চোখের কোণ জলে ভরে গেল। ফোঁটা ফোঁটা হয়ে গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল অঝোরে।

মার্গারেটের ছেলেমানুষীতে হাসল স্যামুয়েল। বিষণ্ণ মলিন হাসি সে। বলল ঃ পাগলী মেয়ে। তাঁর কোনো অভাব নেই, দৈন্য নেই। তাই তো অকাতরে নিজেকে নিবেদন করেছিলেন মানুষের সেবায়। কিন্তু আমরা তাঁর সেবায়

ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁকে না বুঝে হত্যা করেছি। তাঁর করুণা তাই, পৌঁছায় না আমাদের কাছে। তাঁর অমিয় মহিমা, প্রেম, মহানুভবতা প্রচার করার নাম করে মানুষকে ঠকাচ্ছি, বঞ্চিত করছি এবং শোষণ করছি নানাভাবে। দারিদ্র্য, অসহায়তার সুযোগ নিয়ে করুণার হাত বাড়িয়ে আমরা অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের ধর্মবিশ্বাস কেড়ে নিয়ে যীশুর নামে এক ক্রীতদাস শ্রেণী তৈরি করছি। যীশুর নিঃস্বার্থ সেবা, প্রতিদানহীন করুণা, প্রেম, খ্রীষ্টান মিশনারীদের কোথায়? যে প্রেম ছিল করুণার, উদার, মুক্ত এবং অকৃপণ তাকে আমরা সকলে ক্রুশবিদ্ধ করেছি। প্রতিনিয়ত এভাবে আমার প্রেমের ঠাকুরকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করছি।

পিতাকে বাধা দিয়ে উদ্বিগ্ন গলায় মার্গারেট বলল ঃ বাবা, তুমি কাশছ, উত্তেজনায়, হাঁফাচ্ছ। এখন চুপ কর। একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার বলো।

স্যামুয়েল প্রিয়তম কন্যার কোন নিষেধ শুনল না। বলল ঃ কোরাণে হজরত মহম্মদ বার বার বলেছেন যে, যীশু কখনও ক্রুশবিদ্ধ হননি। যীশুকে কেউ ক্রুশবিদ্ধ করতে পারে না। এটা শুধুই রূপক। আমারও তাই মনে হয়। গোষ্ঠী এবং সম্প্রদায়ের একটা ছোট্ট গণ্ডীর মধ্যে তাঁর বিশালত্বকে বন্দী করে রেখেছি। তাঁর অকৃপণ করুণাকে কৃপণ করুণায় পরিণত করে প্রেমের মানুষকে ছোট করেছি। কথাগুলো বলার সময় স্যামুয়েলের মুখখানা এক আশ্চর্য সুখে ও আনন্দে জ্যোর্তিময় হয়ে ওঠল। কিন্তু দমকা কাশিতে দম আটকে যাওয়ার মত হল।

বেশ একটু অস্থির দেখাল মার্গারেটকে। চোখে মুখে তার বিপন্ন অসহায়তার ভাব প্রকট হল। অধৈর্য হয়ে বলল ঃ দোহাই বাবা, চুপ কর। কথা বললে তোমার কষ্ট হয়। জেনে শুনে এত কষ্ট দাও কেন নিজেকে? আমি তো সর্বক্ষণ তোমার পাশেই আছি। ধীরে সুস্থে একটু একটু করে বললেই তো হল। তারপর একটু কপট রাগ করে ছোট্ট মার্গারেট তার মুখের কাছে তর্জনী তুলে বলল ঃ এবার যদি ফের কথা বল. তাহলে চলে যাব।

খুব কষ্ট করে স্যামুয়েল হাসল। বিষণ্ণ হাসি। ক্ষীণ কণ্ঠে বলল ঃ তুই কাছে থাকলে বড় শান্তি পাই মা। মনটাও আনন্দে ভরে যায়। তোকে যে অনেক কথা বলার আছে মা। সময় ফুরিয়ে আসছে। বলার সময় যদি না পাই আর—

বুকটা হাহাকার করে ওঠল মার্গারেটের। চমকানো আতঙ্কে আর্তকণ্ঠে বলল ঃ বাবা, অমন কথা বলতে নেই। আমাকে ভয় দেখিয়ে তুমি বুঝি মজা পাও। একটু চুপ করে থেকে বলল ঃ আমি থাকলে তুমি শুধু বক বক করবে!

পাগলী! স্যামুয়েল, ক্লান্তিতে বেশ কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে স্থির হয়ে শুয়ে রইল। কিছুক্ষণ কাটার পর লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে বলল ঃ মার্গারেট যতটুকু সময় পার, বুক ভরে পৃথিবীর বাতাস নেব। তারপর একসময় ঘুমিয়ে পড়ব কোনও মস্ত মহীরুহের স্নিগ্ধ ছায়ায় ঘুমোব। টানা ঘুম। কোনও কাজ নেই।

ব্যস্ততা নেই, কারো ওপর দাবি নেই, কোনো প্রত্যাশা নেই। শুধু ঝির ঝিরে হাওয়া, পাখির ডাক, ঝরাপাতার দীর্ঘশ্বাস আর শুভ্র ফলকের ওপর একটা ব্যর্থজীবনের নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার নাম লেখা থাকবে স্যামুয়েল নোবল। শুকনো পাতারা আছড়ে পড়ে অস্ফুট স্বরে কাঁদবে।

মার্গারেট স্যামুয়েলের মুখের ওপর হাত চাপা দিয়ে ব্যাকুল গলায় কাঁদ কাঁদ বলল ঃ বাবা, আর বল না। আমাকে আর কত যন্ত্রণা দেবে?

মার্গারেটের কচি হাত দুটো হাতের মুঠোয় চেপে ধরল। তার নিজের চোখেও জল এসে গিয়েছিল। বুকের ওপর কন্যার হাতটা চেপে ধরে চোখ বুজল। স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল। গভীর সুখে উচ্চারণ করল ঃ আঃ কী আরাম। ঈশ্বরের ভালবাসায় অভিবিক্ত হল আমার হৃদয় মন। যে ভালবাসা মানুষের সমবেদনায় গভীর, ব্যাকুলতায় সুন্দর, নিবেদনে ধন্য, প্রতিদানের অপেক্ষা করে না, তাকেই বলে ঈশ্বর প্রীতি। এই অনাবিল আনন্দ, শুদ্ধ আত্মার সঙ্গলাভে এজীবন যখন কানায় কানায় ভরে ওঠে তখনই ঈশ্বর লাভ হয় অন্তরে। মানুষী ভালবাসায় আমরা এবং ঈশ্বর এক হয়ে যাই।

স্যামুয়েলের চুলের মধ্যে বিলি কেটে দিতে দিতে মার্গারেট আকুল কণ্ঠে বলল ঃ বাবা, তোমার কাশিটা বেড়েছে। একটু কম কথা বল।

মার্গারেটের হাতখানা স্যামুয়েল তার মুঠোর মধ্যে নিয়ে বলল ঃ একটা গল্প বলি শোন, তুই তখন ছোট্ট। বছর চার বয়স হবে। আর্য়াল্যান্ডের রাষ্ট্রভর শহরে ড্যানগাননে আমার মার কাছে থাকতিস। একটা সুন্দর লন ছিল আমাদের। সাজানো গোছানো একটা উদ্যান। তোর প্রিয় বাগিচা ছিল ওটা। ওল্ডহ্যাম থেকে মাঝে মধ্যে যেতাম-আসতাম। বিকেলটা তোকে সঙ্গ দিতেই হতো। ঐ সময়ে হরেক রকম খেলা করতে হত রোজ। খেলতে খেলতে একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়তিস। খেলতে যখন ভাল লাগত না, মার কাছে যাওয়ার বায়না করতিস। একটা সুন্দর পুতুল আর কাল্পনিক গল্প বলে তোকে আরো কিছুক্ষণ আটকে রাখার চেষ্টা করতাম। কিন্তু মনটা তোর তখন মার কাছে যাওয়ার জন্য পাগল। মাকেই দরকার। মা ছাড়া অন্য কেউ হলে হবে না। খেলাতেও আকর্ষণ নেই, প্রিয় পুতুলের প্রতি মমতা নেই। খেলা রেখে হাত পা ছুঁড়ে মার কাছে যাবার কান্না ধরেছিস। যতক্ষণ না ছেড়ে দিতাম, ততক্ষণ পর্যন্ত কান্না থামত না। মার কাছে গেলে একেবারে অন্যরকম হয়ে যেতিস। গোটা ব্যাপারটা ভীষণ উপভোগ করতাম আমি। আজ ঐ ছবিটা খুব মনে পড়ছে। এই পৃথিবীতে আমরা সবাই ঐ শিশুর মত। অর্থ সম্পদ নিয়ে ভুলে থাকি। একসময় মন ভরে না তাতে। তখন জননীরূপিনী ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার জন্য মনটা ব্যস্ত হয়। এইটা নিয়ম। সব তৃষ্ণা একদিন ঐ অনন্তের কাছে গিয়ে হয়। যীশু আমাদের অন্তরের মধ্যে আছেন। গভীর ভালবাসার মধ্য দিয়ে আমরা উপলব্ধি করি তাঁকে। খ্রীষ্টকে

যখন অন্তরে পাই আনন্দে তখন মন ভরে যায়। তোমার মা'র কাছে যাওয়ার মতই সে তৃপ্তি।

মার্গারেটের দু'চোখ ভরে জল নামল। আর তাতেই চমকে গেল সে।

বাবাকে হারানোর আশঙ্কায় মার্গারেটের বুকটা উত্তাল হয়ে ওঠল। নাভি থেকে ওঠে আসা একটা কান্নার বেগকে কিছুতে শাসন করতে পারছিল না। তার আবেগের তরঙ্গ উত্তাল হয় বুকে। বালিকা মার্গারেটের কী শক্তি আছে যে এই হৃদয়াবেগের সঙ্গে লড়াই করে? স্যামুয়েল তার জীবনে এক মস্ত আকাশ, তার বেঁচে থাকার বাগিচা, হঠাৎই এক অদৃশ্য জাদুকরের হাতে মরুভূমি হয়ে গেল। আর সেখানে সে একা। একেবারেই একা। চারদিকে শুধু বালির সমুদ্র।

বাবার মৃত্যু দৃশ্যটা সে সহ্য করতে পারছিল না। তবু ঐ জড়ৎ প্রস্তুরীভূত মানুষটি এক প্রবল সম্মোহনে বাড়ীশুদ্ধ সবাইকে তার কাছে আটকে রাখল। পিতার এহেন মৃত্যু দৃশ্য মার্গারেট দেখতে চায় না, কিন্তু না দেখেও উপায় ছিল না।

বিছানার সঙ্গে শরীরটা মিশে গিয়েছিল স্যামুয়েলের। কথা বলার শক্তি ছিল না। তবু অন্তর্ভেদী দৃষ্টি মেলে তার দিকে তাকিয়েছিল। বলল ঃ এলিজাবেথ, মা আমার একটু সরে বস। অমন করে আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়তে নেই। ...এ সময়ে সকলের মুখ মনে পড়ে, আমারও মনে পড়ছে সকলকে। কোন মহাশূন্য থেকে ভেসে আসছে সঙ্গীতের সুর, ফুল বিছানো রাস্তা, সব কিছু ছায়াময়। কি অপার বিস্ময় আমার চারদিকে?

তারপর ইসাবেলের দিকে হাতখানা প্রসারিত করে দিয়ে বলল ঃ মেরী কাঁদছ তুমি, কাঁদতে নেই। তুমি আমার বন্ধন, এ সময়ে তুমি তো আমায় মুক্তির পথ দেখাবে। কালের ঘণ্টাধ্বনি বাজছে। তোমরা শুনতে পাচ্ছ না, কিন্তু আমি শুনতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে, কোনো পুণ্যতোয়া নদীর ধারা আমাকে ধুইয়ে দিয়ে যাচ্ছে। কী ভাল লাগছে! আমার কোনো কষ্ট নেই। স্বর্গে পৌঁছে গেছি যেন। স্বর্গের দরজাটা আমার জন্য খোলা রয়েছে।

একটা ক্লান্ত, বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাস পড়ল স্যামুয়েলের। হঠাৎ গলা থেকে একটা ঘর ঘর শব্দ বার হতে লাগল। স্বরভঙ্গ হল তার। মার্গারেটের দিকে তাকিয়ে ভাঙা গলায় ঢোক গিলে বহুক্ষণ ধরে থেমে থেমে উচ্চারণ করল ঃ ভগবান যেদিন ওকে ডাক দেবেন তোমরা বাধা দিও না। নিজের পথে ওকে চলতে দিও। ও পাখা মেলবে দূরের আকাশে আমি জানি। আমরা যা পারেনি মেয়ে হয়ে সেই কাজ করার শক্তি বিধাতা ওকে দিয়েছেন। ও এসেছে একটা কিছু করার জন্য ধর্মের ডাক শুনে যদি ও ইংলন্ড ছাড়তে চায়, ওকে বাধা দিও না।

মেরীর ইসাবেল স্বামীর বুকের ওপর দু'খানা হাত রেখে ব্যাকুল গলায় বলল ঃ ওগো, তুমি চুপ কর। আমি আর শুনতে পাচ্ছি না। আমার দুঃখ শুধু, তোমার এত কষ্ট আমায় দেখতে হচ্ছে। আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।

মার্গারেট ও মে স্যামুয়েলের শিয়রে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। প্রাণপণে ঠোঁট দুটি চেপে কান্না সংবরণ করছিল।

স্যামুয়েলের অস্বাভাবিক শ্বাসের শব্দ ক্রমেই ঘরখানা ভরে তুলছিল। এত বিষণ্ণ এবং যন্ত্রণাদায়ক শব্দ মার্গারেট আগে কখনও শোনেনি। একটু একটু করে স্যামুয়েলের চৈতন্য হারিয়ে যাচ্ছিল। চোখের পাতায় এক অন্তহীন ঘুম নামল তার। মার্গারেট ও মেরি মমতা-ভরা সেবা শুশ্রূষায় নিজেদের উজার করে দিয়েও ঠেকাতে পারছিল না অবরুদ্ধ হৃদয়াবেগ।

গোটা ঘরখানা থমথম করছিল। মেরী ইসাবেল স্থবির ও প্রস্তরীভূতপ্রায় স্যামুয়েলের হাতখানা তুলে নাড়ীর গতি দেখল। ভুরু কিছু কুঞ্চিত হল। যথাযথ উদ্বেগ ও শঙ্কার মুখখানি পাণ্ডুর ও বিবর্ণ হল। তারপরেই সরু স্বরে কেঁদে ওঠে স্যামুয়েলের বুকের ওপর আছড়ে পড়ল। তাকে জাপ্টে ধরে কাঁদতে লাগল। হঠাৎ ঝড়ে ঘরের ছাদ উড়ে গেলে যেমন মানুষের অসহায় লাগে, বিপন্নবোধ করে তেমনই একটা শূন্যতা ও বিচ্ছিন্নতায় আক্রান্ত হয়ে সে কাঁদতে লাগল। সেই মুহূর্তে চোখের জল মুছে মার্গারেট নিঃশব্দে ওঠে দাঁড়াল। মুখে বিষাদ ও শোক থমকে আছে। নিজের নিঝুম শরীরে এক ধরনের শীতলতা অনুভব করছিল। শীত নয়, কেমন জমাট, শক্ত পাথরের মত অমোঘ এক শীতলতা তার দুই পা অনড় এবং অবশ করে রাখল। মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছিল। নানারকম কাল্পনিক দৃশ্যাবলী ভেসে যাচ্ছিল। আর স্যামুয়েল না থাকা জনিত কেমন একটা বিপন্ন অসহায়তা, ভয় ও উদ্বেগ চারদিক থেকে তাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছিল। ভিতরকার উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠাকে সামাল দেবার জন্য নিষ্প্রাণ স্যামুয়েলের দিকে একবার তাকাল। ওই তাকানোটা তার বুকে শেলের মত বিঁধল। স্যামুয়েলের ভিতরে যে আগুন ছিল তা নিবে গেছে। কিছুতেই তা আর উত্তপ্ত হবে না। ওই মানুষটি এই মুহূর্তে আর ভাবছে না তার স্ত্রী ও কন্যারা আছে। এমন কি নিজের দেহ কিংবা অস্তিত্ব কিছুই অনুভব করছে না। এই দেহটিও একটু পরে মাটির অভ্যন্তরে সমর্পিত হবে! তখন স্যামুয়েল কোথায়? প্রশ্নটা হঠাৎই একটা দীর্ঘশ্বাসকে পাক দিয়ে দিয়ে ঘুরতে লাগল ঘরময় যার নাম হাহাকার।

স্যামুয়েলের মৃত্যুতে ইসাবেল ভীষণ একা হয়ে গেল। ছেলে মেয়েরা সকলে ছোট। মার্গারেটের বয়স তখন দশ। সব সন্তানই নাবালক। সংসারকে

কপর্দক শূন্য করে স্যামুয়েল চিরকালের জন্য বিদায় নিল। দুর্ভাবনায় মুষড়ে পড়ল ইসাবেল। চোখের সামনে নিকষ কালো অন্ধকার। যীশু একোন পরীক্ষায় ফেলল তাকে। মায়ের বিলাপ এবং তার দীর্ঘশ্বাস পতনের শব্দ এখনও স্পষ্ট শুনতে পায়।

ছেলে মেয়ের অসহায় মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকত শূন্য দৃষ্টি মেলে। আকুল হয়ে বলে ঃ তোদের নিয়ে এখন আমি কি করি বলত? কোথায় যাব? কী করব? কীভাবে সংসার চলবে? তোদের খাওয়াব কি? বাড়ি ভাড়ার টাকা কোথা থেকে আসবে? কার আশ্রয়ে ওঠব? তোদের দু'বোনের লেখাপড়ারই বা কী হবে? এসব ভাবনা সর্বক্ষণ ছিঁড়ে খাচ্ছে আমাকে।

সেকথা শুনে মার্গারেটের মন খারাপ হয়ে যায়। হঠাৎই তার বয়স যেন বেড়ে যায়। মাকে শান্ত করতে বলল ঃ মা, অত ভাব কেন বলত? বাবা বেঁচে থাকতে তো কত দুঃখ-কষ্ট, অভাবের ভেতর সংসারটাকে চালিয়ে নিয়ে গেছ। বাবাকে বুঝতে দাওনি সংসারে কোথায় কী হচ্ছে। ঝড়-ঝাপ্টা সব একা সহ্য করেছ। তা-হলে, আজ তুমি ভেঙে পড়ছ কেন? মাথার ওপর ঈশ্বর আছেন। ধ্রুবতারার মত তিনিই পথ দেখাবেন।

তবু স্যামুয়েল ছিল। সে থাকতে কখনও এত অসহায় বোধ করিনি। জীবনটা এমন শূণ্য মনে হয়নি। এক ঘোর অন্ধকারের মধ্যে বাস করছি। আজ এই পরিবারের সব দায় দায়িত্ব আমার একার। মাথার ওপর ছাদটাই উড়ে গেছে। আমাদের কোনো আশ্রয় নেই, উপায় নেই। একটা মানুষ না থাকতে এত নিঃস্ব লাগে কেন? হঠাৎই মার্গারেটকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে তার চোখে চোখ রেখে ইসাবেল আকুল কণ্ঠে বলে ঃ ও, মার্গারেট। আমি আজ এত একা কেন? কেন আমার এত একা লাগছে? তোরা আছিস, তবু মনে হচ্ছে, তোরা কেউ নেই আমার পাশে। শোকের সহানুভূতি সমবেদনার একটা সৌজন্যসূচক স্তব্ধতা বিরাজ করছে চতুর্দিকে। কিছুদিন পরে পাওনাদারেরা আসবে। কী যে করব, ভেবে হদিস করতে পারছি না, মা।

মার্গারেটেরে বুকের ভেতরটা হাহাকার করে ওঠে। সরু স্বরে কেঁদে ওঠল। তবু ছোট্ট দুটি হাত দিয়ে মায়ের চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে বলল ঃ মাগো ভেঙে পড়া সহজ। কিন্তু ভেঙে গিয়েও বেঁচে ওঠতে হয়। বাঁচাটাই নিয়ম। ঝড়ে ভাঙা একটা গাছেরও ভাঙা জায়গা থেকে আবার নতুন করে কচ গজায়। চিরন্তন ভেঙে পড়া বলে কিছু নেই। এই মুহূর্তে দাদামশাই থাকলে বোধ হয় নিজের মনে জোর পেতে। উত্তর আয়ল্যান্ড থেকে এখানে পৌঁছতে তো একটু সময় লাগবেই। সে সময়টা পার হওয়ার আগেই তুমি উতলা হচ্ছ কেন? অতটা উৎকণ্ঠিত হওয়ার কী আছে? এখন মনে হচ্ছে, তোমার মনটা

খুব শক্তপোক্ত নয়। অথচ, একদিন জীবনের জন্য,বাবার তৃপ্তির জন্য সবরকম কষ্ট অসুবিধে কাঁধ পেতে নেয়ার দুঃসাহস ছিল তোমার।

ইসাবেল দিশাহারা চোখে চেয়ে সর্বাগ্রজ কন্যাটিকে দেখছিল। স্যামুয়েল বলত, এ মেয়ে ভবিষ্যতে খুব বড় কেউ একজন হবে। সব দিকে ওর চোখ। তোমার ছোট্ট ঘরের চোহদ্দির মধ্যে ওঁকে আঁটে না। আটকানোর কোনো চেষ্টা কর না। চোখের দৃষ্টি এই বয়সেই কী গভীর। কেমন ধারাল চেহারা দেখেছ। ঐ মেয়ের কল্যাণে আমরা অমর হয়ে থাকব। কথাগুলো মনে হওয়ার সঙ্গে এক আশ্চর্য সুখে এবং শান্তিতে মনটা ভরে যেত। কিন্তু সে অনুভূতি আজ হল না। পরিবর্তে একটা ভয় ও নিঃসঙ্গতাবোধে সর্বক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে রইল।

দুর্ভাবনা মুক্ত করতে মার্গারেট মাকে ভরসা দিয়ে স্বগতোক্তি করল ঃ আমার মন বলছে, বিকেলের মধ্যে দাদামশায় ঠিক এসে যাবে।

কাকতালীয়ভাবে সেই মুহূর্তে একটা ফিটন গাড়ী এসে থামল দরজার সামনে। রিচার্ড হ্যামিলটন মালপত্তর হাতে করে গাড়ী থেকে নামল। কলিংবেলটা হঠাৎই জোরে বেজে ওঠল। কেমন একটা উদভ্রান্ত উত্তেজনায় ইসাবেলের বুকখানা কেঁপে ওঠল। বুকের মধ্যে দুটো হৃৎপিণ্ডই ধুক ধুক করছিল তার।

হ্যামিলটনের হাত পা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল। ইসাবেলের দিকে চোখে তুলে তাকাতে মুখখানায় বিমর্ষতার ছায়াপাত ঘটল। অশ্রুভারাক্রান্ত দু'চোখে পিতা হ্যামিলটনের দিকে কয়েকটা মুহূর্ত চেয়ে থেকে বলল ঃ ভেতরে এসে।

হ্যামিলটনকে ইসাবেলের মেয়েরা চেনে না। তারা প্রথম দেখল তাকে। লোকটি কে ইসাবেলও বলল না। শোকের বাড়ীতে আত্মীয়তার বন্ধনও শিথিল হয়ে যায়। সম্পর্কটা কেমন একটা দূরত্ব রচনা করে। তাই হ্যামিলটন একটু অস্বস্তিতে পড়ল। তথাপি, সর্বক্ষণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল এই অপরিচিতের দূরত্ব অতিক্রম করতে।

থম ধরা বিষণ্ণতায় ঘরখানা স্তব্ধ। সারি সারি কটা প্রাণী পাশাপাশি ঘন হয়ে বসে আছে। তবু কেউ কোনো কথা বলছে না। এত কাছের মানুষ হয়েও ধরা ছোঁয়ার বাইরে তারা।

মাথা হেঁট করা অবস্থায় হ্যামিলটন কন্যার সংসারের হালটাকে ভাল করে দেখে নিল। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর নাতনি এবং নাতির দিকে চেয়ে অস্ফুট স্বরে বলল ঃ আমাকে তোমরা চেনা না। কিন্তু আমি কে, জানতে চাইলে না তো।

তার আচমকা প্রশ্নে হঠাৎই ঘরের ছবিটা বদলে গেল। প্রস্তরীভূত মানুযগুলো সহসা নড়ে উঠল। কথা বলার সময় মার্গারেটের ঠোঁট ঈষৎবেঁকে গেল। বলল ঃ আমাদের দাদামশাই রিচার্ড হ্যামিলটন। উত্তর আয়র্ল্যান্ড থেকে টরেন্টনে এসেছেন আমাদের দেখতে।

কেমন করে জানলে?

বড় বড় চোখ করে মার্গারেট তাকিয়ে রইল তার দিকে। বলল ঃ এখানে আমাদের আপনজন বলতে কেউ নেই। এক বুক উৎকণ্ঠা, স্নেহ মমতা নিয়ে প্রাণের টানে এমন করে দৌড়ে আসার মানুষ দাদামশাই ছাড়া কে হতে পারে।

দশ বছরের বালিকা মার্গারেটের মুখে এমন মন গলানো কথা শুনে চমকে ওঠল হ্যামিলটন। বলল ঃ ইসাবেল তোর মেয়ে কিন্তু সুন্দর কথা বলে। ওর কথাগুলো মনকে ছুঁয়ে যায় কত সহজে। মনে হল ও আমার বন্ধ ঘরের দরজাটা একেবারে হাট করে খুলে ধরেছে। অমনি ফুরফুরে হাওয়ায় আমার শরীর মন জুড়িয়ে গেল। এত দুঃখের মধ্যেও ভালো লাগছে।

মার্গারেট লজ্জা পেয়ে দাদামশাইকে ধমক দিয়ে বলল ঃ এসব ভাবের কথার কোনো দাম নেই। মন আর চোখ সবসময়েই সংসারের নেই আর নেইর আস্তাকুঁড়ে ঘাঁটছে। মানুষের পৃথিবীটা মনে হয় এক ভয়ঙ্কর জঙ্গলের জায়গা। বোধ হয় সত্যিকারের জঙ্গলের জীবন এর চেয়ে অনেক ভাল। সেখানে যে যার মত করে বেঁচে থাকে। প্রাগৈতিহসিককালের মানুষও টাকা কড়ির মূল্য কী জানত না। তাদের আত্মজন বলতেও কেউ ছিল না। কিন্তু সভ্য মানুষের হাজার রকম সমস্যা নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়।

বিস্ফারিত চোখ মেলে চেয়ে রইল রিচার্ড হ্যামিল্টন। কন্যার আতঙ্কমাখা মুখখানা তার পছন্দ হল না। ইসাবেলের বলার অপেক্ষা না করে হ্যামিলটন মার্গারেটের কথার জবাবে বলল ঃ আমি তো আছি দিদি ভাই। তোমাদের সব দায়িত্ব আমার। তোমার মাকে এসব নিয়ে ভাবতে হবে না। তোমরা বরং দু'চারদিনের ভেতর জিনিস পত্তর সব গুছিয়ে নাও। এ জায়গায় তোমাদের আর থাকতে হবে না। আমরা আর্যল্যাণ্ডে ফিরে যাব।

কথাটা বলার সময় তার এক চোখ মার্গারেট আর এক চোখ ইসাবেলের ওপর ছিল। কন্যাকে শুনিয়েই ঐ কথাগুলো বলল। মেয়েকে তার ভীষণ ভয়। এই মেয়েটি তার প্রখর বুদ্ধিমতী এবং অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্না। কী কথা থেকে কী বুঝবে কে জানে? পিতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতাকে পাছে দয়া, করুণা কিংবা সমবেদনা ভেবে প্রত্যাখান করে দেয় ইসাবেল তাই ভয়ে বুকটা ঢিপ ঢিপ করতে লাগল।

ইসাবেল একটুক্ষণ চোখ বুজে যীশুর করুণা স্মরণ করল। মনে হল পতিত পাবন যীশু ভক্ত স্যামুয়েলের পরিবারকে বিপদ থেকে পরিত্রাণ করতেই যেন হ্যামিলটনকে পাঠাল। রাষ্ট্রেভর শহর ছেড়ে আসার ছ'বছর পরে বাবা তাকে প্রথম দেখতে এল। এই দুঃখে, আনন্দে, অভিমানে তার দু'চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত হল। বোজা চোখের কোণ বেয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল তার সাদা

গাউনের ওপর। রিচার্ড হ্যামিলটনের বুকখানা হায় হায় করে ওঠল। মমতা মাখানো হাত দিয়ে ইসাবেলকে বুকের খুব কাছে টেনে নিয়ে বলল ঃ পাগলী মেয়ে। কেঁদে কী হবে? যা হওয়ার হয়ে গেছে। এখন শান্তভাবে সব কিছু সমাধান করতে হবে। সে জন্য তো আমার আসা।

ইসাবেল চিরকাল একটু বেশি স্বাবলম্বী এবং আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মেয়ে। তাই বাবার কথাগুলো মুখ বুজে শুনল। শোকাচ্ছন্ন গলায় বলল ঃ কোথায় নিয়ে যাবে? মার্গারেট, মেরীর পড়াশুনা কী হবে?

মার্গারেট হঠাৎই মায়ের উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠাকে চাপা দেবার জন্য বলল ঃ মা, তুমি বড্ড ভাব। হতাশ হওয়ার কী আছে? দাদা মশাই তো আছে। মাথার ওপর ঈশ্বর আছেন। তাঁর ও নিজের বুদ্ধির ওপর ভরসা রাখ। ভবিষ্যতের ভাবনা আর কত করবে? ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। উপায় একটা হবেই।

ইসাবেলের বুকটা হঠাৎ আকুল হয়ে ওঠল। বলল ঃ আমাকে তুমি ভুল বুঝ না বাবা। শুনতে পাই, তোমার ব্যবসা ভাল যাচ্ছে না। ইদানীং আয়র্ল্যাণ্ডের রাজনীতি নিয়ে মাতামাতি করার জন্য বাজারে বহুটাকা বাকি পড়েছে। ধার-দেনাও থাকতে পারে। রাতে ভাল করে ঘুমোও না।

রিচার্ড বিরক্তি প্রকাশ করে বলল ঃ সে ভাবনা তোমার নয়। আমারটা আমি খুব ভাল বুঝি। তোমার কী করে চলবে ভেবেছ? আমাকে তোমার প্রত্যাখ্যান করা খুব সহজ, কিন্তু বাবা হয়ে আমি তো সন্তানকে ফেলতে পারি না। তোমার জন্য না হলেও এই নাবালক তিনটি নাতি-নাতনীর জন্য আমার কিছু করণীয় আছে।

বাবা, স্বার্থপর হতে পারলাম কৈ? মানুষের করণীয়ের শেষ নেই। কারো বোঝা হওয়াও একটা বড় অপমান। দয়া, অনুগ্রহ, করুণা নিয়ে সম্মানে বাঁচা যায় না। গলগ্রহ হওয়ার আগে সে কথাটা ভাবলে, সম্পর্কটা ভালো থাকে। আজ যে কথা শুনতে কটু লাগছে, বিরক্ত হচ্ছ, একদিন এই কথাটা গায়ের জোরে অস্বীকার করার জন্য মনস্তাপ হবে। বাবা, সংসারে সব সম্পর্কই এক পক্ষের দোষে, কিংবা অন্যপক্ষের অবহেলায় নোংরা হয়ে যায়। বেঁচে থাকার সুখ, আনন্দ মরে যায়। সংসারেই এসব হয়। তাই বলছিলাম, সর্বক্ষণ আমার পাশে থেকে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য যা যা করা উচিত, করলে ভাল হয় সেই উপকারটুকু কর। আমার সংসারের দায়-দায়িত্ব আমাকেই বহন করতে দাও।

রিচার্ডে মুখে কথা জোগাল না। অভিমানে বুকটা ভারি হয়ে ওঠল। কেমন এক ধরণের হতাশা তাকে ক্লান্ত করে দিচ্ছিল। ব্যক্তিত্বময়ী এই কন্যাটির কাছে সারা জীবন হেরেছে। নিজের ইচ্ছের জোর খাটেনি কখনও। পিতার বুকের ব্যথার জায়গায় খবর রাখে না ইসাবেল। অথচ, কোনোদিন পিতার স্নেহ, মমতা,

উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, ভবিষ্যৎ ভাবনা নিয়ে রিচার্ড হারতে চায়নি। ইসাবেলও চায় না আত্মসমর্পণ করতে। কে জানে, তার নিজের আত্মসমর্পণটাই হয়তো সবচেয়ে বড় জেতা। এমন করে এর আগে রিচার্ড কখনও ভাবেনি। বরং ভেবেছিল সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ডানা ভাঙা পাখির মত তার বুকের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে বলবে, বাবা আমাকে তোমার কাছে নিয়ে চল। রিচার্ডের এই আত্মমুগ্ধ ভাবনা কোনো দাম পেল না ইসাবেলের কাছে। চিরদিনই সে একটু অন্যরকম। পাঁচজনের সঙ্গে তাকে মেলানো যায় না। রিচার্ড বেশ একটু অসহিষ্ণু হয়ে রাগত স্বরে বলল ঃ তুমি তোমার জীবন নিয়ে যা খুশি করতে পার, কিন্তু আমার নাতি-নাতনীদের জীবন তোমাকে নষ্ট করতে দেব না।

ইসাবেল চুপ করে থাকল। চোখ দুটিতে তার বেদনা এবং কষ্ট ফুটে ওঠল। রিচার্ডের মায়া হল। কথা বলতে গিয়ে চোখের পাতা কেঁপে গেল, মুখের ভাব পাল্টে গেল। বলল ঃ বাবার কাছে তা-হলে তোমার প্রত্যাশা কিছু নেই। বাবার কাছে মন খুলে নিজের অসুবিধের কথাটা বলতেও সংকোচ? আশ্চর্য তোমার মর্যাদাবোধ। আমি কি তোমার কেউ নই?

ইসাবেল চমকে ওঠল। রিচার্ডের চোখের ওপর ছলছলে চোখ দুটি রেখে ব্যাকুল কণ্ঠে বলল ঃ বাবার কাছে মেয়ের কোনো সংকোচ থাকে না। তুমি আসায় আমি কত নিশ্চিন্ত হতে পেরেছি তুমি তা জান না। আমার মনের কথাটা বুঝিয়ে তোমায় বলতে পারিনি। আমি শুধু স্বনির্ভর হতে চেয়েছি। ছেলে মেয়ে মানুষ করার জন্য, নিজের বাঁচার জন্য আমাকে কারো না কারো কাছে কম বেশি নির্ভর করতেই হবে। কিন্তু সেটা সারাজীবন ধরে গ্রহণ করলে অধিকারটা অধিকার থাকে না, জবরদস্তি হয়। এর মত খারাপ জিনিস আর কিছু নেই। সংসারে শান্তি, শৃঙ্খলা সব কিছু নষ্ট করে দেয় এই দাবি আর অধিকারবোধ। তোমার ক্লান্ত হওয়ার আগেই আমরা শুধু নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে চাই। এই কথাটা বলা কী খুব দোষের?

কান্না হাসির মাঝামাঝি একরকমের অনুভূতিতে আবিষ্ট হয়ে গিয়ে রিচার্ড বলল ঃ মানুষের বিপদে মানুষই পাশে দাঁড়ায়। এটা কোনো নতুন কথা নয়। আমি তো বাবা ; আমি কী স্থির থাকতে পারি? তোমার কথাগুলো দোষের বলে আমি মনে করি না। কিন্তু নিজের আত্মগর্ব এবং স্বাধীনতার দাবি করতে গিয়ে অন্যের জীবনটা যদি নষ্ট হয়ে যায়, তা-হলে সেটাই দুঃখের এবং যন্ত্রণার।

ইসাবেলের ভুরু কুঞ্চিত হল। পিতার অনুযোগের উত্তর দেওয়া অতি কঠিন। কয়েকমুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে বলল ঃ তোমার কথাটা বুঝলাম না। আমার ছেলে মেয়ের জীবন নষ্ট করব একথা ভাবলে কী করে? আমার খেয়ালে কারো জীবন নষ্ট হয়ে যাক তা কখনও চাইনি আমি।

তুমি শুধু জিততে চেয়েছ। কিন্তু মনে রেখ স্নেহ, মমতা, ভালবাসার কাছে কোনো হারই হার নয়। হেরে যাওয়াটাও বড় আনন্দের।

ইসাবেল মুখ নিচু করল। সহসা জলে ভরে এল তার দু'চোখ।

দু'জনে আর কোনো কথা হল না। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল। বাইরে জানলার ধারে একটি গাছে নাইটিংগেল ডাকছে। ডেকেই চলেছে।

ঘড়ি কাঁটার দিকে নজর ছিল না মার্গারেটের। সময় বয়ে যাচ্ছে। রোদের উষ্ণতা বাড়ছে। ক্রিং ক্রিং করে সাইকেলের ঘণ্টা বাজিয়ে পথচারীরাদের সতর্ক করে সাইকেল আরোহীরা যাচ্ছে। যাত্রীদের মুখর কথাবার্তায়ে রাস্তা গম গম করছে। কিন্তু এসবের প্রতি মার্গারেটের ভ্রূক্ষেপ নেই। সে নিজের চিন্তায় বিভোর। বাবার ফটোর উপর দুটি চোখ স্থির হয়ে আছে। বিষণ্ণ ব্যথায় কষ্টে তার ঠোঁট কাঁপছিল। হঠাৎই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

বই থেকে চোখ তুলে তাকাল রিচমণ্ড। মার্গারেটকে কাঁদতে দেখে একটু হকচকিয়ে গেল। বেশ একটা বিপন্ন অস্বস্তি নিয়ে ধীরে ধীরে তার পাশে এসে দাঁড়াল। পিঠের উপর হাত রাখল। মার্গারেটের সারা শরীরের মধ্যে তড়িৎ প্রবাহ খেলে গেল। গহন স্তব্ধতা ভেদ করে সে যেন জেগে ওঠল। তার কিছু বলার আগেই রিচমণ্ড ডাকল ঃ এই দিদি। কাঁদছিস কেন? তোর হয়েছে কী? পাগলের মতো একা একা বসে কাঁদছিস কার জন্যে?

মার্গারেটে তার আবেগটাকে চট করে লুকোনোর জন্য রুমাল দিয়ে চোখ মুছল। গলার স্বর যথাসম্ভব স্বাভাবিক করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল ঃ না, কাঁদব কেন? কাঁদার কী আছে? আমার কিছু হয়নি তো।

রিচমণ্ড দু'হাতে দিদির মুখখানা চোখের সামনে তুলে ধরে বলল ঃ দিদি, তুই কিছু লুকোতে চাইছিস। তোর মতো শক্ত, শান্ত এবং সহিষ্ণু মেয়ে যখন

কাঁদে তখন বুঝতে হবে একটা বিরাট কিছু হয়েছে। কাল থেকেই দেখছি তুই কেমন হয়ে গেছিস। ক্লাবে কারো সঙ্গে মনোমালিন্য হয়নি তো?

রিচমণ্ডকে ঠেলে দিয়ে মার্গারেট বলল ঃ বলছি তো কিছু হয়নি।

মাকে ডাকল রিচমণ্ড। মা, ও মা, তোমার আদরের খুকী কাঁদছে। তোমার আদর না পেলে শান্ত হবে না বলছে।

মার্গারেট কপট রাগ দেখিয়ে রিচমণ্ডকে ছোট্ট একটা চড় মারল। বলল ঃ ভাগ, শুধু ইয়ারকি? মা অসুস্থ। এসব কথা বলে মার সঙ্গে মজা করা হচ্ছে? বড় হয়েছিস, কিন্তু বুদ্ধি কিছু হইনি।

ইসাবেল এবং মেরী দু'জনে তড়িঘড়ি করে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল। মার্গারেটের দু'চোখ তখনও জবাফুলের মতো লাল। চোখের কোণে জল চিক চিক করছিল। ইসাবেল বেশ একটু অবাক হয়ে গেল। মেরী বলল ঃ সব তাতেই তোর একটু আদিখ্যাতা। কী হয়েছে? চোখ রাঙা কেন? আবার কারো প্রেমে পড়ে ল্যাং খেয়েছিস নিশ্চয়ই!

মার্গারেট আদুরে গলায় ইসাবেলের কাছে অনুযোগ করল—মা, দেখেছ! বলেই ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল।

ইসাবেল বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল তার। কথা বলবে কী ইসাবেল। তারও ঠোঁট কাঁপছিল। মনে হচ্ছিল, এখনই বুঝি সেও ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলবে। খুব কষ্টে নিজেকে সংযত করে ধরা গলায় বলল ঃ কী হয়েছে মা? মাকে মনের কষ্ট গোপন করতে নেই।

মা'র বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে বলল ঃ মাগো কী বলব? কী জানি কেন মন খারাপ হলো? হঠাৎই বাবার ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর জন্য মনটা কেমন করে উঠল। মন থাকলেই মনে ঝড় উঠে। মনের মন কী করবে জানা না থাকলে বিপন্ন অসহায় বোধ করে। আজ তেমন একটা বোধে আমার ভেতরটা হঠাৎই অশান্ত হলো?

ইসাবেলেরও অনেক কথা মনে হয়। ঘড়িতে ঢং ঢং করে সময়ের ঘণ্টা বাজল। ভিজে চোখ পিট পিট করতে ইসাবেল বলল ঃ তোর স্কুলের সময় হয়ে গেছে। খেতে আয় মা। দুঃখ সুখের জীবনে একটানা পথ চলা বড় ক্লান্তিকর, একঘেয়ে? নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, বুকের মধ্যে যখন কষ্ট হয় তখন অতীতকে মনে করে নিজেকে অন্বেষণ করে। জীবনে এরকম স্মৃতির রোমন্থন খুবই প্রয়োজন। জীবনটা অতীতকে রোমন্থন করে বড় দামি হয়ে উঠে। খেতে আয়। টেবিলে খাবর দিয়েছি।

বাড়ী থেকে স্কুল খুব দূরে নয়। এটুকু পথ সে ও মে হেঁটে যায়। দু'বোন গল্প করতে করতে কখন যে স্কুলে পৌঁছে যেত খেয়ালই হতো না। রোজই

নানা কথা হয় তাদের। মার্গারেটই একটু বেশি কথা বলে। কিন্তু আজ সে চুপ করেছিল সর্বক্ষণ। মে'র অস্বস্তি লাগছিল। কেমন একটা বিষণ্ণ গম্ভীরভাব থম্‌থম করছিল তার মুখে। সে তার মুখ দেখে বোঝার চেষ্টা করছিল। নিজের মনে স্বগতোক্তি করল মে ঃ মাই গুডনেস। এক বাড়িতে, এক ঘরে, এক খাটে থেকেও একজন মানুষ অন্য একজন মানুষকে কতই কম জানে। মানুষের মনের গতিপ্রকৃতি বিধাতা কেন, সে নিজেও বোধ হয় কম জানে। বেচারী।

মার্গারেট মে'র দিকে ফিরে তাকানোর সময় একটা মন খারাপ করা আর্তি তার সমস্ত মুখ ফ্যাকাসে করে দিল। বুকের গভীর থেকে একটা লম্বা শ্বাসপড়ল। মলিন হেসে বলল ঃ প্রত্যেকের একটা নিজস্ব চাওয়ার জগৎ থাকে। সেখানে সে একা, ভীষণ একা। সেই একাকীত্বের সংবাদ তার মনও জানে না। মাঝে মাঝে অদ্ভুত ঠাণ্ডা দ্বেষহীন, ঈর্ষাহীন এই মনটা ভিতরে ভিতরে ভীষণ এক যন্ত্রণা দেয়। প্রতিকারহীন যন্ত্রণা দুর্বল করে আমাকে। যেহেতু কোনো বাধা পাই না তাই প্রতিহত করার প্রশ্ন উঠে না। কী যে করব ভেবেও পাই না।

মেরীর দু'চোখে কৌতুক, অধরে মিষ্টি হাসি। বলল ঃ সিষ্টার, মনে হচ্ছে আবার কেউ মন চুরি করেছে। এটা নিয়ে তিন নম্বর হচ্ছে তা-হলে। ভেবে চিন্তে, হিসেব করে পা ফেল বোন।

মার্গারেট তাকে ধমক দিয়ে বলল ঃ মেরী, সব তাতেই তোর ইয়ারকি। তোর মস্করা শোনার মতো মন নেই আজ।

তোর প্রবলেমটা আমাকে বল, চটপট সমাধান করে দিচ্ছি।

তুই যা ভাবছিস তা নয়। মন হরণের মতো আপাতত কোনো ঘটনা ঘটেনি! প্রেম, বিয়ে আমার কপালে নেই। আর পাঁচটা মেয়ের মতো সংসার করার স্বপ্ন আর দেখি না। ভালোও লাগে না। ঈশ্বরও তা চান না বলেই আমার নীড় বাঁধার সাধ ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়েছেন। তিনি আমাকে শুধু বঞ্চিত করেননি, প্রতারিতও করেছেন।

মার্গারেটের কষ্টটাকে লঘু করতে মেরী বলল ঃ জীবনে ওরকম অজস্র ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়ত। তাই বলে, স্মৃতি আঁকড়ে থেকে বাকী জীবনটা নষ্ট করা কিংবা ব্যর্থ-করার মধ্যে কোনো বাহাদুরি নেই। তাতে কোনো শ্রেষ্ঠত্ব কিংবা মহত্ত্বও প্রকাশ পায় না। তুই অতিমাত্রায়-আবেগপ্রবণ বলেই একটু বেশি কষ্ট পাস। তুই ভীষণ ভালো বলেই ঈশ্বর তোকে শুধু দুঃখের বোঝা বইতে দিয়েছে।

দারুণ মুগ্ধ চমকে চমকে উঠল মার্গারেট। বলল ঃ সে তো আমার পরম সৌভাগ্য। কথাটা বোঝা বয়ে বেড়ানো নয়, উত্তরণ। উত্তরণ হলো জীবনের আসল কথা।

উত্তরণ মানে অতিক্রম করা নয়, নিরন্তর চলা। এক অবস্থা থেকে আর এক অবস্থার দিকে এগিয়ে যাওয়া।

আমি কি থেমে আছি মে? কত ঝড়-ঝঞ্ঝা গেছে জীবনের উপর দিয়ে, তবু দুঃখে, ব্যথায়, বেদনায় ভেঙে পড়িনি, কিংবা থেমেও যাইনি। জীবনের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তের দিকে উল্কার মতো ছুটে গেছি। একঘেয়েমি জীবনের যখন খুব ক্লান্ত লাগে তখন অতীতকে রোমন্থন করে একটু শান্তি পাই। নিজের কাছে নিজেই দামী হয়ে উঠি। দামী হওয়ার জন্য কত মূল্য দিতে হয় এক জীবনে। কতদুর্গম সব অজানা পথ অতিক্রম করে আজ এখানে এসে পৌঁছিয়েছি ভাবতেও ভাল লাগে।

মেরী বলল ঃ এসব কথা হঠাৎ এমন করে মনে এল কেন? সত্যি কথা বল তো দিদি কী হয়েছে তোর? নিজের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা করছিস। সে খেলাটা প্রেমের যদি নাও হয়, তাহলে কোন্ হতাশা, ব্যর্থতা মনকে এমন আকুল করে তুলল?

গাঢ় গভীর নিশ্বাসের সঙ্গে কথাগুলো একেবারে অন্তঃকরণ থেকে বেরিয়ে এল মার্গারেটের। বলল ঃ সে কাল রাতের অস্থিরতায় যা বুঝেনি, আজ সকালের প্রকৃতিস্থতায় স্থির হয়ে বুঝেছি যে, আমার জীবনে একাধিক মস্ত বড় ঘটনা জ্ঞান হওয়া থেকে ক্রমাগত ঘটে গেছে। এখনও ঘটছে। অবশ্য এটা ঘটনা, না অন্য কিছু সেটা আগামীকাল বলবে। তবে, যাই ঘটে থাকুক, প্রতিটি ঘটনা আমার জীবনে এক একটা মাইলষ্টোন। একটার পর একটা মাইলষ্টোন অতিক্রম করে যত এগিয়ে চলেছি, ততই নিজেকে নিয়ে আমার কৌতূহলের অন্ত নেই। একজন সামান্য পাদ্রীর ঘরের মেয়ে এবং নার্সারী স্কুলের এক শিক্ষিকা সম্পর্কে সমাজের মানুষের যে অবজ্ঞা, অনাদর আছে সেটা আমার জীবনে কোনো বাধা হয়নি। ব্যর্থতায়, হতাশায় ভেঙেও পড়েনি। কারো সাহায্য ছাড়াই নিজের প্রচেষ্টায় উতরে গেছি অন্য জীবনের আলোকিত প্রান্তরের দিকে সাগরে যাওয়া নদীর চলকানো জলের মতই উদ্দাম আবেগে ছুটে চলেছি। পিছন ফিরে তাকায়নি কোনোদিন। আজ হঠাৎই ফেলে আসা অতীতটা তার কথা ভাবতে বলল। জানিস মে, জীবনের এই যতিটার খুব প্রয়োজন আছে। যতি মানে থেমে যাওয়া নয়, একঘেয়েমি আর ক্লান্তি বদলে নতুন করে চলা। গতি বদলের আর এক নামই অনন্ত চলা। সময়ের স্রোতে অফুরাণ বেঁচে থাকা। আজ তাই খুব বেশি করে মনে হচ্ছে। একঘেয়ে অভ্যাসের বন্দী জীবনে যে নিজেকে নবীকৃত করতে পারে প্রতিমুহূর্ত, সে থেমে যায়। চলার পথটা না বদলালে, নদীর মত গতি না পাল্টালে সে থেমেই যায়। ঐ মুহূর্তটা হল শক্তি, সামর্থ্য ও ক্ষমতা উপলব্ধির সময়। আজ গভীর করে তাকে উপলব্ধি করার এক অফুরন্ত আনন্দে মনটা ভরে আছে।

মেরী মন দিয়ে মার্গারেটের কথা শুনছিল। দ্রুতপায়ে মার্গারেটের সঙ্গে যেতে যেতে বলল ঃ আমাদের তিন ভাইবোনের মধ্যে তুই একেবারে আলাদা। ঈশ্বর তোকে একটু অন্যরকম করে তৈরি করেছে? আবার তুইও তাঁর করুণায় নিজের একটা আলাদা ভুবন করে নিয়েছিস। সে ভুবনটা যে কী তুইও বোধ হয় জানিস না। কোনো বড় কাজের জন্য ঈশ্বর অন্তরাল থেকে তিল তিল করে তৈরি করছে তোকে। না হলে, এই বয়সে কারো সাহায্য ছাড়াই ইংলন্ডের মতো দেশে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিস। তোর বক্তৃতা, যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ গুণী-জ্ঞানী শ্রোতাদের হৃদয় হরণ করেছে। তাঁরা তোর একজন অনুরাগী। নাম করা প্রতিভাবান ব্যক্তিরা পর্যন্ত তোর লেখা, বক্তৃতা, বিতর্ক প্রশংসা করে। রাস্কিন স্কুলের ছোট্ট গণ্ডীর মধ্যে তোকে যে ধরে না বার বার তুই দেখিয়েছিস। তুই অনেক বড় হবি।

মে স্তুতি চাই না। প্রশংসার লোভে কাজ করি না। কাজে আমি আনন্দ পাই।

তোর আনন্দ যখন অন্যের আনন্দ হয়ে উঠে, তখন তার আলো পড়ে আমরাও বড় হয়ে যাই। এমন একজন মেয়ের বোন হতে পারার জন্য গর্ব হয়। শ্রদ্ধায়, ভালোবাসায় মনটা নুইয়ে আসে।

তাই বুঝি। তার দিকে বিদ্যুৎ কটাক্ষ হেনে হাসল মার্গারেট। মোহন হাসি। বলল শ্রদ্ধা, অনুরাগ ছাড়া গুণগ্রাহী হওয়া যায় না মেরী।

মেরী সহসা উৎফুল্ল হয়ে বলল ঃ দিদি ধরা পড়ে গেছিস। এত গভীর অনুভূতির কথা কোথা থেকে পেলিরে দিদি! বিজ্ঞের মত বলল ঃ বুঝেছি।

কী বুঝিছিস?

তোর মনটা চুরি হয়ে গেছে। বোধ হয়, নিজের অজান্তে কাউকে হৃদয় নিবেদন করেছিস।

দ্যাখ মে, ভাল হবে না বলছি। হৃদয় নিবেদন করার মত পুরুষ মানুষ কোথায়? যে পুরুষের ওপর মানসিকভাবে নির্ভর করা যায়, যার মধ্যে একজন প্রকৃত বন্ধুকে, প্রেমিককে পাওয়া যায় তাকেই ভালবাসার যোগ্য মানুষ মনে হয়। যীশু ছাড়া সেই অসামান্য সুন্দর প্রেমিক পুরুষ আর একটাও নেই। শুধু তাকেই তো পুরুষ হিসেবে, ইষ্টরূপে, স্বামীরূপে, বন্ধুরূপে ভালবাসা যায়।

মে'র দু'চোখের কোণে বিদ্যুৎ খেলে গেল। অধরে অনির্বচনীয় হাসি ফুটল। টেপা হাসিতে তার কৌতুক। বলল ঃ বাব্বা, এমন পুরুষ ইংলন্ডে সবে আমদানী হয়েছে। মেয়েদের চোখে হিরো। দেখা মাত্র সব মেয়ে প্রেমে পাগল হচ্ছে। অসামান্য ব্যক্তিত্বই তাঁকে সুন্দর করেছে। নারী এমন পুরুষকেই তো মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসতে পারে, যাকে শ্রদ্ধা করা যায়, যার কাছে মাথা নত করা যায় নির্দ্বিধায়। তিনি এত বড় মনের আর এত বড় মাপের মানুষ যে, স্ত্রী-পুরুষ সকলকে মানসিক আশ্রয় দিতে পারেন।

অবাক মুগ্ধতায় মার্গারেট চেয়ে থাকে মে'র দিকে। আস্তে আস্তে বলল ঃ এমন মানুষ বাস্তবে হয় মে? স্বপ্নের সে পুরুষকে বাস্তবে কোথায় পাব? আমাদের চারপাশে ছোট মনের, ছোট স্বার্থের পুরুষ, সে পুরুষ জীবনে যত সফলই হোক, আমার একটুও ভাল লাগে না।

মার্গারেটের সুরুচিও সূক্ষ্ম অনুভূতিময় জীবনের কথাগুলো তাকে ভীষণ চমকে দেয়। কথাগুলোর রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে তার ব্যর্থ জীবনের হতাশাজনিত অভিমান লুকোনো ছিল মে গভীর করে অনুভব করল তা। মার্গারেটকে খুশি করার জন্য মজা করে বলল ঃ এক্ষেত্রে মহৎ মানুষদের কথা চিন্তা করাই ভাল। তাতে নিজের ভিতরেও মহত্ব জেগে ওঠে, তাই না দিদি!

মাথা নেড়ে সম্মতি জ্ঞাপন করল মার্গারেট। কারণ ভিতরে ভিতরে তার তখন ভূমিক্ষয় শুরু হয়েছিল। কিছুক্ষণের জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়াল। মাত্র কটা মুহূর্ত। তার মধ্যে কত কথা মনে পড়ে গেল।

ধুলো ধোঁয়ায়, ভরতি শহরে রেক্সহ্যামের অস্বাস্থ্যকর ঘিঞ্জি পরিবেশ এবং তার মানুষগুলোর মধ্যে তার সদা হাস্যময় ব্যস্ততার দিনগুলো হঠাৎ চোখের পর্দায় ভেসে ওঠল। তখন সে আঠার বছরের তরুণী। স্কুলের গণ্ডী পেরিয়ে রেক্সহ্যামের খনি অঞ্চলের একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর পদে যোগ দিয়েছিল। খনি অঞ্চলের মানুষদের দুঃখ, দুর্দ্দশা, অভাব অভিযোগের সঙ্গে কখন যে যুক্ত হয়ে পড়ল সে নিজেও ভাল করে জানে না। খনি অঞ্চলের মানুষগুলো দুঃখ কষ্টের সাথী সে। তার দরদী মনটা তাদের সেবায় উৎসর্গ করল। কোথায় অনাথ, আতুর রোগী রোগ যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে, আসন্ন প্রসবা নারী দুর্ভাবনায় দিন কাটাচ্ছে, অর্থের অভাবে কোন পিতা মাতা, সন্তানের চিকিৎসা করতে পারছে না বস্তীতে বস্তীতে ঘুরে মার্গারেট তাদের সন্ধান করে। তাদের সাহায্যের জন্য অর্থ দেয়। কিন্তু সে অর্থ কে দেবে তাকে? কোথা থেকে এই অর্থ আসবে? তার নিজের আয়ও সামান্য। সে আয়ের এদিক ওদিক করলে ভাইবোনদের উপবাসে থাকতে হবে। কিছু করার মন নিয়ে বিভিন্ন সংবাদপত্রে, পত্রিকায় এইসব দুঃখী, অভাবী, অসহায় মানুষদের কথা লিখে জনমত জাগ্রত করতে কলম ধরল। বিবেকবান মানুষ সাহায্যের জন্য সত্যিই হাত বাড়াল। মার্গারেট সেই প্রথম বুঝল সৎ-উদ্যোগ আর ভাল কাজের জন্য অর্থের সতি অভাব হয় না। তবু প্রয়োজনের তুলনায় সে সাহায্য অল্প। মুষ্টিমেয় কয়েকজনের সামান্য সাহায্যে পরিকল্পনা সফল করা কঠিন হল। তবু চেষ্টায় ক্ষান্ত ছিল না।

এই সময় বুদ্ধের জীবন চরিত গ্রন্থটি হতাশার মধ্যে তাকে আশার আলো দেখাল। বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য অনাথ পিণ্ডদ মানুষের অন্নের অভাব দূর করার জন্য দেশের অর্থবান লোকদের সাহায্য ভিক্ষা করল। শ্রেষ্ঠী, ধনবান, সকলে

বলল ঃ তাদের একজনের সব সঞ্চয় দিয়েও অন্নের-অভাব দূর করতে পারবে না। তখন একজন ভিক্ষুকিনী সুপ্রিয়া বলল, সকলের ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণের দায়ভার সে গ্রহণ করতে পারে। অনাথ পিণ্ডক তার কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে যায়। আশ্চর্য হয়ে বলল ঃ তুমি নেবে অন্ন ভার। তোমার আছে কি? নিজের খাওয়াই জোটে না তোমার। ভিক্ষুকিনী হাসতে হাসতে বলল ঃ আমার অন্ন আছে তোমাদের সবাকার ঘরে। এ কাজ কোনো একজনের দ্বারা সম্ভব নয়। সাধ্য মত সকলে সাহায্য করলে কেউ উপবাসে থাকবে না।

এই নীতি আখ্যানটাই মার্গারেটের মনে গেঁথে গেল। কাজের ইচ্ছেটাই বড় কথা। স্বার্থহীন কাজে সাহায্যের অভাব হয় না। সমাজের সকলে যদি ন্যূনতম দায়িত্ব পালন করে তাহলে সবাই শান্তিতে থাকতে পারে। মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে মার্গারেট একে একে হাসপাতাল, বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার স্থাপন করল। ওয়েলেসবাসী সুদর্শন তরুণ এক ইঞ্জিনিয়ার তার একজন সহকারী হয়ে পাশে দাঁড়াল। যৌবনের দুর্নিবার আকর্ষণে তাকে ভালোবাসল মার্গারেট। কিন্তু ঈশ্বরের সহ্য হল না। তাঁর চাওয়ার অঙ্কে পাছে গরমিল হয় তাই তার প্রেমিককে মার্গারেটের কাছ থেকে কেড়ে নিল। যক্ষারোগাক্রান্ত হয়ে সে মারা গেল। বড় দ্রুত ঘটে গেল সব। তারপর, রেক্সহ্যামে তার মন বসল না। সর্বত্র তার স্মৃতি। মার্গারেট অবশেষে পালিয়ে এল লিভারপুবে। চকিতে তার মনকে ছুঁয়ে গেল প্রথম প্রণয়। সাফল্যে, ব্যর্থতায়, হতাশায়, জয়ে, গৌরবে, আনন্দে যাকে ভীষণ করে একান্ত ভাবে কাছে পেয়েছিল সেই মানুষটি হঠাৎ তার মনকে এমন করে আপ্লুত করে ফেলল যে সে কোনো কথা বলতে পারল না।

পথের মাঝে হঠাৎই থমকে দাঁড়িয়ে মার্গারেট নীল আকাশ দেখতে লাগল। উদাস বিষণ্ণ দু'চোখে বিভোর বিহ্বলতা। শুভ্র মেঘের দল নীল আকাশে খেয়া নৌকোর মত মৃদু মন্দ চালে ভেসে চলেছিল। আকাশজুড়ে এক অদ্ভুত স্তব্ধতা থম থম করছিল। একটি পাখিও ডানা মেলে দেয়নি। মার্গারেটের এই অদ্ভুত তদ্‌গতভাব মেরীকে আশ্চর্য করল। সে তাকে ডাকল না, নীরবে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। কয়েকটা মুহূর্ত নিঃশব্দে কাটল। উদাস বিষণ্ণ গলায় মার্গারেট বলল ঃ জানিস মে, আকাশ এখানে এত বড়, আর চারদিকে এত মুক্তির শ্বাস যে মনে হয় জীবনে আসল মানেটা হওয়া উচিত ছিল মুক্তি। পৃথিবীর দু'একজন মানুষই সে কথা অনুভব করে। বেশিভাগ মানুষের কাছেই জীবন একটা বন্দীদশা।

মেরী চুপ করে শুনছিল দিদির কথা। ওর কথাগুলো সত্যিই টানে। মনকে মুগ্ধ করে। চুপ করে শোনা এবং অনুভব করার মন যাদের আছে তারা পুরোপুরি

সমাহিত হয়ে যায়। কথা বলার আশ্চর্য মুনসিয়ানায় চারদিকে রূপ-রঙ-আবেগের সঙ্গে শ্রোতার হৃদয়ের সঙ্গে এক আশ্চর্য যোগাযোগ হয়ে যায় আর তা মুহূর্তের মধ্যে ঘটে। বিদ্যুৎচমকের মত হঠাৎই হৃদয় বাঁধা পড়ে যায়। মেরীরও সেই অবস্থা হল। বড় বড় চোখ করে মার্গারেটকে দেখতে লাগল। তার এই শান্ত, ধীর, স্থির ভাবটি মেরীর ভীষণ ভাল লাগে। ওর দিকে না তাকিয়ে মার্গারেট নিজের মনেই বলছিল—ক'দিন ধরে বুদ্ধের জীবন চরিতের ওপর লেখা 'দি এশিয়ান লাইট' ও আরো কিছু বই পড়তে পড়তে কেবলই মনে হয় ভারতের সন্ন্যাসীরাই পারে পৃথিবীকে বাঁচার পথ দেখাতে। অন্ধকার থেকে আলোর উপত্যকায় পৌঁছে দিতে। হতাশার মরুভূমি থেকে আশার মরুদ্যানে পৌঁছে দেয়ার মন্ত্র কেবল ভারতেরই জানা। একদিন ভারত বিশ্বকে সত্যের আলো দেখাবে। ভারতের সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ সেই আলোর মশাল নিয়ে পাশ্চাত্যে এসেছেন। নইলে, এত মানুষ তার কথা শোনার জন্য, একটু সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য পাগল হচ্ছে কেন? সব মানুষই একঘেয়ে অভ্যাস থেকে একটু মুক্তি চায়। মানসিক আশ্রয় চায়। লতার মত আশ্রয় খোঁজে। মানসিকভাবে যাকে নির্ভর করে তৃপ্তি, সুখ, আনন্দ পায়, ভেঙে পড়া মুহূর্তে তাকেই অবলম্বন করে সে খাঁড়া হয়ে দাঁড়ায়। আর সেই বড় মনের মানুষটি জীবনের নানা ঘাত প্রতিঘাতে চুরমার হওয়া মানুষটির অন্তরে বিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়ে তাকে শক্তিমান করেছেন। বুদ্ধ হলেন জীবনের অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো। কত সহস্র বৎসর ধরে তিনি বেঁচে আছেন মানুষের হৃদয় মন্দিরে। কী অনন্যসুন্দর মুক্ত মানুষ। এই সৌন্দর্য কর্মী পুরুষের সৌন্দর্য। ত্যাগীর সৌন্দর্য। মহত্ত্বের সৌন্দর্য তাঁর সারা অঙ্গে। এমন পুরুষকে তাই মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে, ভক্তিতে যাঁর কাছে মাথা নত হয়ে যায় নির্দ্বিধায়।

মেরীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মার্গারেটেরে উজ্জ্বল দুটি চোখ হঠাৎই নিবে গেল। ওর চাহনিতে একটু বিব্রতভাব খেলে গেল। মেরী মুখ টিপে হাসল। বলল ঃ মনে হচ্ছে, তোর জন্মের কয়েক হাজার বছর আগে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন যে বুদ্ধ, আজ রাতে তার স্বপ্ন দেখবি। তোর রাতের স্বপ্নে ভারতের সন্ন্যাসী বুদ্ধের মূর্তি ধরে নিঃশব্দে আসবে। মেঘের বিছানায় রাতের আলোয় রাত ভর গভীর এক সুখের অনুভূতিতে তোকে আচ্ছন্ন করে রাখবে।

ছিঃ মে। একজন সাধু মানুষ সম্পর্কে এসব কথা বলতে নেই। এসব কথা ভাবাও পাপ। আমি কত ছোট হয়ে যাব তাঁর চোখে। কাউকে ছোট করতে নেই।

মেরীর চোখের কোণে নীরব অর্থপূর্ণ হাসি ঝিলিক মেরে গেল। বলল ঃ অনুরাগ বড় খারাপ অসুখ।

মার্গারেটের সারা শরীরের মধ্যে তড়িৎ প্রবাহ খেলে গেল। গহন স্তব্ধতা ভেদ্ করে সে যেন জেগে ওঠল। মেরীর কিছু বলার আগে রেগে গিয়ে বলল ঃ শকুনের নজর তোর। কোথায় ফুল ফুটেছে তা দেখতে পাস না। গাছের মগ ডালে বসে সব সময় পচা গলা মৃতদেহের দিকে নজর তোর। বেশি ভাগ মেয়ের নজর ছোট। তারা ভাল কিছু দেখতে পায় না।

হেসে ওঠল মেরী। লজ্জায়, উত্তেজনায় মুখ রাঙা হয়ে গেল মার্গারেটের। বলল ঃ ইয়ার্কি হচ্ছে না?

মেরী নির্বিকারভাবে জবাব কিল ঃ মোটেই না। আসলে, নিজেকে লুকোতে গিয়ে তুই ধরা পড়ে যাচ্ছিস। কিংবা পাছে ধরা পড়ে যাস তাই সবসময় সতর্ক এবং সাবধানে থাকিস। মনের মধ্যে কোথায় কী ঘটে যায়, মানুষ নিজেও জানে না। তুইও জানিস না, মন কী চায় তোর?

হঠাৎ মার্গারেট গম্ভীর হয়ে যায়। কেমন একটা তদ্‌গতভাব তাকে বিষণ্ণ করে দিল। দার্শনিকের মত বলল ঃ আমারও কত সময় মনে হয়েছে, মানুষের মন একটা অনাবিষ্কৃত দ্বীপ। গভীরতর রহস্যে ঘেরা সে নির্জন অঞ্চল। মাঝে মাঝে ঝড় ওঠে সেখানে। ঝড়ে সব এলোমেলো হয়ে যায়। তখন মন কী করবে জানা না থাকলে বড় অসহায় লাগে। সেই মুহূর্তে তার আসল আমি, একা আমির সর্বস্ব সম্বল করে মূল প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটা জবাবদিহি করতে হয় তাকে।

বিজ্ঞের মত তার দিকে ঘাড়টা কাৎ করে মেয়েলী বিস্ময়ে চোখের মণি দুটো আবর্তিত করে বলল ঃ বুঝেছি। ভারতের সন্ন্যাসী লন্ডনে পদার্পণ করা থেকে ইংলন্ডের কাগজগুলো কাগজ বিক্রীর জন্য ফলাও করে সন্ন্যাসীর বক্তৃতা ছাপছে। তার সম্পর্কে নানারকম সব অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প বানাচ্ছে। বেশ কিছু পাবলিকের ভাল লাগছে। লোকের মুখে মুখে তার সম্পর্কে নানারকম রটনা, তোর ভাবুক মনকে ব্যাকুল করেছে। তোর মত ভাবাবেগপ্রবণ বেশ কিছু পুরুষ ও মহিলার কাছে তাঁর যা কিছু মূল্য। ব্যস্ত কাজের মানুষের কাছে তাঁর কানাকড়ি মূল্য নেই।

মার্গারেট মুচকি হেসে বলল ঃ শ্রদ্ধা ছাড়া গুণগ্রাহী হওয়া যায় না মেরী। ভারতের সন্ন্যাসীকে চাক্ষুষ দেখিনি কোনোদিন। তবু তাঁর কথা যত শুনছি ততই চুম্বকের মত টানছে আমাকে। এদেশে দিন দিন ওর অনুরাগীর সংখ্যা বাড়ছে। আমাদের সিসেম ক্লাবের সদস্যদের অনেকেই ওঁর গুণমুগ্ধ এবং ভক্ত বিশেষ। এইসব শিক্ষিত, গুণী জ্ঞানী মানুষদের কথায় ভোলানো সহজ কাজ নয়া। ধর্ম ও ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর কথাগুলো এমন সহজ সরল সংস্কার মুক্ত এবং বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা এযুগে ধর্মযাজকেরা জানে না। কী সুন্দর বললেন ঃ পশুর ধর্ম নেই, ধর্ম শুধু মানুষেরই ঈশ্বরদত্ত সম্পদ। মানুষই তা ধারণ ও পালন

করে। মানুষের নিজের মঙ্গলের জন্য এবং সমাজ, সংসারকে সুস্থ ও সুন্দর করার জন্যই বলে, সৎ পথে চল, নির্লোভ হও, সকলের সঙ্গে মিলে মিশে থাক, অন্যের প্রতি দয়াশীল হও। ধর্মচেতনাই মানুষকে সুন্দর করে। সত্য মানুষকে নির্ভীক করে। এই বোধই মানুষকে পশু থেকে আলাদা করে। ভগবান পশুকে এই অনুভূতি ক্ষমতা দেয়নি। এই উপলব্ধি না হলে সংসার বা সমাজ স্থির থাকতে পারে না। এই শুভবুদ্ধি ধারণ করার অন্য নাম ধর্ম এবং যা কিছুই এর বিপরীত তা শুধু বিপরীত ফল দেবে এবং তা কখনও ধর্ম নয় ; অধর্ম। কথাগুলো খুবই সাধারণ,তবু আমার মন নাড়া দিয়েছে। যে মানুষের কথা শোনার জন্য এত লোক পাগল হয়, সে মানুষটিকে স্বচক্ষে দেখলে আমার অবিশ্বাসী মনটা কীরকম আলোড়িত হয় তা পরখ করার জন্য লেডি ইসাবেলের বাড়িতে মানুষের ধর্ম ও ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর বক্তৃতা শুনতে যাব। অনেকবারই অনেকে বলেছে, আজ ভাবছি চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করব একবার।

বিস্ময়ে মেরীর দু'চোখ গোল গোল হল। প্রদীপ্ত খুশিতে মুখটা একটু ফাঁক হয়ে যায়। বলল ঃ এই দিদি ঃ সাবধান। বশীকরণের মন্ত্র জানে সন্ন্যাসী। শুনেছি তাঁর কণ্ঠস্বর হৃদয়বীণার তন্ত্রীতে বেজে যায়। মূর্চ্ছনা তার থামে না। শ্রোতাদের হৃদয় মন আলোড়িত হয়। বিধাতা তাঁর কণ্ঠে মানুষকে আহ্বান করার শক্তি দিয়েছেন। তাই তো, তাঁর বাণী ঃ কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে প্রাণ আকুল করে তোলে।

মেরী, আমি একবার তাঁর মুখোমুখি হতে চাই। তাঁকে দেখতে চাই। তাঁর ব্যক্তিত্বের চুম্বক আকর্ষণে কতখানি জাদু, কতখানি সত্য আছে তা একবার নিজের যুক্তি তর্ক, বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করে দেখব।

তাতে লাভ কী তোর?

লোকসানও কিছু নেই বোন। যে মানুষের নাম শুনে এত মানুষ জড় হয়। যাঁর বাণী ও বক্তৃতা শুনে মন্ত্রমুগ্ধ হয়, সে মানুষ কেমন জানা তো হবে। তাকে তো আবিষ্কার করতে পারব। এটাই বা কম কিসে? হার জিতের প্রশ্ন নয়, শুধু কৌতূহল। যীশু যে শুধু লিজেন্ড নয় রক্তমাংসের মানুষ, ভারতের সন্ন্যাসীর মধ্যে আমি তাঁর আত্মাকে খুঁজব। আমার লাভ সেখানে। আমি অন্ধকারে থাকতে চাই না। সত্য-মিথ্যের নিরন্তর সংঘাতে প্রতিনিয়ত ছিন্নভিন্ন হচ্ছি, বাইরে থেকে কেউ তা দেখতে পায় না। অন্তরে ধর্মের জন্য সত্যের জন্য যে আকূতি, তার স্বরূপ কি, এ জিনিসটার কত দাম, এ যাবৎ তা কষে দেখিনি। বোধ হয় হিসেব মেলানোর সেই সময় এসেছে।

তোর কথা শুনে ভীষণ ভয় করছে দিদি?

কিসের ভয়?

মৃত্যুর সময় মাকে বাবা বলেছিল, ও পাখা মেলবে দূরের আকাশে। সেদিন ওকে বাধা দিও না।

তাই বুঝি। তার দিকে বিদ্যুৎ কটাক্ষ হেনে মার্গারেট হাসল। প্রশংসায় বুকের ভেতরটা উথলে ওঠল। মে'র গালটা টিপে ধরে দাঁতে দাঁত দিয়ে বুকের আবেগ সামলে বলল ঃ দূর বোকা। তোদের ছেড়ে কোথায় যাব? একটু বেশী অর্ন্তমুখী হওয়ার জন্য মনগড়া অনেক কিছু আমার সম্পর্কে কল্পনা করতে ভালোবাসিস তোরা। আসলে মনের মতো একটা গভীর কিছু খুঁজছি সব সময়। তাই, না পাওয়ার অতৃপ্তিতে মন ছেয়ে আছে।

সিসেম ক্লাবে ভারত সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ সম্পর্কে ইদানীং বেশ কিছু আলাপ আলোচনা সদস্যরা নিজেদের মধ্যে করে থাকে। মার্গারেট লক্ষ্য করছে এই মানুষটি খুব দ্রুত কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠছেন। অল্পবিস্তর তাঁর সম্পর্কে রোজই আলোচনা হয়। অথচ এই শহরে সম্পূর্ণ নতুন তিনি। সকলের কাছে অচেনা ব্যক্তি। এমন কি তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য প্রথম প্রথম সভায় কোনো লোক হত না। বক্তৃতার চুম্বক আকর্ষণে ক্রমেই লোক সমাগত হতে লাগল। মাত্র দু'মাসের ভেতর লন্ডন শহরে তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়ে ওঠলেন। লন্ডনে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা পর্যন্ত তাঁর অনুরক্ত হয়ে পড়ল। যতদিন যেতে লাগল ততই কৌতূহলের পাত্র হয়ে ওঠলেন। এখন তো তাঁর দর্শন লাভের জন্য সবাই ব্যাকুল। দূরদূরান্ত থেকে গাঁটের কড়ি খরচ করে, সময় নষ্ট করে, পথের কষ্ট স্বীকার করে, শরীরের ওপর অনেক ধকল সহ্য করে তাঁরা আসেন স্বামীজির কথা শুনতে। এই বিস্ময়টা দিন দিন প্রবল হতে লাগল।

মাত্র দু'মাসের মধ্যে লন্ডনের বেশ কিছু মানুষের মনোজগতে বিপুল পরিবর্তন এনেছেন। হঠাৎ এই পৃথিবীটা তাদের ভাবনায় চিন্তার দারুণ

রোমাঞ্চকর হয়ে ওঠল। আশ্চর্য-আশ্চর্য গল্প সৃষ্টি হল তাঁকে নিয়ে। লন্ডনের পথে কান পাতলেই শোনা যায়। মার্গারেট নিজেও সেরকম একটা গল্প পথে যেতে যেতে শুনেছিল।

একজন বৃদ্ধা মহিলা আর একজন মাঝবয়সী মহিলাকে যেতে যেতে বলছিল ঃ স্বামীজির কথা আমার ভীষণ ভাল লাগে। আমি মেয়ে মানুষ। তাঁর সব কথা গভীর করে বুঝি না। কিন্তু সমস্ত মনটা তাঁর কথায় ভীষণভাবে নড়ে ওঠে। মনে হয় যাকে খুঁজছি এতদিন বাদে পেয়ে গেছি সেই পরশপাথর। মন কেড়ে নেয়ার জাদু আছে তাঁর কথায়।

মাঝ বয়সী মহিলাটি তার কথার সমর্থনে বলল ঃ ঠিক বলেছেন, একদিন অনিচ্ছুক হয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনতে এসেছিলাম। বক্তৃতা শোনার অসহ্য ক্লান্তিকর ব্যাপারটা তাঁর ভাষণে একেবারে নেই। কথাগুলো এমনভাবে বললেন যে, কঠিন কথাগুলোও যেন সেই মুহূর্তে সহজ মনে হল। ওঁর মুখের ভঙ্গী এবং গলার আওয়াজ এমন সুন্দর যে একটা গূঢ় জিনিস এবং অজ্ঞাত বিষয়ও ঠিকভাবে অনুভব করতে পারি।

জান ভগ্নী, আমার আত্মায় তিনি যে দীপ জ্বালিয়েছেন তা বোধ হয় নিভবার নয়। এই অসাধারণ মানুষের সঙ্গ পাওয়ার লোভে, তাঁর মেঘমন্দ্রধ্বনির মত কণ্ঠস্বর থেকে উদ্‌গত বাণী শোনার আকর্ষণে টরেন্টন গ্রাম থেকে প্রায় আসি। ওঁর কথা শুনলে আমায় ভেতরটা ভরে ওঠে। আমি যেন নতুন করে বেঁচে ওঠি। স্বামীজির কথাগুলো আমার সমস্ত মর্মের ভেতর সর্বক্ষণ গুণ গুণ করে। "হে মাধব, কত লোক তোমাকে কত কি দেয়, কিন্তু আমি যে গরিব। তবে আমার আছে এই দেহ মন প্রাণ-তাই দিলাম তোমাকে। নাও প্রভু নাও। ফিরিয়ে দিও না হে জগন্নাথ!" তাঁর ব্যাকুলতার আমারও হৃদয় মন আলোড়িত হয়ে ওঠল। বাইবেলের অনেক ঘটনা চোখে স্পষ্ট দেখতে পাই। সেই মুহূর্তে মনে হয় পেয়ে গিয়েছি পরশপাথর—যাকে খুঁজেছি এতদিন।

অথচ কী আশ্চর্য! মার্গারেট এই বিস্ময়কর মানুষ সম্পর্কে বিন্দু-বিসর্গ জানে না। এখন মনে হচ্ছে, সে ছাড়া লন্ডনের অনেক মানুষ, সিসেম ক্লাবের বেশ কিছু সদস্য তাঁর সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখে। এই অজ্ঞতার জন্য নিজেরে ওপরে তার রাগ হয়। এত মানুষের কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দু যে, তিনি কখনই সাধারণ মানুষ নন। তাঁর সম্পর্কে মার্গারেটের অন্তরে এক ধরণের ঔৎসুক্য জাগল।

মানুষটি কিছুকাল আগে চিকাগো কাঁপিয়ে মানুষের অন্তর আপ্লুত করে ভাবের বন্যায় আমেরিকাবাসীর চিত্ত প্লাবিত করল। সেখানকার খবর কাগজেও তাঁর নাম এবং ধর্মান্দোলন প্রসঙ্গে বিবিধ সংবাদ ছাপা হল। কোথায় কোন

মহিলা বা পুরুষ তাঁর চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে, আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেকে এবং নিজের ধনসম্পদকে তাঁর সেবায় সমর্পণ করে ধন্য হয়েছেন, কিংবা কোনো মনীষী, চিন্তাবিদ, দার্শনিক বলেছেন—তিনি ঈশ্বরের দূত। বিধাতার বার্তা বহন করে এনেছেন আমেরিকায়। আবার কেউ বা বলেন, তাঁর কণ্ঠ নিঃসৃত বাণীই দেববাণী। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন তাঁর বাণী অভিনব। এহেন হৃদয় মন আলো করে দেয়া কথা তারা আগে শোনেনি। ভক্তদের কেউ কেউ তাঁর মুখের সঙ্গে বুদ্ধের ক্লাসিক মুখের সাদৃশ্য দেখে অভিভূত হয়ে তাঁকে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সন্তান জ্ঞানে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছে। বান্ধবী নেল হ্যামন্ডের কথাটা শ্রবণেন্দ্রিয়ের মধ্যে কে যেন ফিস ফিস করে উচ্চারণ করল ঃ মার্গারেট, তিনি সত্যিই এমন এক মানুষ যাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে রাজারও আনন্দ হয়। তিনি হৃদয়ের রাজাধি রাজ। মার্গারেট আশ্চর্য হয়ে ভাবে এক অখ্যাত, নাম না জানা দেশের মানুষ কোনো পূর্বখ্যাতি এবং নাম পরিচয় ছাড়া এক অজানা, অচেনা দেশের মাটিতে পা রেখে বিনা আমন্ত্রণে বিশ্বধর্ম মহাসভার মহাসম্মেলনের প্রাঙ্গনে পৌঁছনো এক নজিরবিহীন ঘটনা। এক অদৃশ্য শক্তি হাত ধরে যেন তাঁকে পৌঁছে দিয়ে গেল মানুষের হৃদয়ের বন্ধ দরজা খুলে মনের ঘরে আলো জ্বেলে দেওয়ার জন্য। দীপ জ্বেলে নেওয়ার তর সয় না আমেরিকাবাসীর। ভাবের বন্যায় তাদের চিত্ত প্লাবিত হল। তাঁর আমেরিকা বিজয়ের গল্প ইংলন্ডের আকাশে বাতাসে উড়তে লাগল। সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় মানুষের ভাললাগার গল্প। আমেরিকার হাওয়ায় ইংলন্ডর ঘর ভরে গেল। রেভারেন্ড হাউইস এবং ক্যানন উইলবার ফোর্সের মত ধর্মজগতের সুবিখ্যাত ব্যক্তিগণও তাঁর ভাষণে চমৎকৃত হয়ে বললেন ঃ স্বামীজী খ্রীষ্টধর্মের নতুন বার্তাবহ। তিনি শুধু একজন ভারতীয় যোগী নন, তাঁর হৃদয় প্রেমে পূর্ণ আর স্মৃতি-বহুযুগের ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ।

তবু মার্গারেটের মনে হয় স্বামীকে নিয়ে লোকে বাড়াবাড়ি করছে। একটা মানুষের মধ্যে অনেক মহৎগুণ থাকতে পারে। সাধু-সন্ন্যাসীর মধ্যে সে সব গুণ থাকা বিচিত্র কোনো ঘটনা নয়। বিবেকানন্দকে নিয়ে এত হৈ-হৈ করাটা নিছকই হুজুগ। তিন তো আর ঈশ্বর নয়, ঈশ্বরের পুত্র। এতো যীশুর কথার প্রতিধ্বনি। তাহলে তাঁর কথার মধ্যে নতুনত্ব কী থাকল। আসলে ভারতবর্ষের যোগীরা বশীকরণের মন্ত্র জানে। যোগপ্রভাবে স্বামীজিও মানুষগুলিকে মোহাবিষ্ট করে রেখেছেন। নইলে. গির্জায় দাঁড়িয়ে শ্রোতাদের সামনে সাহস করে কখনও বলতে পারতেন না—নিজের বাইবেল নিজে রচনা কর। নিজের খ্রীষ্টকে নিজে আবিষ্কার কর। গির্জা কিংবা মন্দির কাউকে রক্ষা করতে পারে না। ঈশ্বরের কাছে সোজা চলে যাও! কোনো ধারণা নয়, কোনো মতবাদ নয় তা-হলেই

সব সন্দেহ দূর হবে, যা কিছু বাঁকা, সোজা হয়ে যাবে। এ যেন প্রত্যক্ষ অনুভূতি। প্রত্যক্ষের মত সত্য। কথাগুলোর মধ্যে এমন একটা দৃঢ়তা আছে যে, শোনা মাত্র বুকের ভেতর কাঁপন শুরু হয়ে যায়।

মার্গারেটের ভিতরটাও কাঁপছিল। ঝড়ের মুখে বিপন্ন পাতার মত কাঁপছিল। এই কাঁপনের উৎস কোথায়, মার্গারেট জানে না। এক দোলাচলের মধ্যে স্থির হয়েও রইল। তাঁকে অন্যদের মত মেনে নিতেও পারছে না, আবার অস্বীকারও করতে পারছে না। তা-হলে যারা ঈশ্বর দর্শনের কথা বলে কিংবা নিজেদের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির কথা শোনায়, সেগুলো মিথ্যে হয়ে যায়। উপলব্ধির বাস্তবতা, অনুভূতির গভীরতা কি এত তীব্র হতে পারে? ধর্মপ্রাণ স্যামুয়েলও বলেছেন, মার্গারেট, মনের এক বিশেষ অবস্থায় দিব্যদর্শন হওয়া সম্ভব। পুনরায় মার্গারেটের বুকের ভেতর কেমন করে ওঠল অবিশ্বাসে কিংবা সংশয়ে নয় সত্যের উপলব্ধিতে। নিজের মনেই নিরুচ্চারে বলল ঃ এরকম করেই অদ্ভুত প্রেমিক, মহানুভব মানুষকে নিয়ে লিজেন্ড সৃষ্টি হয়। লিজেন্ড মিথে পরিণত হয়। ভারত সন্ন্যাসীরে নিয়ে সেরকম অনেক গল্প মার্গারেট শোনে রোজ, যার অনেকটাই লিজেন্ড এবং মিথের মত।

কেবল মার্গারেটরই ব্যতিক্রম। এই মানুষটির প্রতি তার কোনো মোহ নেই। তবু চারপাশের তরঙ্গ এসে তার মনকে ছুঁয়ে যায়। ভুলে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ তিনি এখন সংবাদপত্রে সংবাদ হয়ে ওঠেছেন। মানুষের মনটাকে ভীষণভাবে নাড়িয়ে দিয়েছেন। ফলে তাঁর সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অন্তরে যত বিস্ময় সৃষ্টি হচ্ছে ততই তাঁর আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠছে। দর্শকের মুখে মুখে তাঁর সম্পর্কে যত গল্প ছড়াচ্ছে ততই তিনি কৌতূহলের পাত্র হয়ে ওঠছেন। মানুষের মুগ্ধতাই যেন প্রবলবেগে তাঁর দিকে টানছে। মার্গারেটও ভেতরে ভেতরে সেরকম টান অনুভব করে। কালের মত স্বামীজিও সবলে তাঁর দিকে আকর্ষণ করছে যেন তাকে। বোধ হয়, ভারতবর্ষ নামটির প্রতি দুর্বলতা থাকার জন্যই মনটা তাকে স্থির থাকতে দেয় না। নিজের অজান্তে বুকের ভেতরটা কেমন করে। শ্রদ্ধায় মনটা দীন হয়ে যায়। আর তখনই মনে হয় স্বামী সম্পর্কে কিছু না জানাটা লজ্জার। এতে স্বামীর কোনো ক্ষতি নেই, কিন্তু মার্গারেটের মত একজন জ্ঞান পিপাসু, তার্কিক, ধর্ম ও সংস্কৃতি-সচেতন মানুষকে সেজন্য অনেক মূল্য দিতে হয়।

ক'দিন ধরে মার্গারেটের মনটা ভালো যাচ্ছে না। ইদানীং সিসেম ক্লাবের সব সদস্যই লক্ষ্য করে মার্গারেট ভীষণ অন্যমনস্ক এবং উদাসীন। ক্লাবে সর্বক্ষণ চুপচাপ থাকে। কেউ কিছু বললে বা জিগ্যেস করলে হাঁ, হু-না করে কাটিয়ে দেয়। এধরনের অদ্ভুত আচরণ করতে মার্গারেটকে আগে কেউ দেখেনি। এই

ক্লাবে সবচেয়ে প্রাণোচ্ছল সে। সর্বদা হাসি-খুশিতে জীবন্ত। সকলের চেয়ে জীবনীশক্তি যেন কয়েকগুণ বেশি। হয়তো সেকারণেই বন্ধুরা এবং সদস্যেরা ঘিরে থাকে তাকে। কিন্তু ইদানীং ক'দিন হল, কী হয়েছে সে নিজেও জানে না ভাল করে।

সকলের কাছ থেকে একটু দূরে দূরে থাকে। এমনকি তার মত তর্কপ্রিয় মেয়ে কোনোরকম তর্কেও যোগ দিচ্ছে না। বড় বড় নীল চোখ দুটিতে তার স্পর্ধার সেই ঝিলিক কোথায় অন্তর্হিত হয়েছে যেন। আকাশের মেঘের মতন তার মুখেও কিসের ছায়া।

একটু তফাতে বসে লেডি রিপন মার্গারেটকে পর্যবেক্ষণ করছিল। বেশ বুঝতে পারছিল একটা প্রবল মানসিক অস্থিরতা তাকে অশান্ত করে তুলেছে। নিজের কাছে উত্থাপিত প্রশ্নের কোন মীমাংসা করতে পারছে না বলে এরকম বিচলিত অবস্থা তার। লেডি রিপন তার জন্য সমবেদনা অনুভব করল। মার্গারেটকে সে ভীষণ ভালবাসে। তাঁর সেলুনেই মার্গারেটের সঙ্গে আলাপ। শিল্পসাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা হতে হতে তাদের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তারপর মার্গারেটের উৎসাহে ও প্রেরণায় এই সেলুনে শিল্প সাহিত্য চর্চার এক আড্ডা গড়ে ওঠে। সংস্কৃতিমনা এবং সাহিত্যপ্রেমী মানুষদের যাতায়াতে সেলুন হয়ে ওঠল সারস্বতজনের মন্দির। সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র। মার্গারেটকে না পেলে বিদ্বদজনের সমাবেশ হত না এখানে। সিসম ক্লাবও প্রতিষ্ঠিত হত না। সেজন্য লেডি রিপনের খুব গর্ব হয়। কারণ তার ভিক্টোরিয়া স্ট্রিটের সেলুনই সিসেম ক্লাবের সূতিকাগৃহ। এখানেই তার শৈশব কেটেছে। তারপরে ডোভার স্ট্রিটে স্থানান্তরিত হয়েছে। লন্ডন শহরে এখন সেসিম ক্লাবের খ্যাতি ও গৌরবে আকৃষ্ট হয়ে নামী-দামী লোক নিয়তই আসে। সেসিম ক্লাব মার্গারেটের ধ্যান-জ্ঞান। এখানে এলে সে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। কবে কোন অনুষ্ঠান হবে, কে কে বক্তা হবে, আলোচনার বিষয় কী হবে, এসবই মার্গারেটকে স্থির করতে হয়। সর্বক্ষণ সেজন্য ব্যস্ত থাকতে হয়। বিতর্কের কোনো কথা কানে গেলে কাজের মধ্যেই তৎক্ষণাৎ তর্কে মেতে ওঠে। কিন্তু আজ একেবারে ভিন্নরকম। চেনা মার্গারেটকে তার মধ্যে খুঁজে পেল না লেডি রিপন। তারও মনটা বিষণ্ণ হয়।

ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত তার পাশে এসে বসল লেডি রিপন। টেবিলে রাখা তার স্খলিত হাতের ওপর হাত রাখল পরম মমতায়। বলল ঃ কী হয়েছে তোর? আর্তমনের কষ্ট সহ্য করতে পারছি না। তোমার ওপর কেউ নিষ্ঠুরতা করেছে বলে তুমিও নিজের ওপর নিষ্ঠুরতা করবে এটা কোনো কাজের কথা নয়। মার্গারেট আমরা কেবল নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারি। আমি জানি না তোমার কী হয়েছে, কিন্তু তুমি যদি সুখী না হও, যদি ভেঙে পড়, প্রতিকূল অবস্থার হাতে

পরাভূত হও তাহলে আমিও তোমার মত দুঃখ পাব, কষ্ট ভোগ করব। কিন্তু আমি জানি তা হবে না। তুমি নিশ্চয়ই প্রতিকূলতা কাটিয়ে ওঠতে পারবে।

লেডি রিপনের উদ্বিগ্ন ব্যাকুলতা মার্গারেটের ভীষণ ভাল লাগল। বড্ড কাছের মানুষ মনে হল। বিভোর বিস্ময়ে নীল আকাশের মত দুটি নীল চোখ তার চোখের ওপর স্থির হয়ে থাকল। চাহনিতে বোবা শূন্যতা। অস্ফুট স্বরে বলল ঃ কেন, এত উতলা হচ্ছ তুমি? সত্যি, আমার কিছু হয়নি। মন থাকলেই মনের কিছু ব্যাপার থাকে। মাঝে মাঝে মনের বনে বাইরের ঝড় এসে লাগে শূন্যতা দিয়ে একদিন জীবন শুরু করেছিলাম বলে ফাঁকির বাঁশি বাজায়নি। অনেক কাল পরে নিজের কথা ভাবতে বসে কেবলই মনে হচ্ছে কোথাও আমার জীবনে মস্ত একটা ফাঁকি রয়ে গেছে। সেটা জানতে না পারার জন্যই আমার কষ্ট এবং দুশ্চিন্তা হচ্ছে।

মার্গারেট, নিজেকে কষ্ট দিয়ে কোনো স্বর্গ থেকে তোমার সুখ পেরে আনতে পারবে না। সুখ বাইরের কোনো অবস্থায় বা বস্তুতে নেই। মনের সুখই সুখ। অন্তরে তার আয়োজন সম্পূর্ণ হলে তবেই বাইরের স্পর্শে তা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে

লেডি রিপনের মন গলানো কথায় মার্গারেট অভিভূত হল। তাকে মনে হল এক স্থবির মহাবৃক্ষের মত। তার স্নিগ্ধ ছায়ায় আশ্রয়ের আসন পাতা রয়েছে। তার শান্ত ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে সব কিছুই কেমন মায়াময় মোহময় হয়ে ওঠে লেডি রিপনকে সে আজ নতুন করে চিনল। ভীষণ ভাল লাগল তাকে। থমথমে মুখ করে কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে রইল। মলিন হেসে বলল ঃ আমাকে খুব আনহ্যাপি মনে হচ্ছে তাই না?

ভীষণ এক লজ্জায় লেডি রিপনের মুখ রাঙা হয়ে গেল। দ্রুততায় নিজের কথা শুধরে নেয়ার জন্য বলল ঃ মোটেই সে কথা বলিনি। আমার তো মনে হয় তোমার মনের ভেতর অন্য এক সুখের পালা চলেছে। যা কিছুই অজানা. তার সম্পর্কে একটা দুশ্চিন্তা হয় বৈকি!

কথাটা এমনভাবে বলল মার্গারেটের মনে হল লেডি রিপন তার ভিতরটা দেখতে পাচ্ছে যেন। কোথাও কোনো আড়াল নেই। তার মনের সংকটকে সত্যিই হৃদয় দিয়ে যেন ছুঁতে পেরেছে সে। বিস্ময়টাকে নিজের ভিতর চট করে লুকিয়ে একটু সময় নিয়ে মার্গারেট বলল ঃ একটু আগে লেডি ইসাবেলের মার্গেসনের গর্ভনেস এবং আমার সহকর্মী উইডম্যান এর কাছে তাঁর আমন্ত্রণ পেয়েছি।

আগামী শুক্রবার ওয়েষ্টএন্ডে লেডি ইসাবেল মার্গসনের বাড়িতে এক ঘরোয়া বৈঠকে ভারতের সন্ন্যাসী কিছু আলোচনা করবে। ঐ সভায় আমাকে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করেছে। একটু আগে তাঁর দেবর রিপন এসেছিল ক্লাবে। স্বামীজির আমেরিকার হৃদয় জয়ের সাফল্যের অনেক গল্প শোনাল।

তাঁর খ্যাতি, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা সম্বন্ধে ভালো করে আমার ব্রেনওয়াশ করে গেল। এত লোক থাকতে আমাকে এত গুরুত্ব দেওয়ার কারণটা বুঝে ওঠতে পারছি না। তারপর থেকে ভাবছি। এই নিমন্ত্রনের হেতু কি?

লেডি রিপন হেসে বলল ঃ একটা নিমন্ত্রণ নিয়ে এত চিন্তা করার কি আছে?

ম্যাডাম, জীবনে মাঝে মাঝে এমন সব অদ্ভুত ঘটনা আকস্মিকভাবে ঘটে যায় যে, তার কার্যকারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। তবু, অনিবার্যভাবেই তা ঘটে, আমাদের ভাবনা কিংবা চাওয়ার ওপর বিন্দু বিসর্গ নির্ভর করে না। সেরকম কিছু একটা আশঙ্কা করে আমি লড়াই করছি নিজের সঙ্গে সেটা আমার ব্যক্তিগত লড়াই। খুব সাঙঘাতিক। আবার সাংঘাতিক নয়ও।

আশ্চর্য! তবু সেটা নিয়ে লড়তে তোমাকে হবেই। তোমার কথার মধ্যে এমন কিছু অসঙ্গতি এবং অস্বাভাবিকতা আছে যে,—

বুঝতে পারছ না।

ঠিক তাই।

তাহলে শোন, ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেন, মানুষও প্রতিমুহূর্ত নীরবে, নিভৃতে নিজেকে অবিরাম সৃষ্টি করছে। ঈশ্বরের মত মানুষও স্রষ্টা। এই সৃষ্টির যাত্রা তাকে শান্ত থাকতে দেয় না। অয়ন পথটাও ভাল করে জানে না সে। তবু অলক্ষ্যে তার আয়োজনটা কী হলে কী হয়, আমার ক্ষেত্রে তার পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি যেন।

লেডি রিপন অবাক চোখে চেয়ে থাকে তার দিকে। কী যেন বলি বলি করেও চুপ করে গেল। মার্গারেট হতভম্বের মত কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকে বলল ঃ মর্জেসনের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করি এমন জোর আমার নেই। কেবলই মনে হচ্ছে ভুবন ভোলানো ঐ সন্নাসীর মধ্যে স্বর্গীয় কিছু আছে। উনি যেন আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছেন। কেন যে একথা মনে হয় জানি না।

কথাটা শুনে অবাক হল না লেডি রিপন। খানিকটা উদাস গলায় বলল ঃ মার্গারেট অদৃষ্ট সম্পর্কে বিশ্বাস এক অদ্ভুত জিনিস। মন অনেক কিছু আগে থেকে কল্পনা করে নেয়। বাস্তবে সব সময় তা সত্য নাও হতে পারে। এসবই তোমার মনের প্রতিক্রিয়া। তোমার আশঙ্কা যদি সত্যও হয় তাহলেই বা ভয় কি? একজন মহাপুরুষের ডাকে সাড়া দেওয়াতো ভাগ্যের কথা।

মার্গারেটের মুখখানা সহসা ভয়ে বিবর্ণ হল। বলল ঃ আমার ভয়টা তোমাকে বোঝাতে পারব না। তবু প্রতিমুর্হূত মনে হয়, পরম মমতাময়ী মায়ের কাছ থেকে আমি ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছি। বেশ বুঝতে পারি, মা যেন একটু একটু করে আমার সঙ্গে তার সব সম্পর্ক কাটিয়ে ওঠার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। দিন দিন তাঁর অসহিষ্ণুতা বাড়ছে। মুখে না বললেও তাঁর আচার আচরণ দেখে অনুমান করতে পারি ; কী একটা গোপন করতে গিয়ে প্রাণপণে নিজের সঙ্গে লড়াই করছেন। ভেতরের লড়াইটা তাঁকে খিট খিটে করে তুলছে। পরিবর্তনটা

ভারতের সন্ন্যাসী খবর কাগজের সংবাদ হয়ে ওঠা থেকেই লক্ষ্য করছি। ইদানীং আমাকে হারানোর ভয়টা প্রবল হয়েছে। মায়ের সেই মনটাকে হৃদয়ের অন্তস্তলে গভীর করে টের পাই। তাই লেডি ইসাবেলের আমন্ত্রণ নিয়ে ভাবনা চিন্তা করছি। কী করব, ভেবে স্থির করতে পারিনি। খাওয়ার কথা মনে হলেই মা'র মুখখানা আমার পথ আগলে দাঁড়ায়।

আকস্মিক এই অপ্রিয় প্রসঙ্গে লেডি রিপন কথা হারিয়ে ফেলল। জবাব দিতে পারল না। শুধু অস্থিরভাবে এদিক ওদিকে চাইতে থাকে। তারপর একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল ঃ তোমার ভয়টা অহেতু। সন্নাসী তোমাকে চেনে না, জানে না। এধরনের একটা অমূলক আশঙ্কা মনের ভেতর পোষণ করার যুক্তি আছে কি?

নেই। ভূগোলের বইতে আর মানচিত্রে ওই দেশের অস্তিত্বের সংবাদটুকু শুধু জানি।

তাহলে সন্ন্যাসীর কোন কাজে লাগবে তুমি? তোমার মত একজন বিদেশিনীকে সন্ন্যাসী বড় জোর ইংলন্ডের কাজে লাগাতে পারে। মিছেই একটা উদ্বেগে আর দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছ।

মাথা হেঁট করে মার্গারেট ভাবছিল। দাঁত দিয়ে নিজের মনে নখ কেটে যাচ্ছিল। বেশ কিছুক্ষণ পরে বলল ঃ শুনেছি বেশ কিছু পুরুষ ও মহিলা তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে ভারতে যাওয়া মনস্থ করেছেন। এঁরা কেউ ভারতবর্ষকে দেখেনি, ভারতের নামও শোনে নি।•সে দেশের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। তবু কী এক আশ্চর্য মোহে এবং আকর্ষণে নিজের দেশ, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সম্পদ-সম্পত্তির মায়া ত্যাগ করে ভারতবর্ষে যাওয়ার জন্য উন্মুখ হয়েছেন। এঁদের মহান ত্যাগের উৎসটা কোথায় জানি না। সন্ন্যাসীর কথায় এমন কোনো বিশ্বাস জন্মেছে, কিংবা সত্যের সন্ধান পেয়েছে যা সারা জীবন ধরে স্বদেশ এবং স্বধর্ম তাঁদের দিতে পারেনি। ভারত তাঁদের সেই পরম প্রাপ্তির স্বর্ণভূমি হতে পারে মনে করেই হয় তো আত্মার তৃপ্তি খুঁজতে এবং পরমকে লাভ করতেই ব্যাকুল হয়েছেন। তাঁর বক্তৃতা শুনলে অনুরূপ কোনো মুগ্ধতায় আমার অন্তঃকরণ যদি ব্যাকুল হয় তাহলে কী করব আমি।

লেডি রিপন থমথমে গম্ভীর গলায় বলল ঃ লেডি ইসাবেলের বাড়িতে যাওয়া না যাওয়া তুমি স্থির কর বাপু। এসবের মধ্যে আমি থাকতে চাই না। তোমাকে যেতে বলে আমি নিমিত্তের ভাগী হব কেন? মানুষের মন বলে তো কথা! কখন কী হবে কেউ জানে না? তুমিও না।

ঘরে ঢুকেই মেরী দেখল মার্গারেট গরাদের ওপর মাথা রেখে নীল আকাশের দিকে উদাস চোখে চেয়ে আছে। মেরী পা টিপে তার খুব

কাছে গিয়ে দাঁড়াল। নিজের অন্যমনস্ক উদাসীনতার মধ্যে এত বেশি ডুবে ছিল যে ভগিনীর আগমন টের পেল না। মেরী খুব আস্তে তার পিঠে হাত রাখল। মমতা মাখানো গলায় ডাকল ঃ দিদি।

মার্গারেটের সারা শরীরের মধ্যে তড়িৎপ্রবাহ খেলে গেল। গহন স্তব্ধতা ভেদ করে যেন জেগে ওঠল। তার কিছু বলার আগে মেরী ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করল ঃ এই দিদি তোর কী হয়েছে? তুই তো আগে এমন ছিলি না। হঠাৎ ভীষণ বদলে গিয়েছিস। তোকে ভীষণ অচেনা লাগে। কোথায় তোর কষ্ট আমাকে বল্ দিদি। গোপন করিস না।

বিব্রতভাবটা কাটিয়ে ওঠার জন্য মার্গারেট বলল ঃ কৈ, আমার তো কিছু হয়নি। দিব্যি আমার মতই আছি।

মেরী মার্গারেটের চোখের ওপর চোখ রেখে বিজ্ঞের মত বলল ঃ মনের মধ্যে কোথায় কী ঘটে যায় কখন, মানুষ নিজেও জানে না।

হাসিতে উজ্জ্বল হল মার্গারেটের মুখমণ্ডল। বলল ঃ চিরদিন বুড়ী হয়ে থাকবি। তোর ঠাকমা ঠাকমা কথাগুলো এখনও গেল না।

মেরী গম্ভীর হয়ে ধমকে বলল ঃ লুকোনোর চেষ্টা করিস না। চিরদিন তুই বড় চাপা।

প্রত্যেক মানুষের কিছু কিছু কথা থাকে যা একান্ত নিজের। অন্যকে ভাগ দেয়া যায় না। নিজের কষ্টের কথা বলে অন্যকে আর্ত করে তো তার সুরাহা হয় না। তাই আসল আমি, একা আমার সর্বস্ব সম্বল করে মূল প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকেই তার জবাব দিতে হয়।

হতাশামথিত দীর্ঘশ্বাসে বুক আলোড়িত হল মেরীর। বলল ঃ সেই প্রশ্নের মুখামুখি দাঁড়িয়ে তা-হলে কি ঠিক করলি?

এখনও পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারিনি। লেডি ইসাবেলের বাড়িতে ভারতের সন্ন্যাসীর বক্তৃতা আছে। পাছে না যাই, সেজন্য লর্ড রিপনের ভাইকে দিয়ে আমাকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করেছে।

ভারতের সন্ন্যাসীর নাম শুনে মেরী তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠল। বলল ঃ এই মানুষটিকে নিয়ে ইংলন্ডের কাগজগুলো এত মাতামাতি করছে যে লন্ডনের মানুষগুলো পর্যন্ত ধেই ধেই করে নাচছে। কাগজ বিক্রীও নাকি বেড়েছে। ওই সাধু অলৌকিক কিছু করছে না, মানুষকেও ডাকছে না, মানুষই তার কাছে যাচ্ছে। তার বক্তৃতা শোনার হিড়িক পড়ে গেছে।

তাই তো খুব ইচ্ছে হচ্ছে, যে মানুষকে নিয়ে এত ঔৎসুক্য, হৈ-চৈ, সে মানুষটা সত্যি কত বড়, কত অসাধারণ স্বচক্ষে একবার দেখতে খুব ইচ্ছে হয়। এত মানুষকে কথায় ভোলানোর ক্ষমতা যাঁর আছে তিনি কখনও সাধারণ মানুষ

নন। উপদেশ দিতে তিনি আসেন নি, মানুষের চৈতন্য জাগ্রত করাই তাঁর উদ্দেশ্য। ধর্ম ও ঈশ্বর সম্পর্কে-আজন্ম বিশ্বাসগুলো তিনি গুঁড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর কথাগুলো এমন সহজ, সরল, সংস্কারমুক্ত এবং বিশ্বাসযোগ্য বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় এত সহজবোধ্য যে লোকে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। খবর কাগজে আজ তাঁর ভাষণ পড়লাম—পশুর ধর্ম নেই, ধর্ম শুধু মানুষেরই ঈশ্বরদত্ত সম্পদ। মানুষই তা ধারণ ও পালন করে। মানুষ নিজের মঙ্গলের জন্য এবং সমাজ ও সংসারকে সুস্থ ও সুন্দর করার জন্যই বলে ; ন্যায়পথে চল, নির্লোভি হওত, স্বার্থ ত্যাগ করে অন্যের প্রতি দয়াশীল হও, ন্যূনতম মানুষের কর্তব্য কর। সত্যই মানুষকে নির্ভীক করে। একমাত্র এই বোধই মানুষকে পশু থেকে আলাদা করে। ভগবান পশুকে এই অনুভূতি ও বিচারবোধ দেয়নি। এই উপলব্ধি ব্যতিরেক সমাজ ও সংসার স্থির থাকতে পারে না। এই শুভবুদ্ধি ধারণ করার অন্য নাম ধর্ম। এবং যা কিছুই এর বিপরীত তা শুধু বিপরীত ফল দেবে। এবং তা কখনও ধর্ম নয়, অধর্ম। কথাগুলো খুবই সাধারণ। নতুন কিছু নয়। তবু উপস্থাপনে অভিনবত্ব আছে বৈকি! বলতে বাধা নেই আমার মন আপ্লুত হয়ে গেছে। আর পাঁচজনের মত আমার মনেও এখন দুরন্ত কৌতূহল। যে মানুষের কথা শোনার জন্য এতলোক পাগল হয়, সে মানুষটিকে স্বচক্ষে দেখলে আমার অবিশ্বাসী মনটা কিরূপ আলোড়িত হয় পরখ করে দেখতে লেডি ইসাবেলের বাড়িতে তাঁর বক্তৃতা শুনতে যাব।

কৌতুকে বিস্ময়ে মেরীর দু'চোখ গোল গোল করে বলল ঃ এই দিদি! তুই মজেছিস। ফল পেকেছে। বোঁটা থেকে খসে পড়তে যেটুকু দেরি। আমার ভয় হচ্ছে দিদি। তারপরেই কণ্ঠস্বর কেমন সকরুণ ব্যাকুলতায় আর্ত হল। জানলার ধারে দাঁড়িয়ে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে ছাড়া ছাড়া গলায় অস্ফুট কণ্ঠে বলল ঃ

> It is the Cause, it is the cause my soul.
> Let me not name it to you, you chaste stars—
> It is the Cause, yet I'll not shed her blood,
> Nor scar that whiter skin of hers than snow,
> And smooth as monumental alabaster.
> Yet she must die,

মার্গরেট মুগ্ধ হয়ে কথাগুলো শুনল। চোখ দুটো কেমন স্বপ্নালু হয়ে ওঠল। বুকের রক্তে কলধ্বনিতে বাজতে লাগল মেরীর কণ্ঠস্বর। বেদনার সমুদ্র যেন উথলে ওঠল বুকের ভেতর। সে কথা বলতে পারল না।

মার্গারেট অনুভব করলে মনের অভ্যন্তরে কোথায় তার পরিবর্তনের একটা স্রোত বইছে। নিজের মনের ভেতরে ডুব দিয়ে কেমন উৎসুক স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে

মেরীর মুখের দিকে অপলক চেয়ে থেকে প্রায় নিঃশব্দ গলায় বলল ঃ আমি কি খুব বদলে গেছি?

নভেম্বর মাসের এক সুন্দর বিকেল। দিনটা রবিবার।

মন্থর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে মার্গারেট লেডি মার্জেসনের ওয়েস্ট এন্ডের বাড়ির সামনে দাঁড়াল। রাস্তার ওপর মস্ত বাড়ি। বাড়ির ভেতর যাবে কি, যাবে না করে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর অদূরে একটা ছোট্ট পার্কের বেঞ্চিতে বসল। মনের মধ্যে তার তুফান। মনের মন কী চায় জানা না থাকলে মনে ঝড় ওঠে। ঝড় ওঠলেই সেই উথাল পাথাল দরিয়াতে তার বড় অসহায় লাগে। শুধু হুজুগে মেতে ভারতের সন্ন্যাসীর বক্তৃতা শুনে কী লাভ! যে মনটা বাইরের আঘাতে নিরাশ্রয় এবং নিরলম্ব হয়ে আছে তার সুরাহা করবে কোন মন্ত্রবলে? এই মুহূর্তে তার দরাকার আত্মার শান্তি। স্বামীজির সাধ্য কি অশান্ত মনকে শান্ত করে। আর পাঁচজন সাধু-সন্ন্যাসীর মতই বলবে ঈশ্বরের পদে নিজেকে সমর্পণ কর—সব দুঃখ, অশান্তি দূর হয়ে যাবে। ঈশ্বরই পরম আশ্রয়। ইদানীং এসব কথা শুনলে ভীষণ অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে। মুখে কিছু বলে না, কিন্তু বিরক্তির ভাব ফুটে ওঠে। যীশুর সেবিকা হয়ে কী পেল জীবনে? যীশুকে চিত্ত সমর্পণ করেও চার্চে স্থান হল না তার। চার্চের সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেই সে সরে দাঁড়াল। ধর্মযাজকের ধর্মবিরোধী কার্যকলাপ, ধর্মের অপব্যাখ্যা এবং সঙ্কীর্ণতা তার স্পর্শকাতর বিচারপ্রবণ মনকে আর্ত করে তুলল। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী গোঁড়া মনটা ভীষণ ধাক্কা কেল। গোঁড়ামিতে ভাঙন ধরল। নিজের মনেই নিজেকে জিগ্যেস করল—যীশু কী দিয়েছে তাকে? তারপর এক অদ্ভুত হাসিতে বঙ্কিম হল তার অধর। যীশুর দেবার ধন কিছু নেই। তাই তো সারা জীবন বিপদ বাধা, দুঃখ, যন্ত্রণা, কষ্টের মধ্যে তাঁর কেটেছে। মানুষকে প্রেম, ভালবাসা, মমতা বুক উজার করে দিয়েছেন। তবু মানুষ তাঁর প্রেমের মূল্য দিল কোথায়? প্রেমের সঙ্গে বিস্বাসঘাতকতা করে ঈশ্বরের পুত্রকে তারা হত্যা করল। হঠাৎই মনে হল যীশুর ভক্ত এবং সেবিকা হওয়ার জন্যই তার জীবনেও অনুরূপ দুঃখ কষ্ট, বেদনা, যন্ত্রণার সঙ্গে প্রেমের বিশ্বাসহীনতার অপমান এবং আত্মগ্লানি সহ্য করতে হয়েছে। যীশুর প্রেমই ছিল তাঁর কাঁটার মুকুট। সেই কাঁটা যেন মার্গারেটের হৃদয়ে বিঁধে আছে। এখনও তার রক্তক্ষরণ শেষ হয়ে যায়নি।

মার্গারেটেরে চোখের সামনে চারপাশ থেকে সন্ধ্যাটা গড়িয়ে আসছিল খুব ধীরে। আকাশে এখনও সোনালী আলোর ছড়াছড়ি। সূর্য কোথাও নেই,তবু তার রঙের হোলিখেলায় মেতে ওঠেছে পশ্চিম দিগন্ত। উদ্যানটিও ক্রমে ঝাপ্সা হয়ে আসছে। অন্ধকারে উদ্যানটি ঢেকে যাওয়ার আগে রাস্তার গ্যাস লাইটগুলো জেলে দিল বাতিওয়ালা। দূরের কোনো গির্জার ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজছিল।

কোথা থেকে একজন ভিক্ষুকিনী তার ঘর সংসার সমেত পার্কের বেঞ্চিতে বসল। নিজের নোংরা, ময়লা পোঁটলা-পুঁটলী সামলাতে সামলাতে সুর করে প্রার্থনা সঙ্গীত গাইছিল মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে। মার্গারেটও নিজের অজান্তে গলা মিলিয়ে তার সঙ্গে গুনগুন করছিল। গান শেষ হওয়ার পরেই মার্গারেট ওঠল।

চুম্বকের মত মার্জেসনের বাড়ির দিকে কে যেন টানতে লাগল তাকে। যাবে কি, যাবে না করতে করতে আরো কয়েকটা মুহূর্ত কাটল। তারপর নিজের কাছেই হ্যামলেটের মত প্রশ্ন করল ঃ

> To be, or not to be—that is the question;
> Whether 'tis nobler in the mind to suffer
> The stings and arrows of outrageous fortune,
> Or to take arms agaimst a sea of troubles.
> And by opposing end them? To die, to sleep—
> No more; and by a sleep to say we end
> The heart-ache and thousand natural shocks
> That flesh is heir to.

গেট পেরিয়ে সটান বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল। বেশ কিছুটা যাওয়ার পর ওপরে ওঠার সিঁড়ি। কাঠের সিঁড়ির ওপর উঁচু হিল পরা জুতোর মৃদু খট খট আওয়াজ তুলে সে দোতলায় উঠে গেল। সিঁড়ির মুখেই প্রশস্ত ঘর পর্দা সরিয়ে মার্গারেট কক্ষেতে পা রাখল। পরিপাটি করে সাজানো ঘর। ধূপাধারে গুচ্ছ গুচ্ছ সুগন্ধ ধূপ জ্বলছিল। ফুলদানিতে ছিল সুগন্ধ এবং বাহারী ফুলের তোড়া। বেশ একটা মিষ্টি সুবাসে ঘরখানি ভরপুর হয়েছিল। ঘর জুড়ে পুরু গালিচা পাতা। বিশ পনেরো জন শ্রোতায় স্থানটি ভরা ছিল। তাদের সামনে উপবিষ্ট ছিল ভারতের সন্ন্যাসী। তাঁর পাশেই ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলছিল।

দেরী করে আসার জন্যা মার্গারেট অস্বস্তিবোধ করল। নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হতে লাগল তার। কারণ ও এসেছিল সবার শেষে। তাই বসার জায়গা পেল না। ঘরের এক কোণে একটা চেয়ার ছিল। রেশমের স্কার্ট গুটিয়ে সর্ন্তপণে সেখানে বসতে গিয়েও বিব্রত লজ্জায় থমকে গেল। সবাই ওর দিকে চেয়ে আছে কৌতূহলী চোখ মেলে। চেয়ারে বসতে সঙ্কোচ হল মার্গারেটের। আবশেষে, কোনক্রমে একটু জায়গা করে শ্রোতাদের সঙ্গে গালিচায় বসল। একেবারে সন্ন্যাসীর মুখোমুখি। কিন্তু চক্ষু তাঁর মুদ্রিত।

মুগ্ধ অভিভূত দুটি চোখ মেলে মার্গারেট দেখতে লাগল সন্ন্যাসীকে। সন্ন্যাসীর মাথায় হলুদ রঙের পাগড়ি, কমলা রঙের আলখাল্লা ধরনের পোশাক। কোমরে কমলারঙের রেশমের কাপড় বা Sash। ফায়ার প্লেসের আগুনের লাল আভা পাগরি বাঁধা সুন্দর মুখশ্রীর ওপর পড়ে তাঁকে আরো জ্যোর্তিময় করে

তুলল। মনে হল ধ্যানস্থ এক তেজময় পুরুষের সর্বাঙ্গ দিয়ে আলোর জ্যোতি বেরোচ্ছে। সমস্ত সত্তার ভেতর, চেতনার ভেতর মার্গারেট এক দিব্য ঐশী পুরুষকে দর্শন করল। যেন মুর্হুমুর্হু চমৎকৃত হল সে। সাগরপারের সন্ন্যাসীর সরল ব্যক্তিত্বপূর্ণ দিব্য নয়ন আর প্রশান্ত আনিন্দ্যসুন্দর মুখমণ্ডলে স্পষ্ট হয়ে ওঠল স্বর্গীয় শিশুর কমনীয়তা। কী সরল নিষ্পাপ আলোয় ধোঁয়ায় ওঁর মুখ। কথাটা মনে হতেই মার্গারেটের গায়ে কাঁটা দিল। ভারত সাধক স্বামী বিবেকানন্দের কোমলকান্ত স্বর্গীয় মুখশ্রীর মধ্যে র‍্যাফেলের আঁকা মেরীর কোলে বসা যীশুর মুখ দেখতে লাগল। কানায় কানায় ভরে গেল তার অন্তঃকরণ। শুধু দৃষ্টিপাত মাত্র এরকম কী হতে পারে? মার্গারেট প্রশ্ন করল নিজেকে স্বর্গ থেকে যীশুর রূপ ধরে ঐ সন্ন্যাসী কী আবির্ভূত হয়েছে তার সামনে? তাই বোধ হয়, দৃষ্টির অতীত এক আশ্চর্য রহস্যালোকের মধ্যে তার মনটা প্রবেশ করল।

সেই মুহূর্তে মার্গারেট কল্পনায় দেখল ভারতের কোনো তপোবনে বটবৃক্ষতলে উপবিষ্ট সাধুর সামনে ভক্তশ্রোতৃবৃন্দ যেন গুরুর বাণী শোনার জন্য সমবেত হয়েছে। আর উৎকর্ণ, উৎসুক শিষ্য, শিক্ষার্থী এবং ভক্তের মত তারাও ঘিরে বসেছে তাঁকে। ঘরখানি নিস্তব্ধ। সূঁচ পতনের শব্দ পর্যন্ত শোনা যায়। মার্গারেটেরে বিস্ময়ের অন্ত নেই। কেবলই মনে হতে লাগল এটা কোনো গৃহ নয়, ভারতের তপোবন। তারা সবাই তপোবনের বটবৃক্ষের নিচে গুরুর বাক্য ও বাণী শ্রবণের জন্য এবং তাঁর দর্শন লাভের জন্যই প্রতীক্ষা করছে যেন।

সন্ন্যাসীর কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। শ্রোতায় ঘর ভরে গেলে লেডি ইসাবেল মার্জেসন তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল ঃ স্বামীজি আমাদের বন্ধুরা সবাই এসেছেন। তখনই স্বামীজি চক্ষু উন্মীলন করলেন। অধরে স্মিত হাসি উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে একে একে পরিচয় করে দিল মার্জেসন। ।

প্রশান্ত আত্মসমাহিত দীপ্ত দুটি চোখের তারা মার্গারেটের স্বপ্নের মত নীলাভ দুই চোখের ওপর স্থির হয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ। চারপাশের কোন দর্শক কী ভাবছে তার প্রতি কোনো খেয়ালই নেই তাঁর। মার্গারেটের সারা শরীরের মধ্যে কিসের অব্যক্ত একটা হিল্লোল বয়ে গেল। বুকের রক্ত চলকে ওঠল। স্বামীজির চোখ এড়াল না। তার দিকে চেয়ে কেমন একটু মিষ্টি হাসলেন। মার্গারেটের মনে হল-তার বুকের ভেতর দাঁড়িয়ে যেন অনেক-অনেকদূর থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে আশ্চর্য তেজময় ঐ পুরুষ।

মার্গারেট দেখল, স্বামীজির শান্ত দীপ্ত আঁখিদ্বয় তার দিকে প্রসারিত করে দিয়ে সহসা 'শিব শিব' করে ওঠল। অমনি এক বিদ্যুৎ শিহরণ বয়ে গেল তার মধ্যে। এই শব্দের অর্থ মার্গারেট জানে না। তবু শব্দের মূর্ছনায় যেন লক্ষ লক্ষ ফুলকুঁড়ি ফুটে ওঠল তার চৈতন্যের মধ্যে। চারদিকে যেন স্বপ্নের রামধনু উদ্ভাসিত ঔজ্জ্বল্যে স্থির হয়ে গেল। সেই মুহূর্তে মার্গারেট কল্পনায় দেখল

আনন্দে আত্মহারা গ্রীক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক আর্কেমিডসকে। আসল-নকল সোনার সমাধানসূত্র খুঁজে পেয়ে যে আর্কেমিডস হঠাৎই পাগলের মত ইউরেকা ইউরেকা করে ওঠল। সেইমুহূর্তে আর্কেমিডস বোধ হয় মানুষ ছিল না। অন্য এক ব্যক্তি হয়ে গেছিল। কোন অবস্থায় কীভাবে আছে সে বোধটুকুও ছিল না। উলঙ্গ হয়ে ইউরেকা, ইউরেকা করে রাজবাড়ীর দিকে ছুটল। ভারতীয়দের 'শিব' শব্দটি হয়তো অনুরূপ কোনো আবিষ্কারের আনন্দের বর্হিপ্রকাশ। তাই যদি হয়, তাহলে ভারতের সন্ন্যাসী তার মত শ্বেতাঙ্গ এক সাধারণ রমণীর মধ্যে এমন কী দেখল যে 'শিব শিব' করে আনন্দে আত্মহারা হলেন? অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে সন্ন্যাসী কী সত্যি তার ভেতর কিছু দেখল! তাকে আবিষ্কার করল কী? ওঁর দুটি উজ্জ্বল চোখের স্নিগ্ধ দ্যুতির স্পর্শ যেন লেগে আছে তার চোখের পাতায়। আর সে কেমন আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে তার প্রভাবে। এই উপলব্ধির উৎস কোথায় মার্গারেট জানে না। কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে তার গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। আর এক আশ্চর্য সুখে ও তৃপ্তিতে ভরন্ত কলসের মত ভরে যাচ্ছিল তার ভেতরটা। হঠাৎ একোন উপলব্ধি হল?

মার্গারেট আশ্চর্য হয়ে দেখল পলকের মধ্যে সন্ন্যাসীর সারা শরীর থেকে একটা দিব্য তেজ বিকীর্ণ হতে লাগল। তাঁর মুখের ভাব, চোখের চাহনি বদলে গেল। দৃষ্টি জ্যোর্তিময় হল। চক্ষুতে অর্ন্তদৃষ্টির ভাব প্রকাশ পেল। মনে হল, শূন্যালোকের ভিতর কোন কিছু দেখছেন, তাই একভাবে সেইদিকে তাকিয়ে রইলেন। সম্পূর্ণ অন্য এক মানুষ। চেনা-জানা পৃথিবীর তিনি কেউ নন। সেই মুহূর্তে তাঁকে ভীষণ অপরিচিত মনে হল। তাঁর মধ্যেই তাঁকে নতুন করে দেখতে লাগল মার্গারেট।

প্রথমে ধীরে, স্নিগ্ধ স্বরে আস্তে আস্তে ভাষণ শুরু করলেন। মেঘমন্দ্রধ্বনির মত সে স্বর। কণ্ঠধ্বনি পর্দায় পর্দায় ওঠে ও নামে। ঘরটা মুহূর্তে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। কারও শ্বাসপতনের শব্দ পর্যন্ত শোনা গেল না। ঘরেতে লোক আছে বলে বোঝা গেল না। কেবল স্বামীজির কণ্ঠ থেকে গম্ভীর নাদপূর্ণ ওজস্বী ভাষা নির্গত হতে লাগল। মাঝে মাঝে এক আধটা সংস্কৃত শ্লোক বলেন তৎক্ষণাৎ ইংরেজিতে তার তর্জমা করে দেন। শ্রোতার সঙ্গে বক্তার হৃদয়ের সংযোগ ঘটানোর জন্য মাঝে মাঝে দু'একটি কবি সুলভ উপমা যেমন প্রয়োগ করেন তেমনি উপভোগ্য ব্যঞ্জনাপূর্ণ বেদের গল্প ভাষণের কাঠামোর ওপর এমন এক আশ্চর্য মুনসিয়ানায় জুড়ে দেন যে শ্রোতার মনে ভাষণের রূপ-রঙ ঝিলিক দিয়ে ওঠে। ভাব ও ভাষা এক নতুন মাত্রা পায়। ভাষণেও নতুন করে গতিবেগ সঞ্চার হয়। শ্রোতারা কথার রসসাগরে ভাসতে ভাসতে দেবলোকে পৌঁছে যায়। স্থান, কাল, পরিবেশ সব কিছু সম্বন্ধে আর কোনো হুঁশই থাকল না তাদের। এক আশ্চর্য আলোয় ঝলমল করে তাদের চিত্ত।

বক্তাও নিজেকে উজার করে দিলেন। মনের ভাব প্রকাশের সঙ্গে ডান হাত, বাম হাত সঞ্চালিত হতে থাকে। প্রাচ্যের ঋষিরা যে আলোর সন্ধান দিয়েছেন সেই আলোর মন্ত্রের সঙ্গে এঁদের পরিচয় করাতে তাঁর চিত্ত আনন্দে পরিপ্লুত হয়ে যায়। গলার স্বর যেন ভাষণের সঙ্গে চলকে চলকে চলে, শ্রোতার হৃদয়ের মধ্যে উপছে পড়ে অবলীলায়। শ্রোতারা পুরোপুরি সমাহিত হয়ে যায়। বেশ বোঝা যায় উদ্ভাসিত ঔজ্জ্বল্যে স্থির হয়ে আছে তারা। বক্তার সঙ্গে তাদের হৃদয়ও যেন এক সুরে বাঁধা পড়েছে। শ্রোতাদের এই অভিভূত আচ্ছন্নতা বোধ হয়, তাদের প্রাপ্তির সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্ত। অনুভূতির মধ্যে ভাষণের রেশ পুরোপুরি স্বরাট থাকে ঈশ্বরের মত।

মুগ্ধ আগ্রহে মার্গারেট দু'ঘণ্টা ধরে শুনল তাঁর বক্তৃতা। একোন অভিনব শক্তি অভিভূত করছে তাকে? একোন আলো এসে পড়ল তার মনের দিগন্তে? অজান্তেই হাত জোর করে প্রার্থনা করতে ইচ্ছে করল। কিন্তু কার কাছে কী প্রার্থনা করবে, তা তো জানে না। কেবল অনুভূতি দিয়ে উপলব্ধি করতে পারছিল. সন্ন্যাসী তার মনের অন্ধকার ঘরে আলোর দীপ জ্বেলে দিয়েছে। তাঁর সব কথা সে বোঝে না। তবু কানেতে সন্ন্যাসীর সুরেলা কণ্ঠে অনুরণিত হতে লাগল— প্রাচ্যের অভিনব জীবন বাণী। তার সঙ্গে কোনো দেশের, কোন ধর্মের বিরোধ নেই। সমগ্র মানবগোষ্ঠীর কল্যাণের জন্য যে শাশ্বত উদার মর্মবাণী—যে বাণী কোনো বিশেষ ধর্মের নীতিকথা নয়, যে বাণী সর্বকালের, সর্বলোকের প্রযোজ্য, সে বাণীই স্বামীজির কণ্ঠ থেকে মহামন্ত্রের মত সঞ্জীবনীরসে সিক্ত হয়ে অনুরণিত হচ্ছিল। এক অভিভূত আচ্ছন্নতায় সমাহিত হয়ে সে বসে রইল। তার মুখটি বিস্ময়ে অল্প একটু হাঁ হয়ে ছিল। সন্ন্যাসীর সব কথা সে শোনেনি। ভাষণে মধ্যে বারংবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। এক অকল্পনীয় উদার দিগন্তের বৈপুল্যে ওর মন পাখা মেলে দিল। নিজের কাছেই তার অনন্ত জিজ্ঞাসা— তবে কি সন্ন্যাসী মানুষের মন বোঝেন। পূর্ণ আত্মজ্ঞানী যাঁরা তাঁরাই শুধু জানেন, কোন মন্ত্রে কার বোধন হয় উনি হয়তো তাঁদের একজন। তাই হয় তো ঈশ্বর তাঁর কণ্ঠে মানুষকে জাগানোর মন্ত্র দিয়েছেন। বাবার ভারত প্রত্যাগত যাজক বন্ধুর কাছে ছোট বেলায় শুনেছিল ভারতের তপোনিষ্ঠ যোগীরা ঘন অরণ্যে হিংস্র বন্য পশুদের সঙ্গে অটুট সৌহার্দ্যে বাস করেন? উনি কি তাঁদের একজন!

স্বামীজি বলেছেন মানুষ ভাবে, তাকে ছাড়া ভগবানের চলে না, কিন্তু অনন্ত স্বরূপকে কী দিতে পারে মানুষ? তার দেবার ধন কী আছে, যে তাই দেবে দেবতাকে? আঁধারের ভেতরে যে হাতখানা এগিয়ে আসে আমাদের দিতে সে তো আমাদেরই হাত। 'আনন্ত্যের স্বপ্নের পসারী আমরা...সান্ত্যের স্বপ্নে বিহ্বল...',

মানুষ কী চায়? সুখও নয় দুঃখও নয়, মুক্তি ; শুধু মুক্তি চাই। আমাদের সমস্ত তপস্যা কিন্তু আবন্ধন মুক্তির তপস্যা।

সন্ন্যাসীর কথাগুলো কী গভীর করে টানছিল শ্রোতাদের। কী করে একটা দিনের জন্ম হয় এবং তার অবসান হয় তা নীরবে দেখা এবং তাকে অনুভব করার মত মন যাদের আছে তারা অবুঝ বিস্ময়ে হারিয়ে ফেলে নিজেকে। নিজের অনিচ্ছাতেও মন ভেসে চলে মার্গারেটের। সন্ন্যাসীর প্রত্যেকটি কথা নিপুণ ছন্দে গাঁথা একখানি বাণীর মেলা। বুদ্ধির চাতুরী দেখিয়ে এলোমেলো কতকগুলো কল্পনা ছড়িয়ে দেওয়া নয় শ্রোতাদের চিত্ত সুপর্ণের মত উড়ে যায় আকাশের অনন্ত মাধুরী পান করার জন্য। একটা গভীর নিবিড় শান্তি, সংশয় এবং অবিরাম দ্বন্দ্বের মধ্যে মার্গারেট কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে সন্ন্যাসীর দিকে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে তাঁর ভাষণ শুনছিল। মৃত্যুকে মানুষ আদিতেই জেনেছে। দেহের অমরত্ব সে কখনই আয়ত্ত করতে পারেনি। তবু অমরত্বের তৃষ্ণা তার নিরন্তর। মানুষের আত্মনাশ তাও সম্ভবত বাঁচবার তীব্র ইচ্ছার এক দারুণ দিক। কিন্তু অমরত্বলাভের দুরন্ত আকাঙক্ষা অনায়ত্ত রয়ে গেল তার। ভারতের মুনি ঋষিরা যুগ যুগ ধরে তার তপস্যা করে জেনেছে আত্মার মৃত্যু নেই। মানুষের আত্মা অবিনশ্বর। পাশ্চাত্যের লোকেরা এত বড় একটা গভীর সত্যকে কোনোকালে অনুভব করতে পারল না। অথচ একটু চোখ, মন খোলা রাখলেই তার উপলব্ধিটা তাদের হতে পারত। কিন্তু তারা টাকা কড়ি আর সম্পত্তি বাড়াতেই বেশি মনোযোগী। জগৎ মানেই তাদের কাছে প্রভুত্ব। জগতে অন্য জিনিস যে কিছু ভাববার আছে তা তাদের মোটেই হুঁশ নেই। বলব কি, একবার চিকাগোর একজিবিশন দেখতে নাগর দোলায় উঠেছি। কীভাবে দুটো লোকের মাথা ঠোকাঠুকি লেগেছে। ভাবলাম, একটা কিছু ঘটবে। কিন্তু কী আশ্চর্য, সৌজন্য দেখানোর জন্য দু'জনের কেউ অপ্রতিভ হয়ে দুঃখ প্রকাশ করল না। করলে কি জান ; বিজ্ঞাপনের কার্ড পরস্পরে বিনিময় করে আসন্ন বিবাদটা মিটিয়ে ফেলল। এরা এমনই কারবারী লোক। সুতরাং এদেশের কাছে উন্নত চিন্তা, বড় দার্শনিক ভাবনা, গভীর অনুধ্যান কোথায় পাবে? কেবল ভারতের ঋষিরাই গভীর অনুধ্যানের মাধ্যমে তাকে জেনেছে। সেই জানাটা বলে বোঝানোর নয়, মন প্রাণ দিয়ে তাকে শুধু অনুভব করা যায়। সবার সে ক্ষমতা জন্মে না। তবু অনুভূতি উপলব্ধির ক্ষমতা যেহেতু সব মানুষের আছে সেহেতু আমার বক্তব্যকে হৃদয়ঙ্গম করা হয়তো আপনাদের কঠিন হবে না। ফায়ার প্লেসে যে আগুন জ্বলছে তার শিখাগুলি নিষ্কম্প ও স্থির হয়ে জ্বলছে। প্রত্যেকটি শিখাকেই একটি অগ্নিশিখা বলে মনে হয় বটে, কিন্তু আসলে প্রতিটি শিখা নিমেষে চোখের পলক পড়ার আগে মরে একটি নতুন শিখার জন্ম নিচ্ছে।

কিন্তু তা এত দ্রুত ঘটছে যে, আমাদের নর্মচক্ষু দিয়ে তাকে প্রত্যক্ষ করতে পারি না। ক্ষয় ও পূরণ প্রকৃতির নিয়ম। সেই নিয়ম অনুসারে আমাদের নিত্য জন্ম ও মৃত্যু হচ্ছে। এই জীবন প্রবাহের ভিতর দিয়ে আমরা চলেছি বলে আত্মার অমরত্বকে টের পাই না। এজন্য যে পর্যবেক্ষণ, উপলব্ধির প্রয়োজন ভারতের ঋষিরা যুগ-যুগান্তের সাধনায় তার সত্য স্বরূপকে অনুধ্যান করেছেন।

মার্গারেটের ভাবরাজ্যে এক আলোড়ন সৃষ্টি হল। বুকের মধ্যে কেমন একটা উথলে ওঠার ভাব হল। চোখের তারায় তার অর্ন্তভেদী নিবিড়তা। সন্ন্যাসীর ভাষায় কত সুধা, কী তার বলবতী ধারা, কী তীব্র তার বেগ, কত ভয়ঙ্করকে সে আঘাত করতে পারে নীরবে নিঃশব্দে। সেই জানার প্রথম অভিজ্ঞতা হল লেডি ইসাবেল মার্জসনের বাড়িতে সন্ন্যাসীর দীপ্ত ভাষণে। সন্ন্যাসীর মুখ নিঃসৃত বাক্য ও বাণীর এধরণের উপলব্ধি আগে বিবৃত হয়নি কারো বক্তৃতায়। অনেক কথাই তাদের বিধৃত হয়নি আচরণের আন্তরিকতায়। বিশ্বাস ও সত্যের দ্বন্দ্ব ও সংশয়ের গভীরে ডুবে শ্রোতারা কে কত নিঃশব্দ আর্তনাদে মাথা কোটে কেউ তা উপলব্ধি করেনি। সন্ন্যাসীর বাক্যে ও আন্তরিকতায় তারা প্রথম জানল জীবনের বাস্তব কী আশ্চর্য অলৌকিক! স্থান কালের ও পরিস্থিতির এই মুহূর্তে মার্গারেটও নিয়তির এক অমোঘ সঙ্কেতে নতুনরূপে আর্বিভূত হয়। অনেককালের বিশ্বাসের দুর্গে, প্রত্যয়ের প্রাচীরগাত্রে, সন্ন্যাসীর বজ্রগম্ভীর বাক্য প্রতিধ্বনিত হতে হতে তার অন্তঃকরণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল নতুন এক সত্যানুভূতি।

স্বপ্নের ভেতর মগ্ন হয়ে বসে রইল মার্গারেট ওয়েস্টএণ্ডের বৈঠকখানায় উপবিষ্ট শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে। স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখ দুটো আপাদমস্তক গেরুয়া বসনে আবৃত সন্ন্যাসীর দৃপ্ত উজ্জ্বল মুখমণ্ডলের ওপর স্থির হয়ে রইল। সন্ন্যাসীর মুখ নিঃসৃত সংস্কৃত শ্লোকের আবৃত্তি বাঁশির সুরের মত মন্দ্রিত হতে লাগল তার কানের পর্দায়। কী মিষ্টি, কী মধুর সেই স্বর। খৃষ্ট্রীয় ধর্ম বিশ্বাসী মার্গারেটের কানে তা গির্জায় প্রচলিত গ্রেগরির সুরে প্রার্থনার মত বোধ হতে লাগল। দূরাগত ঐ প্রার্থনা সঙ্গীতের অর্থ সে জানে না। কিন্তু তার চেতনার ভেতর, সমস্ত সত্তার ভেতর ভাবের ঐশ্বর্য, ভাষার মাধুর্য, ঈশ্বরের অনন্ত মহিমার অস্তিত্ব অনুভব করে যা গ্রেগরির সুর ও শব্দের ঝঙ্কার থেকে আলাদা।

মুহূর্তে, একটা মহৎ উদার পবিত্র অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল মার্গারেটের সমস্ত চেতনা। আর তীব্র একটা আবেগে তার অন্তরটা যেন বিরাট আদিত্যবর্ণ এক অখণ্ড জ্যোর্তিময় সত্তার কাছে লুটিয়ে পড়তে চাইল। কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক আশ্চর্য অনুভূতিতে তার সারা শরীর কেমন অবশ হয়ে এল।

হঠাৎই তার মনে হল, জীবনে এই প্রথম এবং হয় তো শেষ একজন শুদ্ধ ভক্তি ও জ্বলন্ত বিশ্বাসের দৈবী পুরুষের সান্নিধ্য পেল। নিজের মনের ভেতর ডুব দিয়ে কেমন উৎসুক স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে তার দিকে তাকিয়ে ঈশ্বর বিশ্বাসী মনটা নিঃশব্দে নিরুচ্চারে বলল ঃ সাতসমুদ্র তের নদী পার হয়ে তুমি কে এলে? তুমি কি সেই মানুষ গোটা ইউরোপের মানুষকে ভারতের সেবায় আহ্বান করছ।

মার্গারেটের সমস্ত মর্মের ভেতর মধুর একটা আবেশ ছড়িয়ে পড়ল। চোখ দুটো বন্ধ করে পূজারিণীর মত স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। একটা প্রশ্নও করল না সে। বক্তৃতা শেষ হলে স্বামীজির দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারল না। ভেতরটা তার উদ্বেগ আর আকাঙক্ষার দ্বন্দ্বে ঝড়ের মুখে একটা ছোট্ট বিপন্ন পাতার মত কাঁপছিল। এত অল্প সময়ে তাঁর ভাবনার পৃথিবীটা বদলে গেল কী করে— এই জিজ্ঞাসায় আর্ত মনটা এই প্রথম নিজেকে পরাজিত ভাবল। সেজন্য তার্কিক মনেতে তার কোনো কষ্ট নেই। বরং এমন এক অনাবিল সুখে মনটা প্রসন্ন ছিল যে বারংবার মনে হতে লাগল এই হেরে যাওয়াটা তাকে অনেক বড় করে দিয়েছে। বোধ হয় এই হারতেই এসেছিল আজ। কে জানে, হয়তো এই হেরে যাওয়াটাই তার সবেচেয়ে বড় জেতা হল। এমন করে এর আগে তো ভাবেনি মার্গারেট। এখনই মনে হচ্ছে যা ও জানত আজ অবধি তা ঠিক নয়। শুধু এ জানাই নয়, কারো কোনো জানাই বোধ হয় অভ্রান্ত বলে দাবি করা যথার্থ নয়। আজ যেটা নিশ্চিত সত্য বলে মনে হচ্ছে, কালই সেটা চরম ভ্রান্তি বলে মেনে নিতে হয়। তার জীবনে এমন ঘটনা বেশ কয়েকবারই হয়েছে। কিন্তু আজকের অভিজ্ঞতা একেবারে আলাদা।

মন আলো করা মুগ্ধতা নিয়ে মার্গারেট লেডি মার্জসনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সময় স্বামীজির দিকে তাকাতে গিয়ে চোখের পাতা কেঁপে গেল, মুখের ভাবও পাল্টে গেল। বিব্রত লজ্জায় মুখ আপেলের মত রক্তিম হল।

বাড়ি ফিরে সে রাতে ঘুমুতে পারল না মার্গারেট। এপাশ ওপাশ করছিল বিছানায়। ঘরে টিম টিম করেএকটা আলো জ্বলছিল। মার্গারেট নিষ্প্রভ আলোর ওপর চোখ রেখে সারাক্ষণ জেগে রইল। লেপের মধ্যে গুটিসুটি হয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকতে ভাল লাগছিল। লেডি ইসাবেল মার্জসনের ওয়েস্টএন্ডর বাড়ির বৈঠকখানার অভিজ্ঞতা চেপে রেখে সুস্থ থাকা তার মুশকিল হচ্ছিল। শুয়ে শুয়ে নিজেকেই প্রশ্ন করল, এখন তার মনে কোন অবস্থা চলেছে? সুখের, না দুঃখের? বোধ হয়, এর কোনোটাই নয়। অন্যধরণের এক অনাস্বাদিত অনুভূতি। মনের এ অবস্থাকে কী বলে? মার্গারেট জানে না। নিষেধের তর্জনী

তুলে মন তাকে শাসাচ্ছে যেন। অনেক কথা মনে পড়ে একে একে। ওর ভেতর এক সাবধানী নারী অতীতকে তার সামনে হাজির করল। আর সে একটার পর একটা সেই সব ঘটনার ভেতর প্রবেশ করতে লাগল।

জীবনটা মার্গারেটের সংগ্রামের। শৈশব থেকে শুরু হয়েছে সেই সংগ্রাম। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অন্ধকার গর্ভে না বুঝেই তাকে ঝাঁপ দিতে হয়েছে। তারপর চলার বেগে পায়ের তলায় রাস্তা জেগে ওঠেছে। তার এই আঠাশ বছরের জীবন পর্যন্ত এইভাবেই চলে আসছে। এই রীতির কোনো পরিবর্তন হয়নি। জীবনের অনিশ্চয়তাকে বরণ করার জন্য মন প্রস্তুত থাকে। একটুও ভয় কিংবা সংশয় নেই তার মধ্যে। কোনো দুর্বলতাকেও সে প্রশ্রয় দেয়নি। যখনই বিপরীত ভাবনা মনে হয়েছে ভ্রূকুটি করেছে নিজেকে।

অতীতের বিলীন হয়ে যাওয়া ঘটনার ভিতর থেকে তার আঠারো বছরের শরীরটা ফুটে ওঠল। স্কুলে পড়া শেষ হয়েছে সবে। সংসারে অর্থের হাহাকার। মার্গারেট উপার্জনের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষায়ত্রী পদে দরখাস্ত করল। অল্পদিনের মধ্যে তার জবাবও এল।

সময়টা ১৮৮৪ সালের এক গ্রীষ্মের অপরাহ্ন। কেসউইকের নামজাদা স্কুলে চাকরী পেল। সে দিনের আবেগ, উচ্ছ্বাস, আনন্দ ভুলবার নয়। বাড়ীতে খুসির হাওয়া বইছিল। পরিবারের ভাই-বোন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাই খুব খুশি। ছোট ছোট উপহার দিয়ে তাকে অভিনন্দনও জানাল। অভিন্দনের সামগ্রীগুলি ছিল তার নিত্যপ্রয়োজনের। একটা চাকরী পেলে মানুষ এত খুশি হয় জানা ছিল না। জীবনের রূপ, রঙ, স্বাদ সব কিছু বদলে গেল একমুহূর্তে।

শতাব্দীর সাক্ষী সব প্রাচীন গাছপালায় ভরা, পাহাড় আর হ্রদের পটভূমিতে ছবির মত সাজানো গোছানো কেসউইকের বোডিং স্কুল। সেকেলের ধরণের মস্তবড় থাম, বড় দালান, বিশাল ঘর, মনোরম পরিবেশ তাকে চকিতে বিহ্বল করে দিয়েছিল। অফুরন্ত প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা শিশুদের সারল্য, অকপট সহজ ব্যবহার আভিভূত করল তাকে। জীবনটা ধন্য হয়ে গেল।

উচ্চশিক্ষা করার প্রবল বাসনা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে সংসারের প্রয়োজনে আঠার বছর বয়সে চাকরী নেয়ার জন্য মনে একটা কষ্ট ছিল তার। কিন্তু শিক্ষয়িত্রীর দায়িত্ব পেয়ে সব বেদনা যন্ত্রণা ভুলে গেল। কাজটাকে বড় আপন করে নিল। অল্প কর ক'দিনের মধ্যে ছোট ছোট ছাত্র-ছাত্রী তার প্রিয় হয়ে ওঠল। কর্তৃপক্ষ ছোটদের কাছ থেকে সরিয়ে এনে চোদ্দপনেরো বছরের মেয়েদের সাহিত্য আর ইতিহাস পড়ানোর দায়িত্ব দিল তাকে। প্রথমটা ঘাবড়ে গিয়েছিল। কিন্তু অদম্য আত্মশক্তির জোরে সামলে নিল পরিবর্তিত অবস্থাকে। নিজের স্বতস্ফূর্ত, প্রাণচাঞ্চল্যভাবটি ছাত্রীদের মনে সঞ্চারিত করে দিয়ে পুনরায়

জনপ্রিয় হয়ে ওঠল। মনের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে যে তাদের আবিষ্কার করে, সন্ধানী চোখ মেলে লক্ষ্য করে তাদের মনোভাব। ছাত্রীদের ধরাবাঁধা ছকে পড়ানো নয় গ্রহণক্ষমতার উপর নজর রেখেই বিষয়কে সহজবোধ্য করে তাদের মনের মত করে মর্মের মধ্যে গেঁথে দেয়ার পদ্ধতি তাকেও একজন ছাত্রী করে তুলল। শিক্ষিকা জীবনে মার্গারেটের অসামান্য সাফল্য এবং ছাত্রীদের সঙ্গে বন্ধুর মত মিশে যাওয়ার এক আশ্চর্য ক্ষমতা তাকে সবার প্রিয় করে তুলল।

বাড়ির চাইতে কেসউইকের চারপাশে যে পাহাড়, জঙ্গল, নির্জনতা আছে তাকে ভীষণ ভাল লাগে মার্গারেটের। সময় পেলেই পাহাড় ঘুরে ঘুরে জঙ্গল দেখে। জীবনের অনেক কিছু গভীর করে অনুভব করে। মানুষের জীবনটা বাঘবন্দী খেলায় ছক কাটা ঘর যেন। মনের চোখকে কোচওয়ানের ঘোড়ার মত ঢেকে বেখে সারাপথ ছোটায়। সামনেটুকু ছাড়া আশপাশ দেখতে পায় না। দেখার দরকার হয় না। কাজের যাঁতায় মানুষও কলুর বলদের মত নিজের গণ্ডীর মধ্যে সারাক্ষণ ঘুরে মরছে। এর বাইরের পৃথিবীটা চোখ খুলে দেখা হল না তার। বেশি ভাল মানুষরে কাছে জীবনটা বন্দীদশা। এই পাহাড়তলির বনে বনান্তরে, প্রান্তরে উপত্যকায় এত মুক্তির শ্বাস যে, প্রাণটা ব্যাকুল হয়। এর কারণ বোধ হয়, জীবনের আসল মানেটা মুক্তি।

প্রিয় বিদ্যালয়, অন্তরঙ্গ ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে একাত্ম হয়ে থেকেও সর্বক্ষণ মনে হয় অতলাপ্ত মনের মধ্যে হাতছানি দিয়ে কে যেন ডাকছে নিরন্তর। ধ্যান মৌন পাহাড় চূড়া, কিংবা প্রাচীন বৃক্ষগুলি অনন্তকাল ধরে কারো প্রতীক্ষা করছে। ওদের মধ্যে চুপ করে বসে থাকতে থাকতে মনে হয় এই পৃথিবীতে গাছেরাই সুখী। ওদের কোনো ঘর সংসার নেই, পরনিন্দা, পরচর্চা, নেই। পার্থিব কামনা নেই। উর্ধ্ব আকাশের দিকে তাকিয়ে অনন্তের প্রার্থনায় সর্বক্ষণ নিমগ্ন। ওদের বাইরে এই রুক্ষ্ম আচরণ আত্মিক সৌন্দর্যে সুন্দর। ফুল, ফল,পাতা, কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা দিয়ে এ পৃথিবীর পরিচর্যা করছে। কিন্তু সেজন্য অনন্তের কাছে আত্মনিবেদনে কোন ব্যাঘাত হচ্ছে না।

কেসউইকের এই পরিবেশে তার দিন কাটতে লাগল। এখানে দেখবার অনেক কিছু আছে। বর্ণ, গন্ধ, রূপের সমারোহ তার দেখার চোখকে প্রতিদিনই তৈরি করে। নতুন নতুন অনুভূতি সৃষ্টি হয়। তবু প্রশ্নটা মার্গারেট ছাড়ল না। কখনো অর্ধরাত্রে ওঠে বোর্ডিংর বারন্দায় দাঁড়িয়ে চুপ করে থাকে। নিজের অজান্তে পরিচিত লোকদের কথা ভাবে। মা, মেরী, রিচমণ্ড ওরা সবাই ওদের অবস্থায় সন্তুষ্ট। কিন্তু ওদের মত সে হতে পারছে না কেন! একজন অতি সাধারণ মানুষের যা যা চাওয়া থাকে, আঠারো বছরে সে তো সবই পেয়েছেন। তবু তার ভেতর এ কিসের দীনতা? এক অদ্ভুত ধরণের শূন্যতায় মন ছেয়ে

থাকে। কিছুতে যায় না কেন? ঐ পাহাড়, বড় বড় গাছগুলোর দিকে তাকালে শুধুই মনে হয় সে যা করতে এসেছিল তা করা হল না। সকলকে যে কথা প্রাণভরে বলতে চাইল, তাও গুছিয়ে বলা হল না। মনে মনে যা চায় তাকেও পাওয়া হল না। এই অনির্দ্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষা এবং চির অতৃপ্তির কোনো নাম নেই। কারণ এটা বোধ হয় খুব স্বাভাবিক কিংবা সুলভ বস্তু নয়। এ যেন সুখে থেকেও অসুখী হওয়া। এই অবুঝ, অশান্ত মনটা নিয়ে কী যে করে-মার্গারেট ভেবে পায় না। শুধুই মনে হয় আকাশ ভরা তারার মাঝে আমার তার কৈ? এই চির জিজ্ঞাসায় মনটা অস্থির হয়ে থাকে।

মার্গারেট প্রতিদিন অনুভব করে একটা নতুন উপলব্ধি তার ভেতরটা বদলে দিচ্ছিল। কেসউইকে এসে সবচাইতে বদলে গেল তার আধ্যাত্মিক ধ্যান ধারণাগুলো। বিশ্বপ্রকৃতির নির্মল নির্জনতা বয়ে আনল এক অনন্ত পরিতৃপ্তি। এই প্রথম অনুভব করল, চির অতৃপ্তির মাঝখানে অমৃতের পাত্র হাতে করে প্রকৃতি অচঞ্চল চেয়ে আছে তার দিকে। মার্গারেট ঝরণার ঝর ঝর শব্দে, ঝিঁ-ঝিঁর ডাকে শুনতে পায় তার আহ্বান। সিলভার ফারের পাতার ভিতর দিয়ে সোঁ সোঁ করে বয়ে যাওয়া বাতাস অরণ্যের মায়াবী ডাকের মত নিরন্তর আহ্বান করে তাকে—তুমি এস, হৃদে এস। হৃদিবল্লভ হৃদয়েশ।

এখানকার নীরবতা নির্জনতার মধ্যে এমন একটা আধ্যাত্মিক পরিবেশ ছিল যে মার্গারেটের সমস্ত মনটা ঈশ্বরের পাদপদ্মে সমর্পণের জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকত। যতদিন যায় এই অনুভূতি নিয়ে স্থির থাকা তার মুস্কিল হল। ধর্মপিপাসা প্রবল হল। ধর্মপ্রাণ খৃষ্টান যাজক পরিবারের মেয়ে শুধু নয় মার্গারেট, পড়াশুনা ও ক্যাথলিক চালিত স্কুলের কড়া শাসনের অধীনে করতে হয়েছিল। সুতরাং ধর্ম সম্পর্কে গভীর ভাবানুভূতি একেবারে শৈশব থেকেই তার মনের মধ্যে ছিল। বিশ্বাসগুলিকে সে এতকাল ধর্মীয় যন্ত্রের মত মেনে এসেছিল। কেসউইকে অনুকূল আধ্যাত্মিক আবহাওয়ায় ধর্ম সম্পর্কে এক নতুন বোধ সঞ্চার করল। এখনকার মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করল মানুষের জীবনে আসল মানেটা মুক্তি। মানুষের ধর্মও হবে উদার, মুক্ত এবং বিশ্বব্যাপী। কোথাও কোনো বন্ধন থাকবে না তার। ছোট বড় ভেদ থাকবে না। সঙ্কীর্ণতা থাকবে না। ধর্ম মানে অস্বাভাবিক কিছু নয়। এটি মানব জীবনের স্বাভাবিক একটা পথ। মানুষের একমাত্র পাথেয়। তার অবলম্বন এবং আশ্রয়ও বটে। তাই ফুলের সমারোহে, ধূপ ও দীপের আলো ও গন্ধে ভরা চার্চের বেদির কাছে বসে উপাসনার সময় মার্গারেট মুক্ত প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে। প্রার্থনার সঙ্গীতে প্রার্থনাগৃহ মুখর হয় যখন, মনে হয় দেওয়ালে অলঙ্কৃত সাধু সন্তেরা ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আর ও স্পষ্ট তাঁদের দেখতে পাচ্ছে। তাঁরা কথা বলছে আর ও

পরিস্কার শুনতে পাচ্ছে ঃ যে ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা মানুষকে স্বর্গের ছবি দেখায়, তার চারপাশ সৌরভে ভরে দেয় তারই নাম ধর্ম। কিন্তু সেই ধর্মকে খৃষ্টান ধর্ম-যাজকেরা একটা বদ্ধ ঘরে আটকে রেখেছে। এমন বিশ্রী ব্যাপারটা না ঘটলে মানুষের জীবনটা পবিত্র থাকত। মানুষ ধর্মে সুন্দর হত। মার্গারেটের মনে হল কেসউইকের মুক্ত প্রকৃতিতে সে খোলা বাতাসে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিল। সারাজীবনের বিশ্বাসটা ভেঙ্গে চূর্ণ চূর্ণ হল। তবু কী আশ্চর্য সে জন্য একটুও যন্ত্রণা নেই। বিশ্বাসের বীণার তারে অসঙ্গত বেসুরা কিছু বাজল না।

তার এই অনুভবের কথা মাকে লিখে জানাল।—মা গো কেসউইকের চারপাশটা এত মুক্ত, বিস্তৃত এবং বিশাল যে নিজেকে তার মধ্যে বড় দীন মনে হয়। এখানকার নির্জনতা, নীরবতার মধ্যে ডুবে গিয়ে নিজেকে অনুভব করি, তন্ন তন্ন করে আমার আত্মাকে খুঁজি। অনেক কিছুই গভীর করে বুকের মধ্যে টের পাই। আমার ধর্মীয় বিশ্বাসগুলো কোনোদিন তোমাদের মত ছিল না, একটু অন্যরকম ছিল বলেই মা মেয়ের মন কষাকষি লেগেই থাকত। তুমি বলতে বাপ-সোহাগী মেয়ে বাপের কাছ থেকে জীবন কাটানোর যথেষ্ট ধর্মশিক্ষা পায়নি। তাই সব ব্যাপারে অসহিষ্ণু। হাঁ, চিরদিন আমি একটু বেশি স্বাধীন। নিজের মত চলতে ভালবাসি। আমার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে কখনো আপোষ করিনি বলে তোমাদের কাছে থেকেও বন্দী প্রাণটা পালাই পালাই করত। হ্যালিফাক্স স্কুলে পড়ার সময়ও এরকম অশান্তি আর অতৃপ্তিতে আমি কষ্ট পেতাম। ধর্মের সঙকীর্ণতা, অনুদারতা আমার ভালো লাগত না। নিজেকে বড় ছোট মনে হত। কেসউইকে আমার মনের দিগন্ত প্রসারিত হয়ে গেল। আমি এক অন্য মানুষ হয়ে গেলাম। আজ আমার বড় আনন্দের দিন। আমার নব বোধোদয় হল। পুঁথিগত ধর্মের ওপর আমার আর শ্রদ্ধা নেই। মানুষ পুঁথির চেয়ে বড়। এখানকার মুক্ত প্রকৃতি আমাকে চেনাল মানুষের হৃদয়ের গভীরে গুহায়িত একটা মন আছে, কেবল সেখানেই কান পেতে সত্যের প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

মা, ঈশ্বর আমাকে অন্য ধাতু দিয়ে গড়েছেন। এখানেও অন্যের সঙ্গে আমার খাপ খায় না। এটা বোধ হয় আমার স্বভাবের দোষ। বাপ-সোহাগী মেয়ে বাপের প্রশ্রয়ে মিথ্যেকে মিথ্যে বলতে শিখেছে। ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে আমার মনোভাব অনমনীয়, সমবেদনা শূন্য। একটু এদিক ওদিক হলেই আমি কড়া কড়া কথা বলি। তাতে আমার নিজেরও একটা আলাদা ভাবমূর্তি তৈরি হয়। সেটা হচ্ছে আমি অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করি না। কেসউইকে এক শ্মশান বৈরাগ্য আমাকে অভিভূত করেছে। মানুষের দুঃখ, কষ্ট যন্ত্রণা, ধর্মের ভণ্ডামি এ সব দেখলে ভেতরটা রাগে যেমন জ্বলে ওঠে, তেমনি চোখ জ্বালা করে জল আসে। আমার

মনটা আর্ত মানুষের জন্য করুণায় কাতর হয়েছে। কেসউইক ছেড়ে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ করে দেখব আমার এই আত্মোৎসর্গের অনুভূতি এবং নব ধর্মবোধ কতখানি সত্য। কেসউইক আমার জীবনের একটা মালষ্টোন। এখানকার মাটিতে শ্বাস নিয়ে মুক্তি কী অনুভব করলাম। কেসউইক আমাকে শিখিয়েছে অন্তর যতই বিকশিত হবে, মাধুরীতে যতই ভরে ওঠবে, ততই অন্তরের পিপাসা হবে অতর্পণ। এই বোধে আমি আর স্থির থাকতে পারছি না। ঘরে ফেরার মনটাই আমার মরে গেছে। রাগবির অনাথ-আশ্রম আমাকে ডাকছে। দু'চারদিনের মধ্যে চলে যাব—

চিঠিটা ঠিক এই বয়ানে লেখা হয়েছিল কিনা মার্গারেটের মনে নেই। কিন্তু মূল ভাবটা ছিল এরকমই। মনের সঠিক ঠিকানাটা খুঁজে পেতে রাগবির অনাথ আশ্রমে বিশ-বাইশজন অনাথ বালিকাকে মানুষ করে তোলার দায়িত্ব নিল। ওদের আশা-আকাঙক্ষা ছিল খুব সামান্য। ভবিষ্যতে ভাল গেরস্তের ঘরে চাকরানীর কাজ করে নিজেরটা নিজে চালাতে পারে' তার উপযুক্ত করে তোলা। তাদের সমতলে নেমে এসে মার্গারেট সব কাজে শুধু অভ্যস্ত করল না, সেই সঙ্গে তাদের আত্মবিকাশের জন্য ধর্ম শিক্ষাও দিল। যথার্থ খৃষ্টানের আদর্শ হল সেবা। পরের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার সুখ ও আনন্দ আলাদা। সেবায় ঈশ্বর লাভ হয়। মানুষের মুক্তি শুধু এই সেবাতেই। তবু এক বছর যেতে না যেতেই ঐ কাজ ছেড়ে দিয়ে শিক্ষয়িত্রী হয়ে নর্থওয়েলসের রেক্সহ্যামের কয়লাখনি অঞ্চলের একটি সেকেণ্ডারী স্কুলে যোগ দিল। তখন তার বয়স মোটে একুশ।

রেক্সহ্যামের কথাটা মনে হতেই ওয়েলসের তরুণ ইঞ্জিনিয়ারের মুখখানি চোখের তারায় ভেসে ওঠল। সাত বছর আগের কথা একটু ঝাপ্সা হয়নি তার স্মৃতি। রেক্সহ্যামের সেন্ট মার্কস চার্চের চত্বরে তাদের প্রথম আলাপ হয়। রোজ রবিবারে ইঞ্জিনিয়ারও চার্চে-প্রার্থনা করতে আসে। অফুরন্ত প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ইঞ্জিনিয়ারের কৌতূহলী চোখ দুটি প্রার্থনা গৃহে মার্গারেটকে খোঁজে। অনেকেই তা লক্ষ্য করে। চার্চ থেকে ইঞ্জিনিয়ার রোজ বেরিয়ে তার পিছু নেয়। বেশ একটু দূরত্ব রেখে সাবধানে অনুসরণ করে তাকে। মার্গারেটও সভায় লক্ষ্য করেছে তরুণটির অপ্রতিভ চাহনি। তার নীরব বিস্ময় যেন কিছু কথা বলে। আলোয় ধোয়া তার শুভ্র মুখখানির পবিত্রতা চুম্বকের মত তাকেও টানে। এই আকর্ষণের মধ্যে তারুণ্যের নেশা আছে। রামধনুর রঙ আছে। এই পৃথিবীতে অন্তত একজন পুরুষ আছে যার চোখে সে রমনীরত্ন হয়ে আছে। তাকে দেখে সুখী হয়, তৃপ্তি পায় এবং সঙ্গ কামনা করে। এসব ভাবলে এক আশ্চর্য পুলকে তার সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়। এক নতুন অনুভূতি হয়। এই

অনাস্বাদিত অনুভূতির নাম জানে না সে। নিরিবিলিতে একা একা তার কথা ভাবলে বুকটা উথাল-পাথাল করে। কে জানে, কী আছে ওই ভাবনার ভেতর। তবু ভাবতে ভাল লাগে পুরুষকে জয় করার জন্য আর পাঁচটা রমণীর মত তাকে কসরৎ করতে হয়নি, বরং ঐ তরুণই আকৃষ্ট হয়ে তার কাছে ধরা দিতে চায়। শুধু তার ডাক শোনার অপেক্ষায় আছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মার্গারেট নিজেকে খুঁটিয়ে দেখে মুচকি হাসে। নিজের মনেই নিরুচ্চারে বলে, কত উদ্ভট চিন্তাই না আসে মাথায়। তারপর আয়নার দিকে তাকিয়ে সকৌতুকে বলল ঃ ওকে আমার পছন্দ হয়নি। একটুও না। অপছন্দ হলে যেমন মাথা নাড়ে তেমন করে মাথা নাড়তে লাগল।

স্কুল থেকে বেরিয়ে চার্চের পথে যেতে যেতে হঠাৎ কার পায়ের আওয়াজ পেয়ে চমকে পেছনে তাকাল মার্গারেট। সেই তরুণকে দেখে বেশ একটু বিরক্ত হল। বুকের মধ্যে একটা দুরু দুরু শব্দ হতে লাগল। তার সলজ্জ লাবন্যমাখা মুখে নিষ্পাপ সরলতা মাথার চুল দু'পাশে পাট করা, মাঝখানে সিঁথি, স্বপ্নালু চোখ দুটিতে বিভোল বিহ্বলতা। অধরে নির্ভয় হাসি। মার্গারেট ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইল। তরুণটি তার কাছে কী যে চায়, বুঝতে পারে না। তবে কিছু যে একটা বলতে চায় এ তার ভূমিকা। মার্গারেট একটু সাহস সঞ্চয় করে চোখের ওপর চোখ রেখে বলল ঃ আপনি কিছু বলবেন আমাকে।

তরুণ কথা বলবে কি! একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে মার্গারেটের দিকে। ঐ সময়ে এক অলৌকিক, স্বর্গীয় সৌন্দর্য তার মুখের ভাবটাই বদলে দিল। এক দারুণ মুগ্ধ চমকে চমকে ওঠল মার্গারেট। মনের সঙ্গে কী সব জমে থাকা জিনিস হঠাৎ করে গলিয়ে দিল সেই সুন্দর অনুভূতিটা। পৃথিবীটা তার কাছে দারুণ রোমঞ্চকর হয়ে উঠল। গভীর এক অনাস্বাদিত বোধ তার বুকে যে বিশ্বাসঘাতকের মত লুকিয়ে ছিল কখনও জানেনি। হঠাৎ তার নিজের প্রশ্নটাই তার বিশ্বাস এবং নিজের সম্পর্কে ধ্যান ধারণাকে বদলে দিল।

কাছেই একটা বড় জামরুল গাছ। সবে ফুল ফুটেছে। কোনো কোনো ডালে গুটিও এসেছে। রাস্তার ধারে সেই জামরুল গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে তরুণটি সপ্রতিভ হয়ে বলল ঃ কাগজে আপনার লেখা পড়লাম। এত সুন্দর লেখেন যে মন ভরে যায়। প্রত্যেকটি লেখা চাবুকের মত। এই কথাটা বলার জন্য ক'দিন ধরে আঁকু পাঁকু করছি।

নিজের অজান্তে মার্গারেটের দু'চোখে কৃতজ্ঞতা ফুটে ওঠল। লেখার প্রশংসায় তার মুখের ভাব বদলে গেল। স্মিত হেসে বলল ঃ ধন্যবাদ। তাতেই মার্গারেট ধরা পড়ে গেল তরুণটির কাছে। তবু নিজের পরিচয় লুকোনোর জন্য বলল ঃ আপনি আমাকে চেনেন। নাম জানেন?

ঘাড় কাৎ করে তরুণটি বলল ঃ জানি। মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল'কে এ অঞ্চলের চেনে না, জানে না কে?

হাসল মার্গারেট। বলল ঃ আমার নামে কোনো লেখা কাগজে ছাপা হয় না। আপনি বোধ হয় ভুল করছেন।

দৃঢ়কণ্ঠে বলল ঃ একটুও না। ডবলিউ নীলাস, জনৈকা জরতী, অন্ত্যজ- সবই আপনার ছদ্মনাম।

মার্গারেট খিল খিল করে হাসল। বলল ঃ কী আশ্চর্য, অন্যের লেখা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে কেউ মানবে? লোকে পাগল বলবে আপনাকে?

লেখাগুলো আপনার বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠা কেন? লেখাগুলো সত্যি খুব ভালো। দুঃখী মানুষের দুরবস্থা, খনি অঞ্চলের মানুষের বাসস্থানের সমস্যা, তাদের, বেঁচে থাকার সংকট, সহায়হীন জীবনের বিবিধ অসুবিধা, মালিকপক্ষের অবহেলা, নারীর অধিকার সম্পর্কে মর্মস্পর্শী লেখাগুলো খনিশ্রমিকদের প্রমিথিউস মার্গারেটের কলম ছাড়া অন্যের কলমে বেরোবে না। এযে জীবনের সঙ্গে জীবন যোগ করার যোগফল।

মার্গারেট থমকে চেয়ে রইল তরুণের দিকে। তখন তাকে কথায় পেয়েছিল। আপনার বিভিন্ন ছদ্মনামে লেখা রচনাগুলোর আমি একজন নিয়মিত পাঠক। ঐ লেখাগুলো পড়তে পড়তে মনে হয় বড় স্বার্থপর আমি। শুধু নিজের কেরিয়ার নিয়ে ব্যস্ত। আমার চারপাশের মানুষদের জন্য একজন নাগরিক হিসেবে আমারও যে কিছু করার আছে একথাটা প্রথম মনে হল। সুস্থ সুন্দর সমাজ জীবন দায়িত্ব প্রতিটি নাগরিকের। অগণিত খনি শ্রমিকের প্রমিথিউস আলোর মশাল নিয়ে যেন বলছে চলো যাত্রা করি, প্রেমের তীর্থে, শক্তির তীর্থে।

মুগ্ধ হয়ে শুনছিল মার্গারেট। অভিভূত গলায় বলল ঃ আপনি কিন্তু সুন্দর গল্প বলতে পারেন।

আপনার 'জেনেট নাটাল হার্বালিস্ট' গল্পের এক খালাস পাওয়া আসামীর মত আমিও মনে মনে বললাম ঃ মুক্ত আমি। তার মতই এক নতুন পৃথিবীর দরজা খুলে গেল আমার সামনে। বুক ভরে শ্বাস নিলাম। তার মতই নিজের জীবন, নিজের স্বভাব গড়ে নেয়ার মতই মুক্ত আমি। তা ভাল মন্দ যাই হোক।

মার্গারেট কী বলবে ভেবে পায় না। তাকে সংযত করার জন্য বলল ঃ আমি তো মার্গারেট নোবল।

নীলাস আর মার্গারেট দুজন একই মহিলা। পত্রিকা অফিস থেকে জেনেছি, আপনার পিতামহী নীলাসের নামটি আপনার নামের বদলে ব্যবহার করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন। হয়তো তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাতে ঐ নামটি আপনার রচনায় অমর করে রেখেছেন।

দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে একফালি হাসি ফুটল মার্গারেটের অধরে। বলল ঃ বাব্বা। এত কাণ্ড করে নীলাসকে আবিষ্কার করেছেন। যাই বলুন, গোয়েন্দা হলে আপনি ভাল করতেন। চাকরীতে দ্রুত উন্নতি হত। আপনি কী করেন জানতে পারি?

আমি একজন কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। খনি অঞ্চলের একটা ল্যাবটরীতে কাজ করি। আমার অফিসের ধারে যে কুলি কামিনদের বস্তী আছে সেখানে আপনাকে রোজ দেখি। কী দরদ আর মমতা দিয়ে আপনি এই সব অবহেলিত মানুষদের একজন হয়ে ওঠেন।

কৌতুক করে মার্গারেট বলল ঃ কে কী করছে তা লক্ষ্য রাখা কী, আপনার ল্যাবটরীর কাজ!

হেসে ফেলল ইঞ্জিনিয়ার। বলল ঃ তা কেন? ছুটিটা তো আমার নিজের। আপনিও তো ছুটির পরে জনসেবা করেন। কত কী করেন তাদের জন্য। কার খাওয়া হয় না, কোন ছেলে বই কিনতে পারে না, চিকিৎসার পয়সা নেই কার? এসব খোঁজ খবর নিয়ে থাকেন রোজ। এদের সকলের জন্য লঙ্গরখানা খুলেছেন, চলমান চিকিৎসাকেন্দ্র করেছেন, গ্রন্থগার করেছেন। মনকে সুস্থ রাখতে কালচারাল ক্লাব স্থাপন করেছেন, খেলাধূলার ব্যবস্থা করেছেন; কত কি— ভাবতে বিস্ময় লাগে। একজন মহিলা হয়ে আপনি একা যা করলেন আমরা পুরুষ হয়ে তার কানাকড়ি কিছুই করতে পারি না। লজ্জা হয়, ধিক্কার দেই পৌরুষকে।

জামরুল গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে গল্প করতে মার্গারেটের ভীষণ মজা লাগছিল। তার সরলতাকে ভাল লেগে গেল। বলল ঃ এতে লজ্জা পাওয়ার কী আছে? সব কাজ তো সকলের জন্য নয়। প্রত্যেক মানুষের মন, ব্যক্তিত্ব, ভাল লাগা—আলাদা আলাদা। তবু সবাইকে নিয়ে মানুষের এই পৃথিবী। ছোটখাটো অমিল নিয়ে মন খারাপ না করে কী করে এক হয়ে আমরা সকলের কথা ভাবতে পারি তার উপায় করাটাই মানুষের মনুষ্যত্ব। আমিও আপনার মত একজন সাধারণ মেয়ে। রেক্সহ্যাম স্কুলের একজন অতিসাধারণ শিক্ষিকা।

আপনি কিন্তু মোটেই সাধারণ মেয়ে নন। রেক্সহ্যাম খনি অঞ্চলে আপনি প্রাণের সাড়া ফেলে দিয়েছেন। বাছবিছার না করে মানুষকে ভালবাসা, তার বন্ধু হওয়া এবং চার্চের নিয়ম নীতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে গরীবদের সাহায্য করা এবং তাদের জন্য উপাসনা গৃহের দরজা খুলে দেওয়া কি কম চমকপ্রদ গল্প। গির্জার কর্মকর্তাদের সঙ্গে আপনার মনোমালিন্য এবং মন কষাকষির কাহিনী আজ আর গোপন নেই। গরীব এবং চার্চে যায় না বলে একজন দুঃস্থ ব্যক্তিকে সাহায্য বঞ্চিত করা যে অপরাধ নয় এমন মুক্ত কণ্ঠে আগে কেউ বলেনি।

একজন মহিলা হয়ে আপনি যা করলেন আগে কেউ করেনি। নর্থওয়েলস, গার্ডিয়ান কাগজে চার্চের কার্যকলাপ সম্পর্কে আপনার খোলা চিঠি যে বোমা ফাটিয়েছে তা আপনাকে মহিমান্বিত করেছে। মানুষের হৃদয়ে আপনি দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন। একি কম কথা!

মার্গারেট হেসে বলল ঃ এর মধ্যে অসাধারণত্ব কিছু নেই। সত্যি আপনি কি যেন? আমার মত একজন সাধারণ মেয়ের মধ্যে আপনি কী যে দেখলেন আপনিই জানেন।

তরুণটি অবিচলিত দৃঢ়তার সঙ্গে বলল ঃ আপনার স্তুতি করছি না, যা সত্য তাই বললাম। সাধারণ মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়ে বোধ হয় একজন মানুষ কাজের গৌরবে নিজের অজান্তে অসাধারণ হয়ে যায়।

তরুণটির গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যে মার্গারেট অভিভূত হল। বেশ একটু লজ্জায় রাঙা হয়ে গেল তার মুখ। বলল ঃ প্রশংসা শুনতে সকলেরই ভাল লাগে। স্তুতি বড় খারাপ জিনিস।

কী মুস্কিল, শুধু শুধু স্তুতি করব কেন? তবে একজন মানুষের মধ্যে যা কিছু গৌরবের এবং আত্মশ্লাঘার তা যদি কিছুমাত্র তার জানা না থাকে তাহলে চলার বেগ ফুরিয়ে যায়। স্বীকৃতির অভাবে স্বপ্ন, কল্পনাগুলো মরে যায়।

মার্গারেট ভুরু কুঁচকে বলল ঃ আমি এক সামান্যা মেয়ে। আমার শক্তি কতটুকু? কী বা করতে পারি? মানুষকে দেবার ধন আমার কী আছে? সামর্থ্যও উল্লেখ করার মত কিছু নয়। আমি শুধু নিজেকেই উজার করে দিতে পারি।

তাই বা কজন পারে? দেওয়ার মনটাই বড় কথা। লোকের মনে আপনার আসন কিন্তু অনেক উঁচুতে। খুব কম দিন দেখেছি আপনাকে। কিন্তু সে দেখা ফুরোতে চায় না যেন। কয়লাখনির কুলি-কামিন শ্রমিক মজুর মানুষদের গা ভর্তি ছোপ ধরা ময়লা তেলচিটে নোংরা জামা কাপড়, ঘামের গন্ধ, নোঙরার গন্ধ মিশে এমন একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ তাদের গা থেকে বেরোয় যে পাশে দাঁড়াতেও ঘেন্না করে। পুরুষগুলো বাড়ি ফিরে আস্ফালানি করে বৌ'র ওপর। গালিগালাজ, মারধোর করে অশ্লীল কথাবার্তায় এমন এক নরক সৃষ্টি করে যে ওখানে কোনো ভদ্দরলোক যায় না। কিন্তু আপনি কেমন অম্লান বদনে ওদের একজন হয়ে স্বভাব সংশোধনের কাজ করেন। ওরা আপনাকে খাতির করে, বন্ধু ভাবে। ওদের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া মানুষের আত্মা প্রাণের পরশ পেয়ে জেগে ওঠে। নিজেকে ওরা নতুন করে আবিষ্কার করে। ওরা ঈশ্বরকে দেখিনি, আপনার মধ্যে ঈশ্বর দেখে। স্বর্গ থেকে যীশুখৃষ্টের করুণা নিয়ে আপনি ওদের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছেন যেন। পথে ঘাটে, অফিসে কারখানায় শুধু মেম দিদিমণির কথা।

আপনাকে নিয়ে কত অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প। শ্রদ্ধার মাথায় হেঁট হয়ে আসে। অবাক হয়ে ভাবি এযুগে এমন আশ্চর্য মানুষ হয়! মানুষকে ভালবাসার মন্ত্র শিখলাম আপনার কাছে। খুব ইচ্ছে হয় আপনার কাজের শরীক হয়ে যেতে। নেবেন আপনার সহযোগী করে। আর কিছু না পারি, লোকের দোরে ঘুরে ঘুরে চাঁদা তোলার কাজটা তো করতে পারি।

এমন একটা অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব শোনার জন্য মার্গারেট একটুও তৈরি ছিল না। ইঞ্জিনিয়ার কথার প্রত্যুত্তরে হাঁ-না কিছু বলল না। নির্নিমেষে তার দিকে চেয়ে রইল। মনের ওপর একটা ঢেউ আছড়ে পড়ল যেন।

সাতবছর পরে মার্গারেট গভীর করে অনুভব করল সেই চুপ করে থাকার মুহূর্তটি ছিল তাদের পুরোপুরি সমাহিত হয়ে প্রেম নিবেদনের এক আশ্চর্য মুহূর্ত। প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়ের যে যোগাযোগ তা মুহূর্তের মধ্যে ঘটে। বিদ্যুৎ চমকের মত হঠাৎ হৃদয়ে হৃদয় বাঁধা পড়ে। ইঞ্জিনিয়ারের কণ্ঠস্বর শুনে সেই প্রথম দিনেই ভীষণ চমকে ওঠেছিল সে। আজও আবার তেমনই চমকে ওঠল মার্গারেট। স্বরের মত এমন ক্ষুরধার অস্ত্র বুঝি আর নেই। এমন নিপুণভাবে চকিতে হৃদয় বিদীর্ণ করতে আর কোনো অস্ত্রই পারে না। যৌবনের গলার স্বরে, কী আছে, কে জানে? ইঞ্জিনিয়ারের গলার স্বর শুনেই তেমনি ভালো লেগে গেল। ভালোবাসল।

একুশ বছরের মার্গারেট তেইশ বছরের তরুণ ইঞ্জিনিয়ারের মধ্যে তার স্বপ্নের মানুষকে খুঁজে পেল। এমনি একটা মানুষকে সে খুঁজছিল। কিন্তু বাস্তবের মাটিতে সত্যিই তার সঙ্গে দেখা হবে ভাবেনি কোনোকালে। সে আর একা নয়, তার সঙ্গী হল, প্রায় সমবয়সী তরুণ ইঞ্জিনিয়ার। ওরা দু'জন একসঙ্গে রেক্সহ্যামের নানা অঞ্চল ঘুরে বেড়াল। মিশল বহু মানুষের সঙ্গে। দেখল এক বৃহত্তর জগৎ। রুচি, আশা, আকাঙ্ক্ষা সবই দুজনের একরকমের। দু'জনের মনে একই সঙ্গে অনুরাগ জাগল। কিন্তু কেউ কাউকে প্রকাশ করল না। তাই দেখা হলে শুধু কাজের কথা হয়। কাজ কাজ করে পাগল। কী করলে জনসেবামূলক কাজে মার্গারেট সফল হবে,তার নাম যশ এবং খ্যাতি হবে শুধু তার হিসেবই করে। তাকে বোঝানোর জন্য ইঞ্জিনিয়ার বলে নিঃস্বার্থ সেবা ও আত্মদানে তুমি তৃপ্তি পেতে পার, কিন্তু লোকের কাছে তার কানাকড়ি দাম নেই। মানুষের কাজে লাগার জন্য চাই অর্থ। কিন্তু সে অর্থ কোথা থেকে আসবে, ভেবেছ। অর্থ-দেবার-মানুষ নেই। তবু আমাদের তা যোগাড় করতে হবে। লোকের দরজায় দরজায় কাঙালের মত হাত পেতে আমাদের দান নিতে হবে। তার জন্য চাঁদা তুলতে হবে। কাজ করে লোককে দেখাতে হবে তার দান বৃথা নষ্ট হয়নি।

মার্গারেট চুপ করে ছিল। যেন সমাধিস্থ ছিল তার ভিতরে। ইঞ্জিনিয়ার তার স্বপ্নের, তার কবিতার। তার কাছে অনেক চাওয়া তার। মেয়ে বলেই নিজেকে নিবেদন করার জন্য ভেতরটা কাঙাল হয়ে আছে। ইঞ্জিনিয়ারের বোধ হয় চোখ নেই। এসব হয়তো সে দেখতে পায় না। অথচ খুব ইচ্ছে করে নীল আকাশের নিচে সবুজ ঘাসের ওপর দেহটা এলিয়ে দিয়ে তার কোলে মাথা রেখে একটা লম্বা ঘুম দেয়। তাতেই শান্তি তার। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার সে কথাটা বুঝল না বলে মাঝে মাঝে অসহিষ্ণু হয়ে বলে ঃ কে বলেছিল তোমাকে আমার বোঝা বইতে? বেশ তো ছিলাম, তুমি আমায় ডাকলে কেন কাজের নিমন্ত্রণে।

ইঞ্জিনিয়ার চকিত বিস্ময়ে চেয়েছিল অতল সমুদ্রের মত তার গভীর নীল দুই চোখের দিকে। তারপর ওর হাতখানা নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে টেনে নিয়ে চেয়ে রইল। মুগ্ধতা যে মানুষের চোখকে একটা বিশেষ দৃষ্টি দেয় মার্গারেট তাকে অনুভব করল। কোনো এক অজানা আশঙ্কার ভয়ে ইঞ্জিনিয়ারের ভেতরটা যে কাঁপছিল মার্গারেট তার মুঠোর মধ্যে ধরা হাতের কাঁপুনিতে টের পেল। মুখে ওরা কেউ কিছু বলতে পারিছিল না। কিছুক্ষণ পরে ইঞ্জিনিয়ার মৃদুস্বরে বলল ঃ এই ক্ষণটুকু হোক চিরকাল।

কথাটা শুনে মনটা কানায় কানায় ভরে গেল মার্গারেটের। মনের ময়ূর নাচছিল। তাব হৃদয় অঙ্গনে। সেই প্রথম প্রেমের কল্লোল শুনল মার্গারেট। অনির্বচনীয় আনন্দের সে বিদ্যুৎ সাতবছর পরে এক মুহূর্তের জন্য ছুঁয়ে গেল। একটা অদ্ভুত অনুভূতির ঢেউ খেলে গেল। আর সে ১৮৮৯ সালে ফিরে গেল। সেদিনের সব দৃশ্য ও ঘটনা তেমনি প্রত্যক্ষ এবং সত্য হয়ে ওঠল তার অনুভূতিতে। প্রেমের আলোয় তার ভেতরটা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠল। মনের কোণে কোণে অন্ধকার গলিতে আলো জ্বলে ওঠল। বেশ কিছুক্ষণ থম ধরা বিষণ্নতা নিয়ে কাটল। আশ্চর্য লাগল বিধাতা এমন করে নিষ্ঠুরে মত তাদের মৃত্যুহীন প্রেমকে বিফল করে দিল কেন? কী দোষ করেছিল তাঁর কাছে? বাল্য থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে ধর্মাচরণ করেছে। দু'বেলা যীশুকে নিয়মিত বন্দনা করেছে। রোজ নিয়ম করে চার্চে গেছে। তবু যীশু কঠিন শাস্তি দিল তাকে। প্রেমের দেবতা প্রেমাস্পদকে কেড়ে নিল তার কাছ থেকে। ইঞ্জিনিয়ার যেমন হঠাৎ এল, তেমনি হঠাৎই চলে গেল, কোনো স্মৃতি রেখে গেল না। প্রতিদিন কাজের মধ্যে পাওয়া কি, একমাত্র পাওয়া? তাতে কী মন ভরে? মাত্র একটা বছরের মেলামেশা। উভয়ের ভেতর একটা চিঠিও যদি আদান-প্রদান হত তাহলে সেই সম্বলটা নিয়ে অনন্তযুগ পার করে দিতে পারত। এই যে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদের অতলান্ত মহাসাগর ঐ একটা চিঠি অনন্ত উর্মিমালার তরঙ্গ পৌঁছে দিতে পারত প্রেমের

অমৃতলোকে। তার আত্মার মধ্যে মার্গারেট অমর হয়ে থাকত। এই অদ্ভুত অনুভূতিটা প্রশ্নে প্রশ্নে ভরিয়ে ফেলল—এটা হল কি? এটা হঠাৎ হলই বা কেন? অনেক দিনের অনেক কথাই মনে পড়ে।

রোজ বিকেলে ওরা যখন বস্তিতে বস্তিতে ঘুরত। রবিবার এবং ছুটির দিনে বেড়াতে যেত গ্রামের দিকে। খোলা হাওয়ায় বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে ফিরে আসত আনন্দে বিভোর হয়ে। সূর্যাস্তের মনোরম মিষ্টি আলো গায়ে মেখে ওরা হেঁটেই ফিরত। ইঞ্জিনিয়ার সেক্সপিয়ারের টেমপেস্ট থেকে ফার্ডিনাণ্ডের ভাষায় নিজের মনের ভাব প্রকাশ করে মার্গারেটকে বলত ঃ

What's dearest to the world! Full many a lady
I have ey'd with best regard; and many a time
Th' harmony of their tongues hath into Bondage
Brought my too diligent ear, for several virtues.
Have I lik'd several women, never any
With so full soul, but some defect in her
Did quarrel with the noblest grace she ow'd,
And put it to the foil; but you, o you,
So perfect and so peerless, are created
Of every creature's best!

মার্গারেটের ওষ্ঠদ্বয়ে বিগলিত হাসির প্রসন্ন নির্ঝর। সেও প্রস্তুত হয়েছিল। ইঞ্জিনিয়ারের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে মিরাণ্ডার ভাষায় নিজের মনের ভাব প্রকাশ করে বলত ঃ

I do not know
One of my sex; no woman's face remember,
Save, from my glass, mine own; nor have I seen
More that I may call men than you, good friend,...
... ... I would not wish
Any companion in the world but you;
Nor can imagination from a shape,
Besides yourself, to like of.

সেই মুহূর্তে এক স্বর্গ নেমে আসত তাদের মধ্যে। হঠাৎ সেই স্বর্গরাজ্যে এক দৈত্য প্রবেশ করে সব স্বপ্ন চুরমার করে দিল।

মার্গারেট দেখতে পাচ্ছিল ইঞ্জিনিয়ারে ঘরে দাঁড়িয়ে আছে সে। শয্যার পাশে বসে আছে ওর মা। তাকে দেখেই, সস্নেহে তাঁর জায়গায় বসিয়ে বললেন ঃ তোমরা দু'জন গল্প কর ততক্ষণ। মার্গারেট ইঞ্জিনিয়ারের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল ঃ কেমন আছ?

খারাপ কী। বেশ আছি। কেবল তোমার জন্য কষ্ট হয়।

মা, বলছিল রোজ জ্বর হয়, বাঁ দিকের পাঁজরে ব্যথাটা বেড়েছে। কাশির মাত্রাটাও আগের থেকে ঘন ঘন হচ্ছে। কাশতে কাশতে নাকি দম বন্ধ হয়ে আসে।

ইঞ্জিনিয়ার তার প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গিয়ে বলল ঃ তোমার কাজ কেমন হচ্ছে। একার ওপর খুব চাপ পড়েছে। সত্যি অতুলনীয়া তুমি। বস্তীর লোকেরা তোমাকে দেবী বলে। স্বর্গের পরী বলে। সত্যিই তুমি স্বপ্নের পরী। দমকা কাশিতে কথাগুলো তার বন্ধ হয়ে গেল।

মার্গারেট কাশি এবং ব্যথাটা উপশমের জন্য ওর বুকটা একটু ডলে দিল। একটু স্থির হলে বলল ঃ তোমাকে দেখে আমার ভয় করছে। বড় ভয় করছে।

ইঞ্জিনিয়ার হাসল মরিয়ার হাসি। অভয় দিয়ে বলল ঃ কিসের ভয়? তোমার কিসের ভয় মার্গারেট।

জানি না। একদিন এই অসুখে বাবাকে হারিয়েছিলাম। আজ সেরকম একটা ভয়ে ভেতরটা ছিন্নভিন্ন হচ্ছে। ইঞ্জিনিয়ার আমার বুকে কান পাতলে তুমি মিরাণ্ডার কথাই শুনতে পাবে—

I am your wife, if you will marry me;
If not, I'll die your maid-To be your fellow
You may deny me; but your servant,
Whether you will or no.

ইঞ্জিনিয়ার ফার্ডিনাণ্ডের কথায় উত্তর দিল ঃ

My mistress, dearest,/And I thus humble ever.

মার্গারেট মিরাণ্ডার কথার প্রতিধ্বনি করে বলল ঃ

My husband, then?

ইঞ্জিনিয়ার ফার্ডিনাণ্ডের ভাষায় তার জবাব দিল। বলল ঃ

Ay, with a heart as willing
As bondage e'er of freedom. Here's my hand......

মিরাণ্ডার কথাগুলো বলতে প্রত্যুত্তরে তার দু'চোখ জলে ভেসে গেল। তবু কষ্ট করে উচ্চারণ করল—

And mine, with my heart in't. And now farewell.

সেদিনের কথাগুলো সাতবছর পরেও তেমনি মনে আছে তার। ইঞ্জিনিয়ারকে হারানোর আশঙ্কায় তার ভেতরটা এত অধীর হয়েছিল যে, ও ধৈর্য-হারাল। সব নিষেধ ভুলে গিয়ে ওর বুকের ওপর মাথা রেখে গলা জড়িয়ে প্রাণভরে আদর করল। আর হয়তো সময় পাবে না তাই সব সোহাগ উজার

করে দিল মার্গারেট। দুটো দৃঢ়বদ্ধ ঠোঁট বজ্রের মত এঁটে থেকে ভিতরের কান্নাটাকে আটকে রাখল। তারপরে ক্লান্ত এবং একটু বিষণ্ণ চেহারা নিয়ে সে ফিরে এল বাড়ীতে। সেই অনুভূতিটা, স্পর্শটা আজও তার সর্বাঙ্গে লেগে আছে যেন।

কয়েকদিন পরে খবর এল ইঞ্জিনিয়ার আর নেই। ভূমিকম্পে ধ্বংস হওয়ার মত ছিল দিনটা। ইঞ্জিনিয়ার নেই! কী ভয়ঙ্কর শূনত্য তার। প্রেমের বিরহ যন্ত্রণা কী বেদনাদায়ক! এক গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে একটু একটু করে রোজ হারিয়ে যেতে লাগল। সেই প্রথম জানল বিরহ কী? ঈশ্বর এত নিষ্ঠুরভাবে মানুষকে এত একা করে দেয় কেন?

রেক্সহ্যাম মার্গারেটের আর ভাল লাগল না। যেদিকে তাকায় সেদিকেই ইঞ্জিনিয়ারের স্মৃতি। বুকখানা হাহাকার করে। বড় একা আর অসহায় লাগে। মৃত্যু মানেই একাকীত্ব আর সঙ্গীহীনতা। এ এক অন্য অনুভূতি। অন্যের সান্ত্বনার প্রত্যুত্তরে মনের সেই অবস্থাটাকে বোঝানো যায় না। নিজের সঙ্গে কত আর লড়াই করবে সে। বাধ্য হয়েই রেক্সহ্যাম ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিল। ঠিক সেই মুহূর্তে চেস্টারের একটি স্কুলে শিক্ষিকার কাজ পেয়ে গেল।

নতুন শহরে নতুন পরিবেশে সে সম্পূর্ণ একা। ইঞ্জিনিয়ারের বিচ্ছেদ বেদনা ভোলার জন্য সে দ্রুত কাজের জগৎ তৈরি করে নিল। তবু মনের একাকীত্ব ঘোচে না। চারপাশে আছে যারা তাদের কাছে ব্যাকুল প্রশ্ন, কেন নিজেকে আজকাল এত একা মনে হয়? তবে কি তোমরা কেউ নেই আমার সঙ্গে? আচ্ছা ম্যাকডোনাল্ড, তুমি আছ তো?

অন্ধকারের মধ্যে ম্যাকডোনাল্ড যেন হেসে বলল। থাকব না তো কোথায় যাবো। তোমাকে আমি ভালোবাসি মার্গারেট।

নিজের মনে নিরুচচারে মাথা নেড়ে বলল ঃ না। তুমি আমাকে নিয়ে খেলা করেছ। আমার ভালোবাসাকে অপমান করেছ। আমার সরল বিশ্বাসকে ভেঙে তছনছ করেছ। তুমি একটা খুনী, ভণ্ড, প্রতারক। তোমার নাম উচ্চারণ করতে আমার ঘেন্না হয়। তোমাকে আমি ঘেন্না করি।

ঘুমের মধ্যে কথাগুলো এত জোরে জোরে বলল, যে মে'র ঘুম ভেঙে গেল। ধড় মড় করে উঠে প্রবল ঝাকুনি দিয়ে মার্গারেটের ঘুম ভাঙাল। ডাকল ঃ এই দিদি! কী বলছিস! আবার স্বপ্ন দেখছিস।

স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠল মার্গারেট। ধীরে ধীরে চোখ মেলল। নাইট ল্যাম্পের মৃদু নিষ্প্রভ আলোয় ভালো করে কিছু দেখা যায় না। সব কেমন ভুতুরে ভুতুরে লাগে। মে'র মুখখানাও ফটোর নেগেটিভের মত দেখতে লাগল। স্বপ্নের ঘোর কাটতে বেশ একটু সময় লাগল। কেমন একটা অভিভূত

আচ্ছন্নভাব নিয়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে। মাঝরাতে তার গভীর ঘুমটা এভাবে নষ্ট করে দেয়ার লজ্জায় বিব্রতবোধ করল। স্বপ্নের কথা বলতে একটু সংকোচও হল। অপরাধীর মত মে'র হাতখানা তার কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে মন খারাপ করা আর্ত গলায় বলল ঃ মে, আমার ভীষণ ভয় করছে। মনে হচ্ছে, যীশুর কাছে আমি অপরাধ করেছি। তাঁর মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে বলছি, ওগো অমৃতের পুত্র, আমার পাপের মার্জনা কর।

বিস্ময়ে মে'র ভুরু কুঁচকে গেল। অবাক হয়ে প্রশ্ন করলঃ মার্জনা চাওয়ার মত কোনো অন্যায় তো তুই করিসনি দিদি। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কি দেয়লা করছিস।

ওকে জড়িয়ে ধরে কেমন একটা ভয়ার্ত গলায় মার্গারেট বলল ঃ দেয়ালা করব কেন? আমার ভীষণ ভয় করছে। মনে হচ্ছে, যীশুর কাছে আমার অপরাধ রাখার জায়গা নেই। তবু কী আশ্চর্য! অন্তরে কোথাও এতটুকু পাপবোধ নেই, আত্মগ্লানি কিংবা অনুশোচনাও নেই।

মে দিদিকে ধমকে বলল ঃ মাঝরাতে তোর নাটক করতে হবে না। শুয়ে পড়। লেপ টেনে নিয়ে সে আপাদমস্তক মুড়ি দিল। লেপের মধ্যে মুখ লুকিয়ে বলল ঃ তোর কথার মানে নেই। কখন কোন ভাব মাথায় উদয় হয় ঈশ্বরও জানে না। একবার মাথায় কিছু ঢুকলো তো, ব্যস তাই নিয়ে পাগলামি শুরু হয়ে গেল।

মার্গারেট একটু অপ্রস্তুত হয়ে লেপ মুড়ি দিল। এক বিছানায় দু'জন গা ঘেঁাসাঘেঁসি করে চুপচাপ রইল। আবাছা অন্ধকারের দু'চোখ খোলা রেখে মার্গারেট আচ্ছন্ন গলায় বলল ঃ মে, আমার কী ভালবাসতে নেই? ভালবেসে ভালবাসার মানুষকে যদি না পেলাম তা-হলে এই জীবনের কী দাম রইল? ভালবাসা মানে তো পরিপূর্ণ হওয়া, সুখে, আনন্দে ভরে ওঠা। ভালবেসে আমি এসব থেকে বঞ্চিত হলাম কেন? ঈশ্বরের কাছে আমি কী অপরাধ করিছি। আমার প্রেমে শুধু যন্ত্রণা, বুকভরা হাহাকার। কেন?

লেপের ভেতর থেকে মাথা বের করে সে মার্গারেটের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল। হাত দিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে বলল ঃ দিদি তুই কাঁদছিস? ভীষণ সেন্টিমেণ্টাল তুই। ভালবাসা অপরাধ নয়। ভালবাসা হল ঈশ্বর। এবুকে ভালবাসা তো ঈশ্বর দিয়েছে। তা-হলে এসব কথা ভেবে মন খারাপ করিস কেন?

ভালবাসাই ঈশ্বর-এরকম একটা বিশ্বাস চেপে রেখে সুস্থ থাকা মুশকিল আমার। একদিন গর্ভবস্থায় মা ঈশ্বরের কাছে প্রতিদিন মানত করত প্রভু, যদি নিরাপদে আমার সন্তানের জন্ম হয় তা-হলে তোমার চরণেই তাঁক সমর্পণ করব। এক অদৃশ্য ইঙ্গিতে সদ্যোজাত বালিকার জীবন-শতদল জন্মলগ্ন থেকে

দেবপূজার অর্ঘ্যরূপে নিবেদিত হল। এখানেই ঘটনার ইতি নয়। ড্যানগাননের বাড়িতে যে পারিচারিকা আমার দেখাশোনা করত হঠাৎ সে একদিন শিশু মার্গারেটকে কম্বলে জড়িয়ে পাড়ার এক ক্যাথলিক চার্চে তাকে ব্যাপ্টাইজ করল। অজ্ঞাতে ভাগ্যদেবতা আমাকে নিয়ে এক তামাশার নাটক করল। নাটক তার নিজের পথেই চলল। ঈশ্বরের পূজোর জন্য ইহজীবনে যাকে উৎসর্গ করা হল সাধারণ জীবনে তার ফেরার সব রাস্তাই ঈশ্বর বন্ধ করে দিল। কারণ, ঈশ্বরের ভালবাসার কোনো ভাগ হয় না। ঈশ্বরের পূজোর জন্য একবার যা নিবেদিত হয় তার ওপর অন্য কারো দাবি থাকে না। ঈশ্বরের সম্পত্তি হয়ে যায় সে। আমার বেলাতে বোধ হয় তাই হয়েছিল। নইলে এমন হওয়ার তো কোনো কারণ ছিল না। ঈশ্বর রুষ্ট হয়েই অকালে ইঞ্জিনিয়ারকে তুলে নিয়ে আমাকে শুধু শাস্তি দিল না, সতর্ক ও সাবধান করল। কিন্তু আমি তো রক্ত মাংসের মানুষ। মন বলে একটা জিনিস তো আছে। ছ'বছর বাদে একদিন সেই মনের কাছে হেরে গিয়ে ম্যাকডোনাল্ড নামে একজন ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ারকে ভালবাসলাম। বিয়ে করার স্বপ্নে যখন মশগুল তখন হঠাৎই ম্যাকডোনাল্ড আঠারো মাসের মধুর প্রণয় সম্পর্ককে চিরকালের মত চুকিয়ে দিয়ে অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করল। এবারও ঈশ্বর আমার স্বপ্ন, সাধ, আকাঙ্ক্ষা, বাসনার ঘরে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে একেবারে একা করে দিল। ভালবাসার ঈশ্বর চায় না আমি ঘর বাঁধি। মার্গারেটের কণ্ঠস্বরে অভিমান ছাড়া এমন কিছু ছিল যা হাহাকারের মত শোনাল।

মে সন্মোহিতের মত স্তব্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকে তার দিকে। সব ভাবনা চিন্তা থেমে গেছে। কথা খেলছে না। শান্ত অনুত্তেজিত কণ্ঠে বলল ঃ দিদি, তোর আর্ত মনের ওপর সান্ত্বনার বড় বড় কথার পাথর চাপিয়ে তোর মনকে ক্লিষ্ট করতে চাই না। তাই বলে, কেউ তোর ওপর নিষ্ঠুরতা করেছে বলে, তুই নিজের একজন কঠিন বিচারক হয়ে নিজেকে শাস্তি দিবি এটা কোনো কাজের কথা নয়। হতাশ হওয়ার কিছু নেই বোন। অনেক ঝড় ঝাপ্টা তোর ওপর দিয়ে গেছে। যাবেও হয়তো সারা জীবন। তাই বলে নিজের ওপর বিশ্বাস, শ্রদ্ধা হারাবি কেন? বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা গেলে কী থাকল জীবনে? ঈশ্বরের মনের ইচ্ছে জানি না, কিন্তু চারপাশে যারা আছে, তাদের সকলকে সুখী করে, পরিপূর্ণ করে তুই যে নিজের পরিবার পরিজনের জন্য একখানি সুখের নীড় গড়েছিস, আনন্দের সংসারে সকলকে যে আনন্দিত করলি সে কী ঘর বাঁধার স্বপ্ন সাধনা নয়? এতবড় একটা সাফল্যের পরেও যদি ভেঙে পড়িস, প্রতিকূল শক্তির হাতে পরাজিত মনে করিস তাহলে সে তোর পরাজয়। তোর সেই পরাভব দেখার আগে—

মে'র ভীষণ একটা প্রতিজ্ঞার কথা বলার আগে মার্গারেট তার মুখ চেপে ধরল। তার নরম মসৃণ গালের ওপর চুম্বন এঁকে দিয়ে বলল ঃ আর বলতে হবে না। কিন্তু আমার এলোমেলো জীবনটা গুছিয়ে নিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে আমার গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারব তো?

মার্গারেটের কথা শুনে কৌতুকপ্রবণ মেরীর মাথায় হঠাৎ একটা দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেল। কৌতুকে অধর যুগল প্রফুল্লিত হল। বলল ঃ তোর গন্তব্যস্থল কি ওয়েস্টএণ্ডের ইসাবেলের ড্রইং রুম? তাই বলি, রাতদুপুরে হঠাৎ পুরনো প্রেম উথলে ওঠল কেন? দিদি, খুব সাবধান।

মার্গারেটের কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। যদিও একটা দুরন্ত লজ্জায় এবং ক্রোধে তার মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেছিল তবু মুখ টিপে রইল। মে'র কাছে নিজেকে ধরা দিল না। দেবে কী করে? মেরীর কৌতুক তো সুগন্ধ ফুলের সৌরভের মত সমস্ত স্নায়ুর মধ্যে ছড়িয়ে গিয়ে তাকে কেমন বিবশ করে দিল। আচমকা একটা নতুন অনুভূতি হল।

মার্গারেটকে নিরুত্তর দেখে মেরী সকৌতুকে বলল ঃ সিস্টার মনে হচ্ছে কেউ তোমার মন চুরি করেছে। তা-হলে আরো একজনের নাম মনের খাতায় নথিভুক্ত হল।

মে'কে ধমকে মার্গারেট বলল ঃ সব তাতে তোর পরিহাস।

ধরা পড়ে গেছ বোন। লজ্জা করে কাজ নেই। প্রবলেমটা কি চট করে বল তো? সমাধান আমার করাই আছে।

চুপ করে শুয়ে পড়। প্রেম ট্রেমের ব্যাপার নয়। বললামই তো প্রেম বিয়ে আমার কপালে নেই। তোদের মত সংসার করার স্বপ্ন আর দেখি না। এসব আমার জন্য নয়। মিছিমিছি নিজের দুঃখ এবং যন্ত্রণা বাড়িয়ে কী লাভ। ঈশ্বর চাইলে, ম্যাকডোনাল্ডের সঙ্গে নীড় বাঁধার স্বপ্ন ভেঙে টুকরো টুকরো হত না। নইলে, আমার বঞ্চিত কিংবা প্রতারিত হওয়ায় কোনো কথা নয়। আমার মন ভেঙে গেছে। ধর্ম, রাজনীতি, সংস্কৃতি চর্চা করে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব।

মার্গারেটের কথা শুনে মেরীর মনটা দ্রবীভূত হল। দরদী গলায় বলল ঃ জীবনে ওরকম অজস্র ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়ত। তাই বলে কারো জীবনই থেমে যায়নি, ভেঙে চুরমারও হয়ে যায়নি। দু'দিন বাদে দুঃখের বোঝা হাল্কা করে আবার চলা সুরু করেছে। স্মৃতি আঁকড়ে বাকি জীবনটা নষ্ট করা কিংবা ব্যর্থ করার মধ্যে কোনো বাহাদুরি নেই। তাতে কোনো শ্রেষ্ঠত্ব কিংবা মহত্ব প্রকাশ পায় না। আবেগপ্রবণ বলে তুই কষ্ট ভোগ করিস। তুই ভাল বলে ঈশ্বর তোকে শুধু দুঃখের বোঝা বইতে দিয়েছে। আমাদের সংসারটা কীভাবে যে একলা টেনে নিয়ে গেছিস সে তো আমরা জানি।

দারুণ মুগ্ধ চমকে চমকে ওঠল মার্গারেট। আত্মত্যাগের আলো পড়ে তার ভেতরটা হঠাৎ বড় হয়ে গেল। বলল ঃ একে বোঝা বয়ে বেড়ানো বলে না বোন। এ হলো উত্তরণ। জীবনের আসল মানে হল উত্তরণ।

সে বলল ঃ উত্তরণ মানে অতিক্রম করা নয়, নিরন্তর চলা। এক অবস্থা থেকে আর এক অবস্থার দিকে এগিয়ে যাওয়া।

তোর কী মনে হয়েছে আমি থেমে গেছি। কত ঝড় গেছে জীবনের ওপর দিয়ে, তবু ভেঙে পড়িনি, থেমেও যায়নি। যখন খুব একঘেয়ে লাগে তখন অতীতের অনেক কথা মনে হয়। অতীতকে রামন্থন করে একটু শান্তি পাই। নিজের কাছে নিজে দামী হয়ে ওঠি। কত দুর্গম সব অজানা পথ অতিক্রম করে আজ এই জায়গায় এসে পৌঁছিয়েছি, ভাবতে ভীষণ ভাল লাগে।

এসব কথা হঠাৎ এমন করে মনে এল কেন? সত্যি করে বল তো— কী হয়েছে তোর? চিরকাল তুই বড় চাপা। মুখ ফুটে নিজের কথা কাউকে বললি না। বেশ বুঝতে পারছি নিজের সঙ্গে একটা লুকোচুরি খেলা করছিস। সে খেলাটা যদি প্রেমের নাও হয়, তা-হলে কোন ব্যর্থতা এবং হতাশা থেকে মনটা এমন ব্যাকুল হল?

মেরীর উদ্বেগে মার্গারেটের মনটা নরম হল। গাঢ় গভীর নিশ্বাসের সঙ্গে বুকের গভীর থেকে সহসা কথাগুলো ওঠে এল। বলল ঃ মে, তুই আমার বন্ধুও বটে। অশান্ত মনটা প্রকৃতিস্থতায় যত স্থির হয়ে আসছে, ততই বুঝছি আমার জীবনে একাধিক মস্ত বড় ঘটনা জ্ঞান হওয়া থেকে ক্রমাগত ঘটে গেছে নিজের অজান্তে। এখনও ঘটছে। যাই ঘটুক, প্রতিটি ঘটনা আমার এই অখ্যাত ছোট্ট জীবনের এক একটা মাইলস্টোন। অন্যের কাছে তার কোনো দাম না থাকলেও আমার কাছে আছে। তাই বোধ হয়, একটার পর একটা মাইলস্টোন অতিক্রম করে যতই চলেছি ততই নিজেকে নিয়ে আমার কৌতূহলের অন্ত নেই। একজন পাদ্রীর ঘরের মেয়ে এবং নার্সারী স্কুলের এক শিক্ষিকা সম্পর্কে সমাজের মানুষের যে অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা এবং অনাদর আছে সেটা আমার জীবনে কোনো বাধা হয়নি। সব বাধাই কারো সাহায্য ছাড়াই অতিক্রম করে গেছি। অন্য জীবনের'আলোকিত প্রান্তরের দিকে সাগরে যাওয়া ঝর্ণার চলকানো জলের মতই উদ্দাম আবেগে ছুটে চলেছি। সেই সময় অতীতের দিকে ফিরে তাকানো খুব প্রয়োজন হয়। জীবনের এই যতিটা নতুন প্রাণ দেয়। একঘেয়ে আর ক্লান্তির বদলে, নতুন করে চলা। গতি বদলের আর এক নামই অনন্ত চলা, সময়ের স্রোতে অফুরান বেঁচে থাকা। আমিও সময়ের স্রোতে ভেসে চলেছি। কোথায় যাচ্ছি, কোথায় পৌঁছব জানি না। এই কথাটা স্বপ্নের মধ্যে গভীর করে অনুভব করার মধ্যে এক ধরণের দুঃখ, সুখ এবং মুক্তির আনন্দ আছে। এই নিয়েই তো আমার মত সাধারণ মেয়েদের বেঁচে থাকা।

মেরী কথা বলল না। আলতোভাবে ডান হাতখানা তার গায়ের ওপর রাখল।

লণ্ডন ত্যাগ করে স্বামীজি নিউইয়র্কে পাড়ি দিয়েছেন। মার্গারেটের মনটা ভীষণ খারাপ লাগছিল। মনের অস্থির ভাবটা দূর করার জন্য কোথায় যাওয়া যায় ভাবতে ভাবতে লেডি রিপনের বাড়ি যাত্রা করল। ভিক্টোরিয়া স্ট্রিটে লেডি রিপনের সুসজ্জিত বিলাস বহুল হল ঘরে, বৈকালিক মজলিস তখন জমজমাট। মার্গারেটকে হঠাৎ সেখানে হাজির দেখে অনেকেই অবাক হয়েছিল। বাইরের এক ঝলক হাওয়া নিয়ে সেলুনে প্রবেশ করল যেন মার্গারেট। লেডি রিপনের পাশে যে খালি চেয়ারটা ছিল সেখানে রেশমের স্কার্ট গুটিয়ে সন্তর্পণে বসল।

সেলুন কক্ষটি সাত আট বছর আগের মতই আছে। কোথাও কোনো পরিবর্তন হয়নি। এমন কি তার বসার পুরনো চেয়ারটা আজও লেডি রিপনের পাশে তেমনই রয়েছে। সিসেম ক্লাবটাই যা সেলুন থেকে ডোভার স্ট্রিটে স্থানান্তরিত হয়েছে। কিন্তু লেডি রিপনের পুরনো আড্ডাটা ভাঙেনি, থেকেই গেছে। জন-পনেরো লোক ছিল ঘরে। ধূপের ধোঁয়া কুণ্ডলী হয়ে ঘরময় সৌরভ ছড়িয়ে দিচ্ছিল। সাদা আলাখাল্লা পরা এক পাদরী ভারতের সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের খৃষ্টধর্ম সম্পর্কে কিছু মন্তব্য নিয়ে তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করছিল। মার্গারেটের মনে হল, বক্তারা কেউ তাঁর বক্তৃতা শুনছিল না। তাদের চোখ জোড়া ক্রমাগত তাকেই অনুসরণ করছিল। প্রত্যেকের মধ্যে কেমন একটা উথলে ওঠার ভাব। অভিভূতের মত হাসি হাসি মুখে মার্গারেট সকলকে স্বাগত জানাল।

বয়স্ক পাদরী বক্তা বক্তৃতায় ইতি টেনে দিয়ে নিজের জায়গায় বসল। লেডি রিপন মার্গারেটের কানে কানে কী বলল আর তাতে এক গাল হাসল সে। বলল ঃ আজ একটু একা থাকতে দাও প্লিজ। অতীতের কত কথা মনে পড়েছে।

উপস্থিতব্যক্তিরা কিন্তু একা থাকতে দিল না তাকে। দল বেঁধে তারা বলল ঃ মিসেস এলিজাবেথ নোবল এত অল্প বয়সে আপনি লন্ডনের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবীদের মন জিতে নিয়েছেন। তাঁদের নজর কেড়ে নেওয়া চাড্ডিখানি কথা নয়। আজ যখন আমাদের মধ্যে পেয়ে গেছি তখন কিছু না শুনে আপনাকে ছাড়ছি না।

মার্গারেটের মনটা সত্যিই ভাল ছিল না। মনটা চাঙ্গা করতে মজলিসে এসেছিল। তাই ওদের অনুরোধের চাপে পড়ে প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বলল ঃ মাপ করবেন, আজ সত্যিই পারব না। পুরনো বন্ধুর সঙ্গে খোলা মনে গল্প করতে এসেছি।

হঠাৎ মার্গারেটের চোখ পড়ল সেণ্ট জেমস্ গেজেটের সম্পাদক আর, ম্যাকনীলের ওপর। অমনি উৎফুল্ল হয়ে মার্গারেট বলল ঃ হ্যালো এডিটর। আপনি এখানে? ক্লাবে দেখি না কেন? এই সেলুনে একদিন সিসেম ক্লাবের ফিতে কেটেছিলেন আপনি। ক্লাব স্থানান্তরিত হওয়ার পর সেখানে না যাওয়াটা ভীষণ অন্যায়।

ম্যাডাম, কাগজের এডিটরদের একটু রেখে ঢেকে চলতে হয়। পাবলিক প্লেসে রুটিন মাফিক আশা যাওয়ার অসুবিধেটা তুমি বুঝবে। তোমার কাজ তো ভালই চলছে। বার্ণাডশ, হাক্সলির মত নামজাদা লেখক ও বৈজ্ঞানিকদের ক্লাবে এনে তুমি তো সাড়া ফেলে দিয়েছ।

ওদের কথাবার্তার মধ্যে ফুরসৎ খুঁজে নিয়ে একজন শ্রোতা সকলকে হকচকিয়ে দিয়ে হঠাৎ মার্গারেট প্রশ্ন করল ঃ মিসেস নোবল আপনি ভূত দেখেছেন?

এরকম একটা আচমকা মজার প্রশ্নে মার্গারেট হেসে ফেলল। সমাগত ব্যক্তিরা সকলে বেশ কৌতুক বোধ করল। মার্গারেট কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল ঃ এরকম আজব প্রশ্ন করলে কেন ভাই? যাই হোক, তোমার প্রশ্নে আড্ডাটা না হয় নতুন ভাবে জমে ওঠবে। ভূত আমি দেখিনি। ভূতের অস্তিত্ব বিশ্বাস করি না। তবু কেউ প্রশ্ন করলে তাকে বলি ভূত আমায় দেখাতে পার? অমনি সে কুঁকড়ে যায়?

একজন বয়স্ক মহিলা বললেন ঃ একজন ক্যাথলিক হয়ে আপনি তো ঈশ্বর বিশ্বাস করেন। ঈশ্বরকে কেউ চোখে দেখাতে পারে না। তা-হলে ভূতের ক্ষেত্রে যা মানেন না, ঈশ্বরের বেলায় তাকে বিশ্বাস করেন কেন?

মার্গারেট একটু থমকে যায়। এরকম অদ্ভুত প্রশ্নের জবাব কী বলবে ভেবে পেল না। কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর বলল ঃ এধরনের সূক্ষ্মতর বোধের উত্তর দেওয়ার যে মননের দরকার হয় এই মুহূর্তে তার প্রস্তুতি আমার

নেই। আবার জবাব এড়িয়ে গেলে আমায় নিয়ে হাসাহাসি করবেন অনেকেই। যুক্তি দিয়ে সব কিছু ব্যাখ্যা করা যায় না। তবে যে শুভ শক্তি হৃদয় দিয়ে অনুভব করা যায় না, তা মেনে নেওয়ার ঘোরতর বিপক্ষে আমি। যেহেতু ভূত থেকে ভয় জন্মায়, এবং ভূতের বোধ সীমাহীন অন্ধকারের নিজ্জিত করে এবং সত্তায় সত্তায় ভয়ের শিহরণে প্রাণবায়ু নিঙরে নেয় সেহেতু এর মধ্যে জীবনদায়িনী কোনো কল্যাণকর শুভশক্তি নেই। এক সর্বগ্রাসী ভয় ও আতঙ্ক থেকে উদ্ধার পেতে ভীত মানুষ পরম করুণাময় ঈশ্বরকে ডাকে। ভয় দূর হয়ে যায়। ভেতরটা চাঙ্গা হয়ে ওঠে। নতুন করে প্রাণ পায়। হৃদয়ের মধ্যে তাঁর শক্তিকে টের পায়। ঈশ্বরের বিশ্বাস এক অন্য জিনিস। আমাদের প্রাণের মধ্যে তিনি ভীষণভাবে আছেন। তাঁকে চোখে দেখা না গেলেও নিশ্বাসে প্রশ্বাসে তাঁর শুভ অস্তিত্বকে সর্বক্ষণ টের পাওয়া যায়। এই বিশ্বের পটভূমিতে অসীম আত্মাকেই আমরা ঈশ্বর বলি। ঈশ্বর আমাকে আকর্ষণ করে, প্রাণমনকে আনন্দে ও তৃপ্তিতে রাঙিয়ে দেয়। মনের মধ্যে তার সুন্দর এবং পবিত্র উপস্থিতি টের পাই। তখন ভয় থাকে না। অনুরাগে, বিশ্বাসে, শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে মনটা দীন হয়ে যায়। মনের চোখ দিয়ে ঈশ্বরকে আত্মার মধ্যে খুঁজি। মনের গহনে তাঁকে খুঁজতে হয়, দেখতে হয়, জানতে হয়, জানাতে হয়। মন একাগ্র হলে আমির ওপারে অজ্ঞাত অতীন্দ্রিয়রাজ্যে প্রবেশাধিকার ঘটে। বন্ধুবর, এটা তর্ক করে বোঝার জিনিস নয় হৃদয়ের মধ্যে উপলব্ধি করার ব্যাপার। সবার তা থাকে না। যোগ অভ্যাস করলে মনের পরদা একটার পর একটা সরে যায়। অমৃতলোকে প্রবেশের দরজা খুলে যায়। চোখের সামনে চোখের ঠাকুরকে প্রত্যক্ষ করা তখন কঠিন কিছু নয়। আপনারা আমাকে যেমন দেখছেন তেমনি তাঁকেও দিব্য চোখে দেখবেন।

মার্গারেট বিহ্বল হয়ে পড়েছিল কিছুক্ষণের জন্য। মহৎ, উদার ও পবিত্র অনুভূতিতে শ্রোতারাও আচ্ছন্ন হয়ে গেল। মন্ত্র মুগ্ধ হয়ে তার কথা শুনছিল। আশ্চর্য এক অদ্ভুত অনুভূতিতে মার্গারেটের ভেতরটা বিদ্যুৎ চমকানোর মত চমকাল। কক্ষজুড়ে তখনও নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল। সেই শান্ত, স্তব্ধ, সুন্দর, মুহূর্তে কিছুক্ষণের জন্য সকলে সমাহিত হয়েছিল। নৈঃশব্দের সেই ক্ষণটুকুর মধ্যে ডুবে গিয়ে নিজেকে প্রশ্ন করল ঃ এ কার বাণী প্রতিধ্বনিত হল তার মধ্য দিয়ে? কি করে এটা সম্ভব হল? এই অনুভূতি, উপলব্ধি হঠাৎ কোথা থেকে তার মন দখল করল। হৃদয় মধ্যে ও কার কণ্ঠস্বর, মন্ত্রের মত ধ্বনিত হল? সেতারের মধুর ঝঙ্কারের মত তার কানের ভিতরে অনুরণিত হতে লাগল ভারত সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের জলদমন্দ্র কণ্ঠস্বর ঃ When it has come closer and closer, the God of Heaven becomes the God in Nature...and

the God who is Nature, becomes the God within this temple of the body, and the God dwelling in the temple of the body becomes the temple itself, becomes the soul of man.

বিস্ময়ের শেষ নেই মার্গারেটের। এক সময় ঘোর কাটে। নৈঃশব্দের রহস্যময়তার রেশ ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই সম্মোহিতের মত মার্গারেট সেলুন কক্ষত্যাগ করতে উদ্যত হল। লেডি রিপন টেনে ধরল তার স্কার্ট। জোর করে বসাল তার কাছে। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের দিকে দুচোখ ছড়িয়ে দিয়ে বলল ঃ মার্গারেট আমার পুরনো বন্ধু। ওঁকে আপনাদের অনেকেই চেনেন কিন্তু আমার মত নয়। সাত-আট বছর আগে এই কক্ষেই আলাপ হয়। মুহূর্তে সে পরিচয়টা গাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। কেন জানেন? ওর সত্তার মধ্যে একটি সৃষ্টিশীল মন আছে। সৃষ্টির ক্ষুধা নিয়ে একের পর এক সংস্থা তৈরি করেছে। যেখানে যখন থেকেছে সেখানে সে সংস্কৃতিমূলক কিংবা সেবামূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্টা করেছে। উইম্বলডনে ছোটদের জন্য প্রতিষ্ঠিত রাস্কিন স্কুলটি তার নিত্যকার আনন্দের খোরাক। এই সেলুনেই একদিন তার ও ম্যাকনীলের উদ্যোগে 'সিসেম' ক্লাবের জন্ম হয়েছিল। মার্গারেট নিজেই একটি চলমান প্রতিষ্ঠান।

লেডি রিপনের কথায় মার্গারেট একটু অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। একটু লজ্জাও পেল। বলল ঃ বড় বাড়াবাড়ি করছ লেডি রিপন। এত গুণকীর্তনের কী আছে। তোমাদের মত মানুষেরা আছেন বলেই তো সৃষ্টির নেশায় ডুবে আছি।

মার্গারেটের কাঁধে হাত রেখে লেডি রিপন শ্রোতাদের দিকে চেয়ে বলল ঃ পুরনো দিনের অনেক কথা মনে পড়ছে, জানেন। মিঃ এবেনজার কুক নামে একজন চিত্রশিল্পী ছিল আমার বন্ধু। মার্গারেটের স্কুলের একজন কলা শিক্ষক সে। মার্গারেটেরও আর্টের হাতে খড়ি তার কাছে। একদিন কুক এসে বলল ; ম্যাডাম, আমি একটা রত্ন পেয়েছি। তোমার নন্দন কাননেই তাকে মানায়। বল তো সে পারিজাত আহরণ করে আনতে পারি। তোমার সেলুনে অনেক তারকারা আসেন। কিন্তু তারামণ্ডলের অধীশ্বর ধ্রুবতারা নেই। সকাল সন্ধ্যের আকাশে ধ্রুবতারার মত জ্বল জ্বল করবে সে। কালপুরুষের মত হাতে ধনু আর কোমরে তলোয়ার তার। ঠাট্টা করে আমি তাকে বলি রণরঙ্গিনী। যুদ্ধেই তার আনন্দ। সে যা চায় যুদ্ধ করে অর্জন করে।

মার্গারেট তার কথার মধ্যে বাধা দিয়ে বলল, তুমি একটু চুপ করবে।

হাসি হাসি মুখ করে বলল ঃ একদিন সিসেম ক্লাবের ইতিহাস লেখা হবে। আমি সেই ইতিহাস উন্মোচন করছি। তোমাকে বাদ দিয়ে সিসেম ক্লাবের ইতিহাস লেখা যায় কি? আমি তোমার গুণকীর্তন করছি না। সিসেম ক্লাবের একজন স্থপতির কথা বলছি। সেদিন মিঃ কুক যদি তোমাকে এই সেলুনে

না আনত তা-হলে সিসেম ক্লাবের জন্ম হত না। তোমার মাধ্যমেই কিন্তু সিসেম ক্লাব সৃষ্টি হয়েছে। তুমি এর প্রতিষ্ঠাতা এবং রূপকার। তোমাকে না পেলে সিসেম ক্লাবকে চিনত কে? এই সেলুনের আঁতুর ঘর থেকে বের করে ডোভার স্ট্রিটের স্বনামধন্য পরিবেশে তাকে যদি হাজির না করতে সিসেম ক্লাবের এই স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি হত না। আজ এই ক্লাবের আমন্ত্রণ যে কোনো খ্যাতিমান ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সাহিত্যিক, শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ কিংবা সামাজিক কর্মী, সাংস্কৃতিক কর্মীর কাছে খুবই সম্মানজনক। সে কথা ভাবলে আমার শরীর কন্টকিত হয় পুলকে, গৌরবে, আনন্দে। মার্গারেট তোমার ভিতর দিয়ে যে ক্লাবের পত্তন হল সে শুধু সিসেম ক্লাব নামক একটা প্রতিষ্ঠান নয়। তোমার আমার মত অনেক মানুষের আশা-আকাঙক্ষা কামনা-বাসনার যোগফল। একে সকলের করতেই আমার সেলুন থেকে ডোভার স্ট্রিটে স্থানান্তরিত করার ভূমিকা তুমি নিয়েছিলে। এর মত মর্যাদাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হওয়া সৌভাগ্যের। প্রথিতযশা ব্যক্তিরা এই প্রতিষ্ঠানের সংস্পর্শে এসে আরো বড় হয়ে গেছেন।

মার্গারেট একটু হেসে বলল ঃ ও কথা বললে তাঁদের প্রতিভাকে ছোট করা হয়। বরং প্রথিতযশা ব্যক্তিদের প্রতিভার আলো পড়ে সিসেম ক্লাবই বড় হয়ে গেছে। সুনাম এবং জনপ্রিয় হয়েছে এঁদের নামের জোরেই। সূর্যের আলো পৃথিবীকে আলোকিত করে, কিন্তু সূর্যের কাউকে দরকার হয় না। আধারই সব ; আধেয়র কোনো গৌরব নেই। বন্ধুত্বে অন্ধ হয়ে তুমি মিছেই আমার গর্ব করছ।

লেডি রিপণ একথায় হঠাৎ একটু দিশাহারা বোধ করে চুপ করে থাকে। তারপর ধীর স্বরে বলল ঃ তোমার কথা দিয়েই সুরু করি। সূর্যের আলোয় পৃথিবী আলোকিত হয়, কিন্তু তাতে সূর্যের কী। পৃথিবী না থাকলে সূর্যের আলোর কি গৌরব থাকত? আধারই সব আধেয়র নিজের কোনো গৌরব নেই। সিসেম ক্লাবের জন্য তুমি নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছ। আর কেউ না জানলেও আমি তো জানি, তুমি এর প্রতিষ্ঠাতা, সম্পাদক এবং প্রধান কর্ণধার। এই ক্লাবের বাঁচা বাড়ার মূলে তুমি। তোমার চেতনার রঙে সিসেম ক্লাব সুন্দর হল। তার খ্যাতি গৌরব তোমার প্রচেষ্টাতে হয়েছে। সূর্য অনেক বড়, দূরের গ্রহ বলেই কৃতিত্বের দাবিদার নয়। কারণ তার দেওয়ার ভাণ্ডার বিশাল, সেখান থেকে কে কতটুকু নিয়ে ভরে ওঠল তার হিসেব করে না। সে শুধু দেয়, নেয় না কিছু। ঈশ্বরের পৃথিবীতে তুমিও নিজেকে নানাভাবে শুধু নিবেদন করছ। নিবেদিত হতেই এসেছ। তাই নিজের সম্পর্কে এত উদাসীন। তোমাকে যত দেখি তত অবাক হই। নিজে ধন্য হওয়ার জন্য তোমাকে ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি।

সেণ্ট জেমস গেজেটের সম্পাদক আর ম্যাকনীল, লেডি রিপনের খুব কাছেই বসেছিল। মার্গারেটকে রাগানোর জন্য বলল ঃ ম্যাডামের কথায়

অতিরঞ্জন নেই। তবে, প্রশংসার ছিটেফোঁটা যদি আমার ওপর একটু ছিটিয়ে দিতেন তা-হলে গোলাম হয়ে থাকতাম। কিন্তু কপাল মন্দ বলে সিসেম ক্লাবের জন্মলগ্নের একজন অন্যতম কর্মী হওয়া সত্বেও মিসেস রিপন আমাকে কোনো আমল দিলেন না। আপনারা বলুন, এর পরে যদি আমি মার্গারেটকে ঈর্ষা করি, সে কী অন্যায়? এতদিন জানতাম মেয়েরা মেয়েদের বড় শত্রু, একে অন্যকে সহ্য করতে পারে না। প্রকৃতিগত ঈর্ষা ও বিদ্বেষে এক মেয়ে অন্য মেয়েকে ছোট করে। কিন্তু এযে দেখি জলে ভাসে শিলা! কপাল মন্দ না হলে, এমন অঘটন কারো কপালে ঘটে?

মার্গারেট হাসি হাসি মুখ করে বলল ঃ ম্যাকনীল ভীষণ ঝগড়াটে। বাতাসে চুল জড়িয়ে ঝগড়া করা ওর স্বভাব। জানেন. আমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। পারবে কী করে? আমরা দু'জনে উত্তর আয়ারল্যান্ডের মানুষ হওয়া সত্বেও দুই মেরুর অধিবাসী। রাজনৈতিক মতাদর্শে আমরা একে অপরের বিপক্ষে। উনি আলস্টারের সমর্থক একজন গোঁড়া ইউনিয়নিস্ট আর আমি উত্তর আর্য়ল্যান্ডের অধিবাসী হওয়া সত্বেও রাজনৈতিক মতাদর্শে দক্ষিণ আয়ারল্যাণ্ডের আইরিশ জাতীয়তাবাদের সমর্থক। এই অমিটাই আমাদের স্বস্তিতে থাকতে দেয় না। তাই হয়তো বিরোধের উত্তাপে গা সেঁকে নেয়াটা আমাদের রক্তের ধর্ম।

মার্গারেটের কথাগুলো ম্যাকনীল উপভোগ করছিল। তাকে খেপানোর জন্যই সেলুন গৃহে সমবেত ব্যক্তিদের দিকে এক চোখ আর মার্গারেটের দিকে অন্য চোখ রেখে বলল ঃ আপনারা ওর নিজের মুখে সব শুনলেন। এবার বিচার করে বলুন, ঝগড়াটে'টা কে?

মার্গারেট তৎক্ষণাৎ বলল ঃ একেই বলে বাতাসে চুল জড়িয়ে ঝগডা করা। ঝগড়ার প্রসঙ্গ নেই, কিন্তু অভ্যাসটাই ঝগড়া করা। তাই বাতাসকে শুনিয়ে দু'চার কথা গালিগালাজ করাও সুখ। এই হল ম্যাকনীল।

সেলুন গৃহে সমবেত ব্যক্তিরা তাদের চাপান উতরের নির্মল কৌতুক উপভোগ করছিল। ম্যাকনীলের মুখে টেপা হাসি। বলল ঃ আসলে কী জানেন. আইরিশ ন্যাশালিষ্টরা হল বেদেদের মত নিজের বাসভূমি সম্পর্কে উদাসীন। এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতেই ভালবাসে।

মার্গারেট ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল ঃ ছিন্নমূল কেউ হতে চায় না। জোর করে ছিন্নমূল তাকে করা হয় আইরিশ ইউনিয়নিষ্টদের স্বার্থ, লোভ এবং চক্রান্তে, আইরিশদের একাংশ জমি এবং বাস্তু থেকে উৎখাত হয়েছে। শুধু কি তাই? আমাদের নাশ্যানালিস্ট দল সব সময় স্বদেশের স্বার্থে কিছু করতে সঙ্কল্পবদ্ধ, কিন্তু তোমরাই নেপথ্য থেকে তা বানচাল করে দিচ্ছ। কারণ তোমরা ধনী-দেশের বিত্ত, সম্পদ. ঐশ্বর্য তোমাদেব হাতে। এসব রক্ষার স্বার্থেই তোমরা

রাজানুগত এবং সুবিধাভোগীর দল। আর্য়ল্যান্ডের স্বাধীনতা লাভের পথে তোমরাই অন্তরায়। তোমাদের প্রবল বাধা সত্ত্বেও আমরা হোম-রুলের দাবি তুলেছি। স্বাধীনতার স্বাদ তো স্বায়ত্তশাসনে কিছুটা মিটবে, এই আশা নিয়ে লড়াই করছি। ছিন্নমূল বলেই মূল ভূখণ্ডে ফেরার লডাই একা আমরা করছি।

ম্যাকনীল কটমট করে মার্গারেটের দিকে তাকিয়ে কিছু বলার জন্য ফুঁসছিল। সাধারণ কথাবার্তা হঠাৎই বাগ্‌ বিতণ্ডার রূপ নেয়। অপ্রীতিকর বাক্যালাপ শুরু হওয়ার আগেই লেডি রিপন উৎফুল্ল হয়ে বলল ঃ জান ম্যাকনীল, গতকাল লেডি ইসাবেল মার্জেসনের গৃহে ভারত সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের বক্তৃতা হয়ে গেল। সেখানে আমাদের মার্গারেট গিয়েছিল। মুখে কুলুপ এঁটে সন্ন্যাসীর বক্তৃতা নাকি গিলছিল। রাজেন্দ্রানীর মত শান্ত সমাহিত ভাব আত্মনিবেদনের বিনম্র আকৃতিতে এমনই দীনাতিদীন হয়েছিল যে, ভারত সন্ন্যাসীর অপলক মুগ্ধ দুটি চোখ ওর চোখের তারায় তন্ময়তায় থমথম করছিল।

ম্যাকনীল তূণ থেকে তীর বার করে তৎক্ষণাৎ মার্গারেটকে তাক করল। বলল ঃ নিঃসন্দেহে রোমাঞ্চকর খবর। সত্যি বলতে কি এসবের কিছুই আমি জানি না। ওতো চিরদিন ডুবে ডুবে জল খায়। গভীর জলের মাছ অবশেষে জালে ধরা পড়ল। তাই বলি, কিছুক্ষণ আগে মার্গারেট যা বলল, ভীষণ শোনা শোনা মনে হল। এখন বুঝতে পারছি, ভারত সন্ন্যাসীর বক্তব্যকে কার্বণ কপি করেছে।

এই প্রথম ম্যাকনীলের দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়াতে মার্গারেট সংকোচ বোধ করল। হু হু করে ওঠল তার ভেতরটা। চেতনার ভেতর কেমন একটা অভিভূত আচ্ছন্নতার সঙ্গে প্রাণপণে লড়াই করছিল। সত্যিই কী তার বক্তব্যের মধ্যে কোনো নিজস্বতা নেই?

মার্গারেট কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর অসহায়ভাবে বলল ঃ আপনার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বড় নিষ্ঠুর। মানুষকে আঘাত করে আপনি তৃপ্তি পান। ভুলে যাবেন না, সূর্যের আলোয় চাঁদ আলোকিত হয়। কিন্তু তার স্নিগ্ধতা চাঁদের সৃষ্টি। চাঁদের সৌন্দর্য, মাধুর্য সূর্যের নেই। এটাই চাঁদের নিজস্বতা। এটা দেখার চোখ চাই। নিন্দুকের সে চোখ কোথায় যে দেখতে পাবে? শকুন যত ওপরেই থাকুক না কেন তার দৃষ্টি ভাগারের দিকে। আপনারও সেই অবস্থা। কারো ভাল দেখলে ঈর্ষায় বুক জ্বলে যায়।

ম্যাকনীল কয়েকটা মুহূর্ত তার দীপ্ত দু'চোখের ওপর চোখ রেখে চেয়ে রইল। কথা বলল না। এটা ওদের পুরনো খেলা। কিছুক্ষণ অপলক চেয়ে থেকে

মার্গারেট বিব্রত লজ্জায় বলল ঃ ঢের হয়েছে। আর ঢঙ করতে হবে না। এসব আর ভাল লাগছে না। মনটা ভাল নেই। আমি ওঠব।

মুখে স্বীকার না করলেও ম্যাকনীলের কাছে সত্যি যে ধরা পড়ে গেছে এই অদ্ভুত অনুভূতিটা তাকে প্রশ্নে প্রশ্নে ভরিয়ে ফেলল। এটা হল কি? এরকম একটা অভিজ্ঞতা নিয়ে সুস্থির থাকা মুস্কিল হল।

ম্যাকনীল মুখে চুক চুক শব্দ করে খুব আস্তে 'বেচারা' বলল। দু'কদম এগিয়ে গিয়ে বলল ঃ মার্গারেট, আমার অভিযোগ, অনুযোগর উত্তর না দিয়ে সর্বসমক্ষে আমাকে অপমান করেছ। রাগে আমার গা রি রি করে জ্বলছে।

টয়লেট দেখিয়ে দিয়ে মার্গারেট নিস্পৃহভাবে বলল ঃ গায়ে জল ঢেলে আসুন তাহলে সব রাগ জল হয়ে যাবে। আর জ্বালা থাকবে না।

তোমার উপদেশের দরকার হবে না। এক কাপ তিত কফি পেলে সব জ্বালা জুড়োবে।

মার্গারেট ফিক করে হেসে ফেলল। বলল ঃ তিত কফির স্বাদ এখনও ভোলেননি।

অত সহজে ভোলা যায়!

মার্গারেট হাসি হাসি মুখ করে বলল ঃ লেডিকে তিত কফি দিতে বলব।

উহু। স্থান পাত্র আলাদা হলে তার স্বাদ থাকে না। সঙ্গে গাড়ী আছে, চল তোমাকে পৌঁছে দিই।

দরকার হবে না। দু'পা'র গাড়ীতে স্বচ্ছন্দে পৌঁছে যেতে পারব।

তুমি এখনও রেগে আছ।

রাগ করার মত কিছু হয়নি আমাদের। মতভেদ নিয়ে তর্কাতর্কি করি। তারপর সব চুকে বুকে যায়।

কিন্তু আজ তোমাকে অন্য রকম লাগছে। মনে হচ্ছে, কোথায় তুমি হেরে বসে আছ। তাই আমাকে এড়িয়ে যেতে চাইছ।

দ্যাখ, এডিটর, আমার মাথা গরম করে দেবেন না। আপনি ভাল করেই জানেন, কলহটা বাইরের। ভেতরে কোনো গলদ নেই বলে স্বাভাবিকভাবে আমরা মেলামেশা করি ; নিজেরা হাসিখুশিতে থাকি। আমাদের রূঢ় আচরণ দেখে অনেকে ভাবে এদের বন্ধুত্ব গেল। জীবনে মুখ দেখাদেখি করবে না আর। সাঁড়াশি-হাতুড়ি নিয়ে আমবা কে কাকে কি ভাবে ধোলাই করেছি তাই নিয়ে যখন পরস্পরে হাসিঠাট্টা করি তখন অবাক হয়ে যায় তারা। তাই রেগে থাকার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

আজ তর্কটা জমল না তোমার জন্য। অনেককাল পরে তোমাকে পেয়ে ভাবলাম একটু জমিয়ে ঝগড়া করব। কিন্তু হল না। মুড নেই বলে এড়িয়ে

গেলে আমাকে। মনটাও ভাল নেই বলছ। এই অবস্থায় তোমাকে একা ছেড়ে দিই কী করে? অশান্তি ভোগের চেয়ে তোমাকে ঘরে পৌঁছে দেয়া অনেক ভাল।

এডিটর ধন্যবাদ। কিন্তু কোনো দরকার নেই।

তোমার হাতের তিতকুটে কফির স্বাদ এখনও আমার জিভে লেগে আছে। যখনই মনে করি সমস্ত গা'টা কেমন ঝাড়া দিয়ে ওঠে। এর মধ্যে কতখানি পারফেকসান হল তা তো দেখা হয়নি। পরীক্ষাও নেয়া হবে আর মিসেস ইসাবেল নোবলকেও দেখা হয়ে যাবে। ওঠে পড়।

ম্যাকনীলের আহ্বানের মধ্যে এমন একটা জোর ছিল যে, মার্গারেট অমান্য করতে পারল না। লেডি রিপন এবং সেলুনের অন্যান্যদের হাত নাড়িয়ে বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে ওরা দুজন একত্রে গাড়িতে ওঠল।

জোরে ছুটে চলেছে ম্যাকনীলের মোটর গাড়ি। হু হু করে বাতাস লাগে চোখে মুখে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় চুল এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। একটু শীত শীত করছে। তবু গাড়ির জানলার ওপর মাথা রেখে বাইরের দিকে লোভীর মত চেয়ে রইল। বেশ লাগছিল। জীবনে কত ঘটনাই ঘটে। সব কিছু পিছনে রেখে গাড়ির মত উর্ধ্বশ্বাসে গন্তব্যে পৌঁছনোর জন্য ছুটছে। ফেলে আসা জীবনের টুকরো টাকরা ছবি মনে পড়ছিল।

গাড়ীর একটানা শব্দ বারংবার আনমনা করে দিচ্ছিল। নিজের অস্তিত্ব, গাড়ির ভেতর নিঝুম হয়ে থাকার অস্তিত্ব, দু'পাশে ছুটে চলা দ্রষ্টব্য বস্তুর অস্তিত্ব সবই তার চোখের সামনে এবং চেতনার মধ্যে থেকেও ছিল না যেন। সে তার অবচেতনে কিছুদিন আগের একটা ঘটনায় ফিরে যাচ্ছিল।

জীবনে সর্বক্ষেত্রে বিজয়িনী হয়েছে। আঠাশ বছর ধরে জীবনের সমস্ত টুকরো-টাকরা, ফালিতে-ফালিতে সে শুধুই জিতেছে। হারেনি কোথাও। মাঝে

মাঝে ঝড়-ঝাপ্টায়, জীবনের থিত ভিত প্রবলভাবে নাড়া খেয়েছে। তথাপি ছিন্নমূল হয়নি। সংকট সমস্যা, বাধা দু'পায়ে মাড়িয়ে নিজের গন্তব্যের দিকে ধেয়ে গেছে। কোথাও কখনও যতি পড়েনি। থামেনি একবারও। কেবল একবারই কিছুদিনের জন্য যতি পড়েছিল। মাঝে মাঝে এই যতির খুব দরকার হয়। নইলে, জীবনে বাঁচার মানেটা সাহসের সঙ্গে আবিষ্কার করার সুযোগ হত না তার। সেও একটা ঘটনা তার জীবনে।

মাত্র মাস তিন-চার আগের কথা। ম্যাগডোনাল্ড নামে এক ব্যাঙ্ক কর্মচারীর সঙ্গে ব্যাঙ্কের কাজকর্মের সূত্রে পরিচয় হয়। ব্যাঙ্কেই আলাপ। তার সঙ্গে দেখা হলে ম্যাগডোনাল্ড হাসে। সেও তার সঙ্গে হাসে, একজন পরিচিত পরিচিতকে দেখে যেমন হাসি হাসে। সৌজন্যের হাসি, কমরেডশিপের হাসি। এই হাসিটুকু দেখার লোভ ময়াল সাপের মত মার্গারেটকে টানতে লাগল। দেখা হলেও মনটা প্রশান্তিতে ভরে যায়। আবার কাজ সেরে ব্যাঙ্ক থেকে ফেরার সময় বুকের মধ্যে এক সুখের দপদপানি শুরু হয়। মনের বনে ফুল ফোটে। সমস্ত মনের মধ্যে তার সৌরভ ছড়িয়ে যায়। ম্যাগডোনাল্ডকে সে ভালবেসে ফেলে। মনের মধ্যে প্রেমপোকা কুরতে থাকে। অমোঘ পরিণতির জন্য অশেষ যন্ত্রণার সঙ্গে তার নীরব অপেক্ষা তখন। হ্যালিফাক্সের খৃস্টান মিশনারী স্কুলের কঠিন নিয়মকানুন, আত্মানুশাসন এবং সংযমের সব শিক্ষাই তার কাছে মূল্যহীন হয়ে গেল। ব্রহ্মচারিণী হওয়ার ব্রত, ঈশ্বরের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করার সঙ্কল্প, জীবনের আমোদ-প্রমোদ, সর্বপ্রকার সুখ-আরাম বর্জন করে সন্ন্যাসিনীর মত জীবনাপন করার মধ্যে কোনো পূণ্য কিংবা মানসিক মুক্তি নেই। ভালবাসার ছোঁয়া লেগে মনের আগল খুলে গেল। একমাত্র একজন পছন্দের মানুষের মধ্যে নিঃশেষ নিজেকে ঢেলে দিয়ে ভরে ওঠার মধ্যে প্রকৃত মুক্তি নিহিত। মানুষের যা কিছু সুখের, আনন্দের, গর্বের তা তার প্রেম নিয়ে। প্রেমই জীবন। এমন করে আর কোনো সুখ এবং মুক্তির আনন্দ তারা আট-ন'বছর সমাজ সেবামূলক কাজের মধ্যে চুম্বকের মত আকর্ষণ করিনি। ম্যাকডোনাল্ডের ভালবাসার আলো পড়ে মার্গারেটের মনে হল, একজন পুরুষ ও নারী আসক্ত হয়ে পরস্পরকে ভালবাসবে, এটাই বিশ্ববিধান। ঈশ্বরের এই বিধানকে গলা টিপে মেরে ফেলার নামই ধর্মীয় শিক্ষা। ভালবাসা পাপ নয়, অধর্ম নয়, কোনো অন্যায় কাজও নয়। তবু হ্যালিফ্যাক্সের শিক্ষায় তার ওপরই সবিশেষ জোর দেয়া হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য, মার্গারেটের মনে ম্যাগডোনাল্ডকে ভালবাসার জন্য পাপবোধ কিংবা অনুতাপ, অনুশোচনা ছিল না। বরং বারংবার মনে হয়েছিল ভালবাসা কে দিয়েছে এই বুকে? ঈশ্বর—ভালবাসাই ঈশ্বর। তার নিজের চোখই

নিজের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়েছে, এর মধ্যেই পৃথিবীর রূপ, রঙ, চেহারা তার কাছে বদলে গেছে।

ম্যাকডোনাল্ডের কথা একা একা বসে ভাবতে ভাল লাগত। কথার যাদুকর। কথা দিয়েই আকাশে প্রেমের রামধনু সৃষ্টি করতে পারত। তার সুধা ঝরানো কথায় মন ভরে যেত! কতদিন কতভাবে ম্যাকডোনাল্ড বলত ঃ আপনি চলে গেলে মনে হত কী যেন আমার চুরি হয়ে গেল। যতবারই আপনি ব্যাঙ্কের কাজে আসেন ততবারই এই কথা মনে হয়। আপনি নিজেও তা জানেন না। আপনি চলে গিয়েও আপনাকে রেখে যান আমার কাছে অনেকক্ষণ। আপনি ভীষণ খারাপ। কিন্তু নিষ্ঠুর নন।

এসব কথা শোনার পর কারো মন স্থির থাকে? সাবধানী হয়েও নিজেকে লুকোতে পারল না সে। প্রত্যুত্তরে বলল ঃ আমি খুব সাধারণ মেয়ে। আমার মধ্যে আপনি কি দেখেছেন আপনিই জানেন? আমার প্রত্যাশা খুবই কম। চাওয়ার পৃথিবীটাও ছোট।

তারপর কয়েকটা মুহূর্ত থেমে ঢোক গিলে লাজুক গলায় অস্ফুটস্বরে কেটে কেটে বলল ঃ সাদাসিদে একটা মানুষ তার মতন করে আমাকে ভালবাসুক। তার নিজের করে নিক। তাহলেই তার প্রেমে ভরন্ত কলসের মত ভরে ওঠব আমি।

ওরা বিয়ে করবে বলে স্থির করল। কিন্তু সেই শুভ দিনটি মার্গারেটের জীবনে এল না। তার আগেই অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করল ম্যাগডোনাল্ড। মার্গারেটের কানে সে সংবাদ পৌঁছল। স্তম্ভিত হল সে। বুকখানা তার গুঁড়িয়ে গেল। মাথাটা ঝিম ঝিম করছিল। চোখে কিছু দেখছিল না। কানে সুধা ঝরানো কথাগুলো অজস্র প্রলাপের মত শুনছিল। পিপাসিত অনুভূতির প্রতিটি রন্ধ্র দিয়ে অনুভব করছিল তার অশেষ বেদনা। মনে হল, তার পায়ের তলায় মাটি নেই, মাথার ওপর ছাদ নেই। ত্রিশঙ্কুর মত শূণ্যে ঝুলছে। মুখে থমথমিয়ে ওঠল কান্না। চাপা ফোঁপানির শব্দ শোনা গেল। মনে মনে ভাবল, তার প্রতি যার এত উপেক্ষা, উদাসীনতা, যে তাকে এত অপমান করল তাকে যদি মুখের ওপর বলতে পারত—স্বেচ্ছায় আমিও তোমার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করলাম। আমরা আর প্রেমিক-প্রেমিকা নই। তাহলে একটু স্বস্তি পেত। তা যখন হল না তখন নিজেকেই তেজের সঙ্গে শোনাল ঃ তোমাকে চিনতে ভুল হয়েছে আমার। যে পুরুষকে আমি স্বপ্নে দেখতাম, সে তুমি নও। সে এক অপাপবিদ্ধ দুর্মর সাহসী, বিশ্বজয়ী মানুষ। আমার স্বপ্নেই সে আছে। আমার স্বপ্ন থেকে কোনোদিন তাকে চুরি করতে পারবে না। তবু আমার জীবনটা কেমন গোলমাল

হয়ে গেল। দুঃসহ অপমানে এবং আত্মগ্লানিতে তার হৃদয় মথিত ও ব্যথিত হতে লাগল। চোখ ভরে জল নামল।

মাত্র কয়েকমাস আগের ঘটনা। তবু মার্গারেট স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল তাদের, দোতলার ছোট্ট একটা কুঠুরীতে ঘরকন্নার কাজে ব্যস্ত মেরীকে। ছোট থেকে মেরীকে ভয় পেয়ে এসেছে, বড় হয়েও সেই ভয়টা তার কাটল না। প্রখর বুদ্ধিমতী মেয়ে, সর্বদা কাছে কাছে থাকে। তাই খুব সাবধান থাকতে হয় মার্গারেটকে। কিন্তু কিছুতে চোখের জল সামলাতে পারে না। মুখ চোখে যে কষ্টের ছাপ এবং প্রত্যাখ্যাত হওয়া অপমানের যন্ত্রণার ভয়াবহতা ফুটে ওঠেছিল পাছে তা নিয়ে মেরী কোন প্রশ্ন করে তাই শরীর খারাপের অছিলায় চোখ বুজে বিছানায় শুয়ে রইল। রিচমণ্ড, ইসাবেল তার দিকে উৎকর্ণ হয়ে চেয়েছিল। এদের কারো সাহস হল না কী হয়েছে জিগ্যেস করার।

কেবল মেরী ঘর গেরস্থালির কাজ করতে করতে মার্গারেটকে শুনিয়ে বলল ঃ তুই ভীষণ বোকা। ওই স্কাউণ্ড্রেল ম্যাকডোনাল্ডকে কেউ বিশ্বাস করে। একটা লোফার, ট্রেচারাস, হামবার্গ, কী করে ওকে পছন্দ হল তোর? ওরে রেপুটেশন কী? তোর পাশে মানায় ওকে?

মার্গারেট চুপ করে শুনল। একবারও বলল না, দোষ ওর একার নয় ; দোষ আমারও। ভালবাসা কি মানুষ ইচ্ছে করে, চেষ্টা করে বাসতে পারে? ভালবাসা হয়ে যায়, ঘটে যায়? যখন তা ঘটে, তখন এসব বিচার করার প্রশ্ন থাকে না। যা অবধারিত তাইই ঘটতে থাকে। আমার বেলাতেও তাই হয়েছে। এ আমার নিয়তি। আমার কর্মফল। আমার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত তো আমাকেই করতে হবে।

জ্বালা ধরা চোখে মেরী একবার তার দিকে তাকিয়ে দেখল। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল ঃ ঈশ্বর যাই করেন তার পিছনে যুক্তি নিশ্চয়ই থাকে। হ্যালিফ্যাক্স স্কুলের মিস্ট্রেস মিস কলিনস প্রায়ই এই কথাটা বলতেন। তাঁর যুক্তি আমাদের মোটা বুদ্ধি আর অদূরদৃষ্টি চোখ ও বোধ দিয়ে বুঝতে পারি না। সমস্তরকম সুখ দুঃখ, বেদনা-যন্ত্রণার অনুভূতির মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পেছনে কোনো না কোনো গভীর উদ্দেশ্য হয়তো আছেই। তাঁকে বা তাঁর স্বরূপকে বোঝার ক্ষমতা নেই বলেই হয়তো ভাবি ঈশ্বর নিষ্ঠুর। এসবই অভিজ্ঞতার কথা। জীবনের সব ধরনের অভিজ্ঞতা আগে অন্য কোনো না কোনো মানুষের হয়েছিল বলেই তা থেকে কথাটার উদ্ভব।

কিছুক্ষণ নিঝুম হয়ে বসে রইল মার্গারেট। মেরী কাজের ভেতর আড়চোখে তার অবস্থা লক্ষ্য করল। স্খলিত কণ্ঠে হঠাৎ বলল ঃ ওভাবে আমাকে দেখার কী আছে?

মার্গারেটের দু'চোখের চাহনিতে কেমন একটা দিশাহারা ভাব। শরীরটা হাল্কা, মাথাটা শূন্য। ভারী এক অদ্ভুত অবস্থা। নিঃশব্দে বিছানা থেকে ওঠে গিয়ে ঘরের এক কোণ থেকে একটা স্যুটকেশ নিল। খাটের ওপর বাক্সটাকে খুলল। তারপর প্রয়োজনীয় কিছু জামা কাপড় গুছিয়ে নিল। মেরী অবাক হয়ে তার কাণ্ড দেখছিল। একসময় তার দিকে দু'পা এগিয়ে এসে বলল ঃ এ আবার কোন নাটক?

খুব আস্তে মার্গারেট তার দিকে মুখটা ফেরাল। বড় বড় দু'চোখে নিষ্পলক দৃষ্টি। কোনো বিস্ময় নয়, কেমন শূণ্য।

মেরীর দু'চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছিল। ঠোঁট কাঁপছিল। তারপরই হঠাৎ শব্দ করে কেঁদে ওঠল। মাথা নেড়ে ব্যাকুলভাবে বলল ঃ দিদি, তুই যেন হঠাৎ কী হয়ে গেলি? তোর দিকে তাকালে বুক ফেটে যায়। বাড়ীর সকলের মনে কষ্ট।

জানলাম। মার্গারেটের কণ্ঠস্বর ভাবলেশহীন।

মেরী দুটো চোখ হঠাৎ টলটল করে ওঠল জলে। স্খলিত ভেজা গলায় বলল ঃ যে স্কুল ছিল তোর প্রাণ, একদিন না গিয়ে থাকতে পারিস না, সে স্কুলের প্রতি কোনা আকর্ষণ নেই তোর। এরকম হল কেন? কতদূরের মানুষ যেন তুই। রাগে, দুঃখে অভিমানে যদি কিছু বলেই থাকি, তাই বলে এমন করে আমাদের ছেড়ে যাবি। কষ্ট হবে না তোর।

একথায় মার্গারেট কেমন যেন বিকল হয়ে গেল। মেরী এখন তেমনি ছোট আছে। এখনও অবুঝ। তাঁব দু'কাঁধে হাত রেখে বলল ঃ তোদের ছেড়ে কোথায় যাব? মনটা ভাল নেই। হ্যালিফ্যাক্স স্কুলের শিক্ষিকা মিস কলিনস'এর নাম শোনা থেকেই তার কাছে যাওয়ার জন্য ভেতরটা আকুল হয়েছে। আমার আর্ত মনটা সস্নেহ ভালবাসার আশ্রয় খুঁজছে। মনটা হঠাৎই তাঁর জন্য কাঙাল হয়েছে। একবার তার কাছে যেতে চাই। এখুনি বেড়িয়ে পড়লে দুপুরের ট্রেনটা পাব।

মেরী একথার জবাব দিল না। জবাব দেওয়ার মত অবস্থা ছিল না তার। দৌড়ে গিয়ে বিছানার ওপর উপুর হয়ে পড়ল। তারপর কান্নায় ভেঙে পড়ল।

কিছুক্ষণ চুপ করে দৃশ্যটা দেখল মার্গারেট। কিন্তু মেরীর কাছে যাওয়ার কোনো উৎসাহবোধ করল না। বন্ধ দরজাটা খুলে ধীরে ধীরে দৃঢ় পদক্ষেপে হেঁটে একটা একটা করে সিঁড়ির ধাপে পা ফেলতে থাকল।

ট্রেনে জানলার ধারে বসল মার্গারেট। বাইরের দিকে চোখ দুটো ছড়িয়ে দিয়ে বসে রইল। শূন্য দৃষ্টি। মাথার ভেতরটাও ফাঁকা। পথের ধারে গাছ-পালা,

মাঠ, দিগন্ত, শস্যক্ষেত্র, জনপদ চোখের ওপর দিয়ে স্রোতের মত ধেয়ে যাচ্ছিল। আর লোভীর মত সে তাকিয়েছিল কিন্তু **কিছুই** দেখছিল না। পাখি উড়ে যাচ্ছিল আকাশের মাঝ বরাবর। খুব ভাল লাগছিল মার্গারেটের। একটু একটু করে হারিয়ে যাওয়া জীবনের রূপ, রঙ, শব্দ চেতনার মধ্যে সজীব হয়ে ওঠল। আর সে আঠারো বছর আগের জীবনের মধ্যে প্রবেশ করল। কী আশ্চর্য, হ্যালিফ্যাক্সের স্কুল স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল। ছাত্রীজীবনের মূল্যবান ছ'টি বছর এখানে কেটেছিল তার।

হাতে বই নিয়ে একটা ওক গাছের নিচে বসে আছে সে। তাকে ঘিরে অনেক বান্ধবী, শিক্ষায়িত্রী মিস ল্যারেট, মিস কলিন্স। ছবিগুলো সব ঝাপ্সা। কারো মুখ স্পষ্ট নয়। বুকের মধ্যে তাদের কথাগুলো জলপ্রপাতের শব্দের মত বাজছিল। আর আশ্চর্য লাগছিল, কখনও প্রিয় শিক্ষায়িত্রী মিস ল্যারেট, কখনও মিস কলিন্স এর সঙ্গে সে কথা বলছে। তাদের কথোপকথন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল সে। আর হাসতে হাসতে হয়রান হয়ে যাচ্ছিল।

মার্গারেট তন্ময় হয়ে চেয়েছিল বাইরের দিকে। পথের ধারে গাছপালা মাঠ, দিগন্ত জনপদ সবকিছু পিছনে ফেলে গাড়ী ছুটছিল। দৃশ্যগুলো পিছনে পিছনে যাচ্ছিল চোখের ওপর দিয়ে। তবু লোভীর মত তাকিয়েছিল সে দিকে। অজ্ঞাতসারে নিজের মনেই হাসছিল—স্মিত হাসি। আর সে ফিরে যাচ্ছিল হ্যালিফ্যাক্স স্কুলের ছাত্রীজীবনে।

পিতৃবিয়োগের অল্পকাল পরে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে তারা দুই বোন ভর্তি হল হ্যালিফ্যাক্সের স্কুল। জেলখানার মত পাঁচিল ঘেরা বাড়ী। মেয়েদের পরনে শাদা পাড়ের নীল ইউনিফর্ম। উন্মুক্ত পরিবেশ, প্রচুর আলো হাওয়া, বিশাল কম্পাউন্ড, সাজানো উদ্যান, বন্ধুদের সঙ্গে মনের খুশিতে খেলাধূলা করা অনেক কিছুই মার্গারেটের চোখের তারায় ভেসে ওঠল। আর সে ঐ দিনগুলোর মধ্যে অনবরত প্রবেশ করতে লাগল।

প্রধান শিক্ষিকা মিস ল্যারেটর মুখ মনে পড়ল। মহিলা ছিলেন অত্যন্ত কড়া মনের মানুষ। চার্চের নিয়ম-নীতি মেনে চলতে অভ্যস্ত। একটুও এধার ওধার করার উপায় ছিল না কারো। ধর্মযাজকের মেয়ে হওয়ার জন্য মার্গারেটের কোনো অসুবিধা হয়নি। তবু এক দিনের ঘটনা তার মনে রেখাপাত করেছিল। কৈশোরের সে মুখখানা আজও দেখতে পায়। একরাশ সোনালী চুলে ঘেরা ফুটফুটে মুখখানার অপরূপ শ্রী পাছে তাকে রূপসচেতন গর্বিত রমণী করে তাই মিস ল্যারেট নাপিত ডেকে এনে বলল ঃ তোমার চুলগুলো কেটে ও ছোট করে দেবে, এক বছরের আগে চুল রাখতে পারবে না। মার্গারেট

প্রতিবাদ করল না। মিস ল্যারেটর প্রতি সেজন্য কোনো অশ্রদ্ধা কিংবা ক্ষোভ ছিল না তার।

একদিন মিস ল্যারেটর ঘরে তার ডাক পড়ল। দুরু দুরু বুকে মার্গারেট তাঁর কক্ষে প্রবেশ করল। মিল ল্যারেট তাকে হাত ধরে চেয়ারের সামনে বসিয়ে দিল। মার্গারেটের মুখে কথা ফোটে না। যারা ছায়া দেখলে ভয়ে বুক কাঁপে সেই মানুষটি সমাদর করে তাকে সামনে বসিয়ে এ কী কৌতুক করছে! ওঁর মুখোমুখি বসে থাকতে থাকতে তার গায়ের রোমগুলো সব সোজা হয়ে ওঠল। শরীরের সব পেশী টানটান হল।

বেশ কিছুক্ষণ পর ল্যারেটর বলল ঃ মার্গারেট কাল আমার এই চেয়ারে অন্য একজন শিক্ষিকা বসবেন। তাঁকে তোমার কথা বলেছি। চার্চের কঠোর বিধি বিধানের মধ্যে তোমাকে যা দিতে পারিনি, তিনি তা দেবেন। অন্য ধরণের মানুষ তিনি। মিস কলিনশ অবশ্য তোমাদের বিজ্ঞান পড়াবেন কিন্তু মনের দিক দিয়ে তিনি কলারসিক। সাহিত্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে তাঁর গভীর অনুরাগ। তাঁর কাছে অনেক কিছু নেয়ার আছে। তোমার মতই মুক্ত মনের মানুষ। আমি তো তোমার সঙ্গে রূঢ় আচরণ করেছি শুধু। তোমার মত করে তোমাকে তৈরি করিনি। এই আপশোষ মরলেও আমার যাবে না। আজ তোমার কাছে অকপট চিত্তে দোষ স্বীকার করতে লজ্জা হওয়ায় বদলে গর্ব হচ্ছে। মিস ল্যারেটর গলার স্বর কাঁপছিল।

লাজুক অপ্রতিভতায় মার্গারেট মাথা হেঁট করে রইল। আশ্চর্য এক গভীর কৃতজ্ঞতায় তার অন্তঃকরণ ভরে ওঠল। ধীরে ধীরে বলল ঃ ম্যাডাম, আপনি অন্যায় কিছু করেননি। আমরা যারা অন্যায় করেছি, তাদের দোষ ত্রুটি শুধরে দেয়ার জন্য শাস্তিযোগ্য শিক্ষা দিয়েছেন। আমাদের সবচেয়ে বড় জোর সেইটাই। আপনি তো বলতেন সত্যের জন্য মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর জন্য কিছু নীতি শিক্ষা করতে হয়। নৈতিক শিক্ষার জোরই তো আসল জোর। এই জোরে যে লড়াই করে ঈশ্বর তাকে পুরস্কৃত করে।

মিস ল্যারেট চুপ করে রইল। হয়তো এত গভীর করে ব্যাপারটা ভেবে দেখিনি কোনো দিন। তাই বোধ হয়, মার্গারেটের দু'চোখের গভীরে নিজের চোখ দুটি ডুবিয়ে দিয়ে এক অশেষ কৃতজ্ঞতায় স্থির হয়ে রইল।

ষোলো বছর আগের ঘটনাগুলো যে এতগভীর করে মনের মধ্যে বর্তমান ছিল মার্গারেটের জানা ছিল না। ট্রেনে যেতে যেতে মনের অভ্যন্তর থেকে ওঠে আসা এক তীক্ষ্ণ অনুভূতিতে মনে হল পৃথিবীটা অসাধারণ সুন্দর। বাইরে আলো-ছায়া, গাছ-গাছালি, মেঘ-রোদ্দুর, পাখির ডাক, আকাশের নীল সবই

সুন্দর। চারধারে এত গান, এত হাসি এত চোখ কাড়া সব দৃশ্য, কান ভরা সব সুর যে তারা ভুলে থাকতে দেয় না অতীতকে।

মার্গারেটের মনে পড়ে না সেটা কোন দিন ছিল। মিস ল্যারেটর জায়গায় মিস কলিনস এলেন। প্রার্থনা হলে সমবেত ছাত্রীদের মাঝখানে একজন সুন্দর মহিলা এসে দাঁড়ালেন। উনিই মিস কলিনস। মঞ্চে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ মাই চাইল্ড, আমার কাছে তোমরা কি জানতে চাও বল।

প্রশ্ন করার বদলে ছাত্রীরী তাঁর মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ সময় কেটে গেলে বললেন, তোমাদের জানতে ইচ্ছে করে না।

মার্গারেট হাত তুলে বলল ঃ ম্যাডাম, আমি কিছু বলতে চাই।

মিস্ কলিনস তাকে মঞ্চে ডেকে নিল। মার্গারেট মুহূর্তে তার আড়ষ্টভাবটা কাটিয়ে নিয়ে বলল ঃ ম্যাডাম, ঘরে বাইরে মেয়েদের মুখ বুজে শোনাটাই নিয়ম। মেয়েদের কথা কেউ শুনতে চায় না। এই প্রথম একজন মহিলাকে দেখলুম উপদেশের সুধা বর্ষণ না করে অন্যের কথা শোনার জন্য কান পেতে আছেন। জিগ্যেস করার অভ্যাসটাই আমাদের নেই। আমাদের অধিকার কতটুকু, তাও ভাল করে জানি না। আমার বান্ধবীদের প্রশ্ন করার ইচ্ছে হলেও সাহস হয় না। আমি এদের বাইরে নই। কিন্তু একটু অন্যরকম। এ স্কুলে দিদিমণিরা যে সব দুষ্টু মেয়েদের কথা বলে তাদের একজন আমি। ম্যাডাম, কত কি জানতে ইচ্ছে করে তা আপনাকে বোঝাতে পারব না। বলার অধিকার দিয়ে আপনি আমাকে কৃতজ্ঞ করলেন। আপনার কাছে একটাই প্রশ্ন। বহু যুগের সঞ্চিত নিষেধের প্রভাব আমাদের রক্তস্রোতে বইছে, একে পার হওয়া কী দুষ্কর? চার্চ পরিচালিত স্কুলগুলো সহস্র নিষেধের বাঁধনে বেঁধে মেয়েদের শাসন করে নারীর কি উপকার করেছে? একজন মেয়ে প্রতিনিধি হয়ে বলুন সামাজিক মুক্তির জন্য চার্চ কী করেছে? অথচ সব দেশের শাস্ত্র, বিধি বিধান প্রতিনিয়ত বলছে, মানবতার মহাযজ্ঞে নারী পুরোহিত। মানুষের কাছে অমৃতপাত্র তারাই বহন করে আনে। তাই যদি হয় নারীকে নরকের দ্বার বলা হল কেন? সমাজে, সংসারে, চার্চে নারীর অধিকার কেড়ে নেওয়া হল কেন?

মিস কলিনসের মুখে টেপা হাসি। মার্গারেটের পিঠে একখানা হাত রেখে সস্নেহে বললেন ঃ মার্গারেট তুমি একদিনেই আমার হৃদয় জয় করে নিলে। এমন কঠিন প্রশ্ন তোমার বয়সের মেয়ের মুখ থেকে শুনব আশা করিনি। তবু তোমার প্রশ্নের উত্তরে বলি ; সব কিছুর নেগেটিভ এবং পজেটিভ দুটো দিক আছে। ইংরেজীর ছয় সংখ্যা ওলটে ধরলে নয় হয়ে যায়, আবার নয় ছয় হয়ে যায়। উপস্থাপনের কৌশলে তার চরিত্র ও বক্তব্য বদলে যায়। সমাজ এবং

চার্চ নারীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের বিরুদ্ধে নয়। কিন্তু পুরুষ প্রভাবিত সমাজব্যবস্থা নারীর আত্মবিকাশের অধিকার হরণ করেছে। বিধি-বিধানের শৃঙ্খলে তার সব অধিকারকে শৃঙ্খলিত করেছে। বোধহয় জীবকুলের ধাত্রী ও জননীকে বিধাতাও পুরুষের মত স্বাধীন, স্বার্থপর দায়িত্বহীন করেনি। জীবকুলের যে ধাত্রী ও জননী তাকে তো মমতাহীন, নিষ্ঠুর হলে চলে না। তাহলে বিধাতার দুনিয়াকে রক্ষা করবে কে? রক্ষাকর্ত্রীকে তাই নির্যাতন, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা সহ্য করার শক্তিতে ধৈর্যশীলা করেছেন। স্নেহ, প্রেম, মমতা, ভালোবাসা কেবল জীবধাত্রী ও জননীর বুকে আছে। এই শক্তিতে শ্রী ও শক্তিমান হওয়া নারীর জন্মগত অধিকার। পুরুষের সাধ্য নেই সে অধিকার কেড়ে নেওয়া। তাই তো সব দেশের শাস্ত্র ও ধর্মগ্রন্থ বলেছে ঈশ্বরের বিশ্বসৃষ্টির মহাযজ্ঞের পুরোহিত নারী। বিশ্বের সব জীবের কাছে অমৃতের পাত্র বহন করে আনে তারা। পুরুষকে ঈশ্বর লাগাম ছাড়া জীব করেছে। পশুজগতে একজন বাঘ কিংবা সিংহের সন্তানের প্রতি কোনো মমতা নেই, দায়িত্ব নেই। কিন্তু বাঘিনী কিংবা সিংহী সন্তানকে রক্ষা করে, পালন করে এবং জীবনযুদ্ধে টিঁকে থাকার শিক্ষা দেওয়ার কর্তব্য ও দায়িত্ব একাই করে। জীবজগতের সেই সহজাত প্রবণতা মানবী মায়ের ক্ষেত্রেও সত্য। এটাই জীবজগতে স্ত্রী জাতির বৈশিষ্ট্য। একে অতিক্রম করতে পারে না বলেই পুরুষের সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতায় নারীকে পিছিয়ে পড়তে হল। গৃহজীবনের শান্ত, শৃঙ্খলাপূর্ণ এক জীবনবোধের দ্বারা নারী চালিত হল। একেই তার অধিকার বলে জানল। নারী অধিকার বলতে দায়িত্ব ও কর্তব্য বোঝে। সব যুগে নারীর দায়িত্ব গভীর। সুষ্ঠভাবে এই দায়িত্ব পালন করে নারীই পারে শান্তিপূর্ণ সামাজিক ও মানবিক এক বিপ্লব ঘটাতে। গৃহের ওপর নারীর পূর্ণ অধিকার। অধিকার আদায়ের বীজ যতক্ষণ ঘরে ঘরে অঙ্কুরিত না হচ্ছে ততক্ষণ বড় বড় কথার ফানুস উড়িয়ে, পুরুষ কিংবা সমাজের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নারী কোনো কালে অর্জন করতে পারবে না। মাই চাইল্ড, চ্যারিটি বিগিনস এ্যাট হোম হওয়া সর্বাগ্রে দরকার। প্রত্যেক ঘরে মেয়ে এবং বউরা নারীর মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হলে এবং ঘরে ঘরে তার চাওয়াটা জোরদার হলে তবেই সমাজ থেকে তার অপপ্রভাবটা দূর হবে। নারী মুক্তির হাওয়া বইছে সর্বত্র। নারী যদি নিজে বাঁচতে না শেখে, বাইরের কোনো শক্তিই তাকে রক্ষা করতে পারবে না।

কথাগুলো ভীষণ ভাল লেগেছিল মার্গারেটের। প্রথম দিনেই মিস্ কলিনস তার শ্রদ্ধার পাত্রী হয়ে গেল। তাঁকে পেয়ে মার্গারেটের মন ভরে ওঠল। এই মহিলাই পারে তার মনের ক্ষুধা মেটাতে। মিস্ কলিনসও বুঝে নিল এই ছাত্রীটি

স্কুলের সকলের থেকে আলাদা। তার চিন্তাভাবনা জিজ্ঞাসা এত উঁচু স্তরের যে ওর বয়সের কোনো মেয়ের সঙ্গে ওকে মেলানো যায় না। তাই পৃথকভাবে তার দেখভাল করার জন্য দায়িত্ব নিজে নিলেন। মার্গারেটও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। অদ্ভুত অদ্ভুত সব প্রশ্ন তার মনকে ব্যাকুল করত। মিস কলিনস নিজের হেপাজতে রেখে ওকে শেখাতে লাগলেন কেমন করে মনকে বশে আনতে হয়। স্বাধীন চিন্তায় নিজস্ব মতামত কেমন করে গড়ে তুলতে হয়। ছাত্রী শিক্ষকের ব্যবধানটা ধীরে ধীরে ঘুচে যায়। শিক্ষিকা হয়ে ওঠেন একাধারে বান্ধবী এবং জননী। মার্গারেটের মনে কোনো সংকোচ নেই, দ্বিধা নেই। মুক্ত মন নিয়ে একদিন মিসেস কলিনসকে বলল ঃ ভগবান আছেন আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু আমি তাঁকে জানতে চাই, বুঝতে চাই।

মিস কলিনস তার প্রশ্নে একটুও অবাক হল না। অধ্যাত্ম জীবনের আদিপর্বে ভক্তের মনে যে সংশয়, দ্বিধা, উৎকণ্ঠা এবং ব্যাকুলতা দেখা যায় মার্গারেটের অন্তরে তার আকুলতা মিস কলিনসকে মুগ্ধ করল। হাজার হাজার নরনারীর মধ্যে খুব কম সংখ্যক মানুষই পার্থিব জীবনের চেয়ে উচ্চতর কোনো বিষয়ে জানতে আগ্রহী। মার্গারেটের জানতে চাওয়াটা গতানুগতিক নয়। ঈশ্বর সম্পর্কে সাধারণ বিশ্বাসে সে সন্তুষ্ট নয়। চার্চের ধ্যান ধারণা এবং সংস্কারের বাইরে সেই অসীম অবিনশ্বরের মধ্যে ঈশ্বরের যে অস্তিত্ব তাকেই খুঁজছে মনের অভ্যন্তরে।

বেশ কিছুক্ষণ সময় নিয়ে মিস কলিন্স বলল ঃ মানুষের, জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার ফলে বোধবুদ্ধি যত স্বচ্ছ হচ্ছে ততই সংশয় এবং অবিশ্বাস প্রবল হচ্ছে। এই বিচার বোধ থেকেই ঈশ্বর সম্পর্কে সন্দেহ এবং অবিশ্বাস আমাদের মধ্যে দানা বাঁধছে। কারণ, তাঁকে আমরা দেখতে পাই না। কেউ যদি প্রশ্ন করে তাঁকে কি জানতে পারি? কখনই না। তাঁকে জানা গেলে তিনি আর ঈশ্বর থাকতেন না। তাহলে, ঈশ্বর কি নেই? আছে। মানুষের বিশ্বাসে এবং মনে সেই ঈশ্বরকে অনুভব করা যায়। যেমন বাতাসকে চোখে দেখা যায় না, কিন্তু পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে তাকে ভীষণভাবে অনুভব করা যায়। শ্বাসরুদ্ধ করলে বাতাসের জন্য প্রাণটা হাঁফিয়ে ওঠে। বুক ভরে বাতাস নিয়ে যখন স্বস্তি পাই তখন বাতাস বলে কিছু আছে টের পাই। ঐ বাতাসের মতই ঈশ্বর পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন। যীশু বলেছেন স্বর্গরাজ্য তোমার মধ্যে রয়েছে। আবার নিউ টেস্টামেন্টে বলা হয়েছে—আমাদের পিতা যিনি স্বর্গে আছেন। পরস্পরবিরোধী এই দুই উক্তি মেলাবে কি করে? পরের কথাটা বলছেন অশিক্ষিত মানুষকে, যারা ধর্মের শিক্ষা পায়নি। তাই তাদের সঙ্গে তাদের ভাষায় কথা বলেছেন। সাধারণ লোক বাস্তব চিন্তাকে চায়, যা তারা ইন্দ্রিয় জ্ঞান দিয়ে বুঝতে পারে। কিন্তু মানুষ যখন

আধ্যাত্মিকতার উচ্চস্তরে পৌঁছয় তখন সে বোঝে স্বর্গরাজ্য তার অন্তরে রয়েছে। মনশ্চক্ষু দিয়ে তাকে দেখতে হয়, জানতে হয়। সব ধর্মে লক্ষ্য হল ঃ আত্মার মধ্যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা। তাঁকে লাভ করার শক্তি আমাদের অন্তরেই আছে। তাকে অনুভব করার একমাত্র উপায় হল তোমার নিজের অন্তরে আধ্যাত্মিকতার আলো জ্বালানো। বোধ ও বুদ্ধির এক উন্নতর অবস্থায় ঈশ্বর দর্শন হয়।

মার্গারেটের বুকের রক্তের কলধ্বনিতে তাঁর মধুস্রাবী কণ্ঠস্বর বাজতে লাগল তীব্র একটা আবেগে। তার চেতনা কেমন একটা অভিভূত আচ্ছন্নতায় আবিষ্ট হয়ে গেল। থমথমে গলায় প্রশ্ন করল ঃ সে আলো জ্বালব কী করে?

মিস্ কলিনস তার অনিন্দ্যসুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল ঃ তুমি যদি অন্ধকার ঘরে থাক তা-হলে হাজার চেঁচালেও ঘর আলো হবে না। তোমার নিজের হাতে আলো জ্বালানোর ব্যবস্থা করতে হবে। আলো জ্বাললে তবেই ঘরটি আলোকিত হবে। আর তখনই অবিশ্বাস, সন্দেহ, সংশয়ের সব অন্ধকার দূর হবে! তেমনি ঈশ্বব দর্শনের একমাত্র উপায় হল তোমার অন্তরে আধ্যাত্মিক আলো জ্বালানো।

ষোলো বছর আগের ঘটনা তবু হৃদয়ের ভেতর মিস কলিনসের কণ্ঠস্বর হৃদয়ের মধ্যে সেতারের মধুর ঝঙ্কারের মত বেজে যাচ্ছিল। থর থর করে কেঁপে ওঠল মার্গারেট। এখনও ষোলো বছর আগে শোনা বাইবেলের গল্পগুলি কত বিনিদ্র রজনীর স্বপ্নে তার সমস্ত চেতনার ভেতর, সত্তার ভেতর দেবীমূর্তির জ্যোর্তিশিখার মত জ্বল জ্বল করছিল—সুন্দরী ম্যাগডালার মিরিয়াম ; বারবিলাসিনী হতে বাধ্য হয়েছিল! কিন্তু সে মনে প্রাণে ভীষণভাবে বিশ্বাস করত যে, ন্যাজারথের জোসুয়ার কথাই সত্য। নিজেকে দিয়ে জেনেছে কোনো মানুষই পাপী হয়ে জন্মায় না, পরিস্থিতিতে পড়েই সে পাপাত্মা হয়। বাইরের কোন কিছুই মানুষকে অপবিত্র করতে পারে না, যে মন থেকে কুরুচি, কুচিন্তা, কুকার্য জন্ম হয় সে-সবই মানুষকে অপবিত্র করে। এই মন রাঙানো কথাগুলো তার মনের ঘরে ঘরে আলো জ্বেলেছিল। সমস্ত সত্তার ভেতর সেই জ্যোর্তিময় দিব্য পুরুষকে সে স্পষ্ট দেখতে পায়। প্রতিমুহূর্তের চিন্তায় আর স্বপ্নে ন্যাজারথের জোসুয়াকে দেখে, তার আহ্বান শুনতে পায়। বিশ্বাস করে একদিন তার সঙ্গে দেখা হবেই। হলোও তাই। ভক্ত যেমন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ঈশ্বর প্রণাম করে তেমনি করে জোসুয়ার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠল। চোখের জলে জোসুয়ার পা দুটো ভিজে গেল। আর মিরিয়াম রেশমের সোনালী চুল দিয়ে জোসুয়ার পা দুটো মুছিয়ে দিতে দিতে থরো থরো কান্নায় অস্ফুট স্বরে বলল ঃ আমি পাপী। নষ্ট মেয়ে—

সস্নেহে জোসুয়া তাকে মাটি থেকে দুহাতে তুলে ধরে স্বপ্নালু চোখ দুটো তার চোখের ওপর পেতে রাখল গভীর মায়ায়। মমতা মাখানো গলায় বলল ঃ তুমি আর অপবিত্র নেই। তোমার বিশ্বাস তোমাকে পরিত্রাণ করেছে। তোমার ভেতরে ঈশ্বর আছেন। অনুতাপের কান্নার ভেতর দিয়ে তোমাকে তিনি ক্ষমা করেছেন। তাঁর প্রেমে তোমার সব পাপ ধুয়ে মুছে গিয়েছে। পাপ থেকে তুমি মুক্তি পেয়েছ।

অমনি তার বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে ওঠল। তীব্র আনন্দে উত্তেজনায় থর থর কেঁপে ওঠল মিরিয়ম। প্রদীপের মত উজ্জ্বল হয়ে ওঠল তার মুখখানা। আর মুহূর্তে বদলে গেল তার ভেতরটা। এক অনির্বচনীয় সুখ আর পরিতৃপ্তিতে ভরে গেল তার মন। সমস্ত চেতনার ওপর নেমে এল এক বিভোর বিহ্বলতা।

হঠাৎই এক ভিক্ষুকিনী তার শুভ্র বর্ণের লোল চর্মসার মলিন হাতখানা তার সামনে বাড়িয়ে ধরে বলল ঃ মাই চাইল্ড, হেলপ মী, গড্ হেলপ ইউ।

অমনি তার আত্মমগ্নতার ঘোর কেটে গেল। মানি ব্যাগ থেকে খুচরো পয়সা বের করে তার হাতে দিল। সেই সময় গাড়ীটাও থামল ফ্লিটউড স্টেশনে। এখানে নেমে হ্যালিফ্যাক্সে যেতে হয়। তখন সন্ধের কুয়াশামাখা অন্ধকার ধীরে ধীরে গড়িয়ে আসছিল চারদিক থেকে। এক রহস্যময় কুহেলিকার মধ্যে হারিয়ে গেল দিনের আলোয় স্পষ্টতা। রাস্তার গ্যাসলাইটগুলো একে একে জ্বলে ওঠল। নতুন এক আনন্দে মার্গারেটের ভেতরটা খুশি হয়ে ওঠল।

চারপাশের নীরবতা, স্তব্ধতা, নীল ও গভীর আকাশ, দিগবলয়ে গাঢ় বন এবং গাছের মাথায় স্নিগ্ধ চাঁদের আলো এক অপরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্ট করল। বেশ একটা তৃপ্তিতে তার শরীর মন জুড়িয়ে যেতে লাগল। বোবা বিস্ময়ে শান্ত সুন্দর জায়গাটির চারদিক চেয়ে তার ষোলো বছর আগের জায়গাটিকে চোখ বুজে কিছুক্ষণ স্মরণ করল। তারপর একটা ছোট ফিটন গাড়িতে ওঠে বসল। মুগ্ধ বিভোর মার্গারেট নিস্তব্ধতাকে অনুভব করছিল। ফিটন গাড়ির মৃদু মন্দ শব্দ এবং ঝিঁঝির ডাক নিস্তব্ধতাকে গভীর এবং বিষণ্ণ করে তুলল। ম্যাকডোনাল্ডের সঙ্গে প্রণয়ের কত কথাই হঠাৎ মনে পড়ে গেল। বুকখানা ভীষণভাবে মোচড় দিয়ে ওঠল মার্গারেটের।

মিস কলিনস তার গলার স্বর শুনে দৌড়ে এসে বুকে জড়িয়ে ধরল তাকে। গদগদ কণ্ঠে বলল ঃ এতকাল পরে ম্যাডামকে মনে পড়ল?

বুকভাঙা কান্না মথিত গাঢ় ভাঙা ভাঙা স্বরে মার্গারেট উচ্চারণ করল ঃ ম্যাডাম।

দূর বোকা। কাঁদতে নেই। কেন কাঁদবি? কার জন্য কাঁদবি। যিনি তোকে দুঃখ দিয়েছেন তিনিই সহ্য করার শক্তিও দিয়েছেন। এ হল সাহসের সঙ্গে ভয়ঙ্করের মুখোমুখি হওয়ার শিক্ষা। পাগলী আমার! দুঃখটা আছে বলেই তো ব্যথাটাকে এমন করে টের পাস। দুর্ভাগ্য না থাকলে সৌভাগ্য কাকে বলে জানতে পারতিস। বিধাতার পৃথিবীতে কোনো কিছু অসুন্দর নয়। দুঃখও সুন্দর, ব্যথাও সুন্দর। একে অপরের পরিপূরক। একেকে বাদ দিয়ে অন্যকে জানা যায় না। তাই সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য, ভাল-মন্দ, আলো-ছায়া থাকবেই। জীবনে সুখ-দুঃখ, প্রেম-বিরহ, মান-অভিমান, লাভ-লোকসান নিয়ে তো জীবন। তবু এই চৌহদ্দির মধ্যে জীনবটা শেষ নয়। জীবন অনেক বড়। বিশাল জীবন হাতছানি দিয়ে নিরন্তর ডাকছে তোমাকে। তার ডাক শুনতে পাচ্ছ না। কিন্তু তোমার ভিতরে তার আয়োজনকে সম্পূর্ণ করার জন্য ঈশ্বর তোমাকে বড় দুঃখ দিতে চান।

মার্গারেট চুপ করে শুনল। রাতের শান্ত মন খারাপ করা আর্তি বুকে করে সে জানলা দিয়ে উজ্জ্বল তারাভরা স্নিগ্ধ নীল আকাশের দিকে চেয়ে রইল। মনে হল, নির্মেঘ আকাশ থেকে ঈশ্বরের লক্ষ লক্ষ চোখ হয়ে নক্ষত্রেরা তার দিকে চেয়ে আছে। চারদিকে নানারকম গাছ নীরব প্রহরীর মত তার পাহারায় দাঁড়িয়ে আছে যেন।

হাতমুখ ধুয়ে, বেশবাস বদলে একটু পরিচ্ছন্ন হয়ে মিস কলিনসের মুখোমুখি বসল মার্গারেট। ঘরে একটা নীলাভ আলো জ্বলছিল। পরিচারিকা দু'জনকে চা এবং হাল্কা খাবার দিয়ে গেল। মিস কলিনস বলল ঃ অনেকক্ষণ কিছু খাও না। মুখ শুকিয়ে গেছে। একটু জলযোগ কর। খেতে খেতে তোমার কথা শুনব।

দু'জনেই হাতে চায়ের পেয়ালা তুলে নিল। চায়ে চুমুক দিয়ে বেশ একটা তৃপ্তিকর স্বর তার কণ্ঠ থেকে বেরোল ঃ আঃ। দিল খুশ হয়ে গেল মাড্যাম।

মিস কলিনস বিস্কুটে কামড় দিয়ে জিজ্ঞাসু চোখে মার্গারেটের দিতে অপলক চেয়ে বলল ঃ কোথায় তোমার দুঃখ বল।

মার্গারেটের কথাগুলো ভীষণ মনোযোগ দিয়ে শুনল মিস কলিনস। কথার মধ্যে একটিও প্রশ্ন করল না তাকে। মার্গারেটের সুখ, আনন্দ, তৃপ্তি, দুঃখ, যন্ত্রণা, অপমান, অভিমানের কথাগুলোতে নানা শব্দ ও গন্ধর ছিটে, চেতনার চারদিকে তারাবাজি থেকে উৎক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গের মত ছিটকে উঠছিল। মিস কলিনসের গোটা হৃদয়খানা বাঁধা পড়ল তার অনুভূতির সঙ্গে।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল ঃ খুবই কষ্ট হওয়ার কথা তোমার। প্রেম বড়ই খারাপ অসুখ। প্রাণঘাতী অসুখ। জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে

আদম ইভের শরীরের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা জানোয়ারটা হঠাৎ জেগে ওঠে জানিয়ে দিল সুখ কি? দুঃখ কাকে বলে? কোথায় বন্ধন আর কোথায় মুক্তি তার তফাৎ জানল। জ্ঞানবৃক্ষের ফল না খেলে তাদের জানা হত না যে, সব কিছুর মধ্যে দিয়ে না গেলে-সমস্ত ভালমন্দ, সুখ দুঃখের মধ্য দিয়ে নিজেকে না নিয়ে গেলে জীবন বোধ হয় পূর্ণ হয় না। অনেক বাঁক, বাঁধা বিপত্তি পেরিয়ে এসে, অনেক হাসি-দুঃখ, ভয় আর আনন্দের উপত্যকা অতিক্রম করেই তবেই ক্ষীর সাগরে পড়তে হয়! এর কোনোটা অনর্থক নয়, সব কিছুর একটা মানে আছে। এজন্য হা হুতাশ করে নির্বোধ। একদিন সকলেই শিশু থাকে, তারপর বালক হয় ক্রমে কৈশোর, যৌবন, বার্দ্ধক্য আসে। দেহ ও মনের রূপান্তর এবং বোধ ও বুদ্ধির পরিবর্তন হয়। একটা জীবনের পূর্ণতা অর্জনের পথে এগুলি তার অংশ। অর্থাৎ একজন শিশুর মধ্যেই তার বার্দ্ধক্য লুকোনো আছে। তেমনি তোমার মধ্যে যে শক্তি লুকোনো আছে সেই শক্তির স্ফুরণ হয় কতকগুলো অবস্থার মধ্যে দিয়ে গেলে। তেমনি তোমার সঠিক প্রকাশকে, সঠিক জায়গায় পৌঁছে দেয়ার এগুলি হল ভূমিকা। তোমার জীবনে যে সব ঘটনা ঘটল তা সত্য থেকে সত্যে পৌঁছনোর এক একটি স্তর। প্রতিটি স্তরই সত্য। ঈশ্বর তোমাকে বৃহৎ কাজের জন্য প্রস্তুত করছেন। নইলে এত সাংগঠনিক কাজ এত অল্প বয়সে কোনো মেয়ে করতে পারে না। তুমি বোধ হয় নিবেদিত হতে এসেছ। তাই দু'দুবার বিয়ে করে ঘর সংসার করার স্বপ্ন নিষ্ফল হয়ে গেল তোমার। তুমিই যে তিনি—এই গভীর সত্যটাকে এভাবেই তো জানতে হয়। দুঃখের বেশে এসেছে বলে তাকে কি বরণ করবে না?

অবাক হল মার্গারেট। মিস কলিনসের মত এমন গভীর করে ওর ব্যর্থ জীবন নিয়ে ভাবেনি। ওর মত করে এরকম কথা ক'জনই বা বুঝতে পারে? এজন্য খুব গভীর জ্ঞানের দরকার হয় না। মায়ের দরদ তার নরম মমতা দিয়ে নানাবিধ ঘটনার তলায় চাপা পড়া আত্মার ঐশ্বর্যকে উদ্ধার করে আনল। উপাসিতের পায়ে তার মন ও সঙ্কল্পকে নিবেদিত করল। আর তাতেই তার ভেতরটা ভরে গেল। একবারও মনে হল না কী করে বাঁচবে সে জীবনে? ম্যাগডোনাল্ড হারিয়ে গেলে তার জীবনের কি থাকল? বাকি জীবনটা কাটবে কি করে? কেউ নেই, কিছুই নেই—এই শূন্যতাবোধে আকুল করল না তাকে। মিস্ কলিনস তাকে সত্যিকারের গভীর আনন্দের সন্ধান দিয়েছে। ঈশ্বরের সেবার জন্য যে নিবেদিত তার নিজের দুঃখ বলে যেমন কিছু থাকে না, তেমনি কিছু দাবি করারও থাকে না। তার প্রেম, মমতা, ভালবাসা একটু অন্যরকম। নিজেকে মুছে ফেলে অন্য মানুষ হয়ে ওঠতেও সময় লাগে।

মার্গারেটকে চুপ করে থাকতে দেখে মিস কলিনস বলল ঃ মার্গারেট, জীবনে বেশি মানুষই বাইরের, কোলাহলের মধ্যে সময়টুকু কাটিয়ে দেয়, ভিতরের ডাক তাই আর শোনা হয়ে ওঠে না। কিন্তু তুমি একটু অন্যরকম বলেই ভিতরের আহ্বান শোনার জন্য আকুল হয়েছে। ভাল আত্মা বোধ হয় একেই বলে।

মিস কলিনসের চোখের ওপর চোখ রেখে মার্গারেট চেয়ে থাকে অনেকক্ষণ। নিজেকে তার কেমন নতুন নতুন লাগছে।

মিস কলিনস ওর বিভোর দু'চোখের দিকে তাকিয়ে পুনরায় বলল ঃ মার্গারেট, আমার মন বলছে, এই আঘাত তোমার জীবনে খুব প্রয়োজন ছিল। বিচ্ছেদ মানুষকে দুঃসহ সুন্দর করে। ক'দিন ধরে এই কথাটা বারংবার মনে হচ্ছে। এই গভীর আঘাতে অন্তরে জ্যোতির উৎস খুলে যাবে, চিত্ত প্রশান্ত হলেই দিব্যজ্যোতির অনির্বচনীয় প্রসাদ সমস্ত হৃদয় দিয়ে অনুভব করবে তুমি।

মিস কলিনসের কথার মধ্যে কী ছিল মার্গারেট জানে না। কিন্তু মাথার মধ্যে সে ভার ভাবটা আর নেই। বেশ একটা স্বস্তি অনুভব করল। বুকখানা হাল্কা বোধ হল। মনটাও প্রশান্তিতে ভরে গেল। সামনে রাখা ছোট টেবিল থেকে একটা ম্যাগাজিন টেনে নিয়ে পাতা ওল্টাতে লাগল। কিছু দেখছিল না, পড়ছিলও না। বর্তমান থেকে অনেক দূরে একটা ব্যবধানের ওধারে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছিল—একটা দুঃখ ভরা, বেদনা ভরা হাসি ও আনন্দ ভরা স্বপ্নের ওধার।

মার্গারেট অন্যমনস্কভাবে মিস কলিনসের সামনে থেকে ওঠে বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়াল। অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ঘুম ছিল না চোখে। ঘুমের তাগিদও ছিল না। স্বপ্নাচ্ছন্নের মত সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। সমস্ত ঘরটা নিশি পাওয়া মানুষের মত আচ্ছন্ন হয়ে প্রদক্ষিণ করল! আয়নার সামনে বসল। নিজেকে অনেকক্ষণ ধরে নিরীক্ষণ করল। একমনে নিজের দিকে চেয়ে রইল। কিন্তু নিজের রূপ কিংবা প্রসাধন কিছুই দেখছিল না। তবু আয়নায় বসে মার্গারেট নিজের চোখের তারায় ম্যাগডোনাল্ডকেই খুঁজল। সত্যি কোথাও ছিল না সে। এমন করে আগে ভুলতে পারিনি তাকে। এই মুহূর্তে যা পারল তা কিছুক্ষণ আগে পারার কথা কি ভেবেছিল? তবে কি নিজেকে নিবেদিত হওয়ার পরীক্ষার বেড়াগুলি একে একে যত পেরিয়ে আসছিল ততই ভিতরে তার কোথায় যেন খালি খালি ঠেকছিল। এই মুহূর্তে হঠাৎ শূণ্যতাটাকে কে যেন কৌতুক হাসি দিয়ে ভরাট করে দিল।

হাসির দমকে মার্গারেট ড্রেসিং টেবিল ও দুই বাহুর ওপর মাথা গুঁজে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করল। তার সর্বাঙ্গ কেঁপে কেঁপে ফুলে ফুলে ওঠতে

লাগল। প্রথমে অল্প অল্প তারপর সবেগে। মার্গারেটের হাসিটা হঠাৎই কেমন করে যেন কোন পথে হারিয়ে গেল। কান্না এল বুক ভাসিয়ে।

মিস কলিনস দেখল, মার্গারেট কাঁদছে। নিঃশব্দে তার পাশে এসে দাঁড়াল। মার্গারেট অঝোরে কাঁদছে। কেঁদে কেঁদে নিঃশেষ হওয়ার পর সে একটু শান্ত হল।

মিস্ কলিনস তার মাথায় হাত রেখে মৃদুস্বরে ডাকল ঃ মাই পুওর চাইল্ড।

মিস কলিনসের কণ্ঠস্বর কানে আসতে মার্গারেট বিষম চমকে ওঠল। চকিতে ওঠে দাঁড়াল সে। সামনের একগোছা চুল মুখে এসে পড়েছিল। সেগুলোর সরানো ফাঁকে মুখ আড়াল করে নিজের অপ্রস্তুতভাবটা গোপন করে গলার স্বরে হাসি টেনে বিস্ময় প্রকাশ করে বলল ঃ ওমা! আপনি। মুখ না ফিরিয়ে বলল ঃ একটু দাঁড়ান, আমি এখনি চোখে জল দিয়ে আসছে।

মিস কলিনস বিমূঢ়ের মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। মার্গারেট তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে ফিরে এল। কলিনস চুপ করে তাকে দেখছিল। মুখ আড়াল করার জন্যই তোয়ালেটা গালের ওপর চেপে ধরল। মিস কলিনস ভূমিকা না করে বলল ঃ তুমি এড়িয়ে যেতে চাইলেও আমি তা হতে দেব না। দুঃখ, কষ্ট বেদনা, আঘাতকে জয় করার জন্য মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। সকলের সঙ্গে সমান হয়ে ওঠার জন্যই সবার পাশে বসতে হবে। সকলের সঙ্গে হাসতে হবে। পারবে তো।

মার্গারেট ঘাড় নেড়ে বলল ঃ পারব। আমাকে পারতেই হবে। মোহ যা ছিল ভেসে গেছে চোখের জলে। আর এখন আমার কোনো কষ্ট নেই। সময়ের জঠর থেকে নিজেকে উদ্ধার করে দিকে দিকে নিজেকে বিলিয়ে দেব। ম্যাডাম, আমি ভুলে গেছিলাম, গর্ভবস্থায় মা আমাকে দেবতার পায়ে সমর্পণ করেছিল। জন্মের কয়েকদিন পরে আমাদের বাড়ীর পরিচারিকা ম্যাগী তো চার্চে ক্যাথলিক মতে ব্যাপটাইজ করেছিল। জন্মের আগে থেকেই আমি নিবেদিত হয়ে আছি আমার বিয়ে করতে নেই, ঘর সংসারের স্বপ্ন দেখতে নেই। আমার রয়েছে শুধু বিশ্বলোক আর নরনারায়ণের সেবার অধিকার। তাই বোধ হয় বিধাতা মানুষের দুঃখ দেখার চোখ দিয়েছেন, দুঃখ অনুভব করার মন দিয়েছেন। বলতে বলতে নিজের মনেই হাসতে লাগল সে। হুঁস ছিল না তাঁর।

মিস কলিনসের মনে হল তার হাসিটা একটুও স্বাভাবিক নয়। বুকের ভেতরটা তাঁর মোচড় দিয়ে ওঠল। বেশ একটা আস্বাচ্ছন্দ্যবোধ করল। তাড়াতাড়ি মার্গারেটের কাঁধটা চেপে ধরল। সে হাতের ছোঁয়ায় মার্গারেটের সর্বাঙ্গে তড়িৎ খেলে গেল। আচমকাভাবে নিজেকে সহজে সামলে নিয়ে তাকাল

তাঁর দিকে। হুঁশ হল, সে হাসছে না, কাঁদছে। চোখের জল মোছার কোনো চেষ্টা করল না। নির্বাক নিষ্পলক দৃষ্টি বিনিময় হল। উভয়েই চেয়ে আছে দু'জনের দিকে। অনেক মুহূর্ত কেটে গেল।

মার্গারেটের এমন পাথর মূর্তি আগে দেখিনি মিস কলিনস। মৃদুকণ্ঠে বলল ঃ আমার দুঃখ শুধু এই যে তোমার এত কষ্ট আমায় দেখতে হচ্ছে। কিন্তু জানো আমার মনে হয় তোমার ভালোই হবে, আমি বরাবর দেখে আসছি তোমার জীবনের ভিতরে একটা উদ্দেশ্য কাজ করছে। আর কোনো শক্তি তোমায় ডাকছে অজ্ঞাত ভবিষ্যতের দিকে।

মিস কলিনসের ঘরে কদিন থাকার পর অনুভব করল তার ভেতরটা বদলে যাচ্ছে। আগুন যেমন জলকে বদলে বাষ্প করে দেয় তেমনি একটা পরিবর্তন অনুভব করল। মিস কলিনসের কথাগুলো মন্ত্রাবিষ্ট করে রাখল তাকে। মিথ্যের দরজা দিয়ে কখনো সত্যের সামনে পৌঁছনো যায় না। মিথ্যের জঞ্জালে সত্যের মুখ যখন ঢাকা পড়ে যায় তখন এক বড় সত্যের ঢাক্কায় জঞ্জালের দেয়াল ভেঙে পড়ে। সে যা হতে চায় তাকে যথাস্থানে বেখে তার মাধুর্য বিকাশ করে। তুমি যে মানুষের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পেয়েছিলে সে তোমার ভ্রান্তি। কী করে সে সম্পূর্ণতা পাবে তোমার ভেতর, পাহারাদার মনটা একটু একটু করে প্রেমাস্পদের কাছ থেকে তোমাকে গুটিয়ে নিয়েছে। বাইরে থেকে তুমি তা টের পাওনি। যখন জানলে তোমার বুকের ভেতরটা আগুন ধরে গেছে। সে আগুনে পুড়ে তুমি খাঁটি হয়েছে। তোমার যে নবজন্ম হল দু'দিন পরেই টের পাবে। মার্গারেট আমরা নিজেরা কি কিছু করি? না, আমরা সূত্রবদ্ধ ক্রীড়নক। একদিন যার অঙ্কুর পর্যন্ত ছিল না হঠাৎ সে কি করে এত বড় হয়ে দাঁড়াল। সত্যের সঙ্গে ভেজাল মিশে ছিল বলেই তো দুঃখ যন্ত্রণার কষ্ট পেলে?

ভিতরে ভিতরে একটা মানসিক পরিবর্তন আসছিল তার। চেনা হ্যালিফ্যাক্সের শহরে অনির্দ্দিষ্টের মতই ঘোরাঘুরি করে। কত কি দেখে। হৃদয় দুমড়ে দেওয়া চিন্তাগুলো মন থেকে মুছে যায়। অনেক অনুভূতি জাগে যা আগে কখনো মনে হয়নি। বঞ্চিত প্রেমের এই পরিণামের মধ্যে সত্যি কোনো সৌন্দর্য তো নেই, সত্যম শিবম সুন্দরম-এর শিবও নেই সুন্দরও নেই। সৌন্দর্য ছাড়া সত্যের রূপ ভয়ঙ্কর। প্রেমের মধ্যে যদি সৌন্দর্য ফুরিয়ে যায় তা-হলে রইল কি? মার্গারেট সমস্ত অনুভূতি দিয়ে প্রথম উপলব্ধি করল সুখ বাহিরের কোনো অবস্থায় বা বস্তুতে নেই, অন্তরে তার আয়োজন সুসম্পূর্ণ থাকলে তবেই বাইরের স্পর্শে তা উচ্ছ্বসিত হতে পারে!

মার্গারেটের ভিতরটা তোলপাড় হয়। রাত্রিবেলাটা বড় নিঃসঙ্গ লাগে। ফায়ার প্লেসের পাশে মিস কলিনসের সঙ্গে বসে থাকে। মাঝে মাঝে দু'চারটা কথা বলার চেষ্টা করে। ঘুরে ফিরে একই কথা হয়। তবু মৃদু ভাষী মিস কলিনসের কথাগুলো শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকে। প্রস্তরীভূত হয়ে তাঁর কথা শোনে। এমনি করে অনেকগুলো দিন কেটে গেল। মার্গারেটের অবসাদ কেটে যায়। অভাববোধও আর থাকে না। মন প্রশ্ন করে তাকে, সে যা করতে চায় তা করা হল না, যা বলতে চেয়েছিল তাও বলা হয়নি। তার চাওয়ার যা ছিল তা যেন এখনও পাওয়া হয়নি। জীবনের অনেক কিছুই বাকি রয়ে গেছে। এত অসম্পূর্ণতা নিয়ে সে বাঁচতে পারবে না। ভিতরে এক অদ্ভুত ব্যাকুলতা অনুভব করল। বহুকাল পরে স্যামুয়েলের কথাগুলো মনে উদয় হল। মার্গারেট তুমি যেমনটি ছিলে ঠিক তেমনটি থেকে যাও। সময় হলেই অলক্ষ্যে তোমার মধ্যে পরিবর্তন ঘটে যাবে। জানতেও পাবে না, কখন গোপনে তোমার জীবনে আধ্যাত্মিকতার বীজ বপন করা হয়ে গিয়েছে। আর ক্রমেই তা বৃক্ষরূপে বাড়তে থাকবে যতক্ষণ না তা সুফলন্বিত হয়ে ওঠে।

তারপরেই হ্যালিফ্যাক্স থেকে লন্ডনে ফিরল মার্গারেট। যেন কিছুই হয়নি এমনিভাবে মার্গারেট কাজ কর্ম আরম্ভ করল। আশপাশে যারা ছিল তারাও সন্দেহমাত্র করল না। এমন কি পরিবারের লোকজনও কম আশ্চর্য হয়নি তাকে দেখে। মেরী ইসাবেল পর্যন্ত অবাক হয়েছে তার ভাঙা ক্ষত বিক্ষত মনে এত জোর এল কোথা থেকে? মুখে তার ম্যাডোনার প্রশান্তি, আধ্যাত্মিকতার লাবণ্য। চোখে স্বর্গীয়, আভা। শান্তিতে মনটা, ভরে গেল ইসাবেলের। কিন্তু বাইরে থেকে বোঝার উপায় ছিল না আধ্যাত্মিক জীবনে কী ভয়ানক নিঃসঙ্গ হয়ে গেছে সে। ঈশ্বর বিশ্বাসী মনটা নিরাশ্রয় হয়ে গেল বলেই নতুন আশ্রয় খুঁজে নিতে সে বিপুল কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়ল। যেমন করে হোক তার চাওয়ার সব পেয়েছিল দেশে পৌঁছনোর জন্য সব বাধা বিপত্তি দু'হাতে ঠেলে এগিয়ে গেল নতুন বিশ্বাসের জোরে।

এই বাহ্য: ধর্ম ছাড়া মার্গারেট বাঁচতে পারে না। ঈশ্বর নির্ভরতা ওর একান্ত প্রয়োজন। এ আকাঙ্ক্ষা ওর সহজাত, জীবনের অচ্ছেদ্য অঙ্গ। তথাপি চার্চ আর পরমপুরুষের বিধানের অর্ন্তগত জোড়াতালিতে ধর্মের যে বিকার সৃষ্টি হয়েছে তাতে ওর যুক্তিবাদী মনটি ভীষণভাবে নাড়া খায়। তার আস্তিক্য বুদ্ধি স্থায়ীভাবে কোনো ধর্মীয় বিশ্বাসকে আঁকড়ে থাকে না, আবার চার্চের বিধান এবং সামাজিক নিয়ম কানুনের সঙ্গে কোনো আপস করে না। তাই গ্রহণ বর্জনের যুগলধারায় যে বয়ে চলেছে তার নিজস্ব বিশ্বাসের দিকে। শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে

মার্গারেট ভীষণভাবে অনুভব করে ঈশ্বর আছেন নিখিল বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়ে। প্রতিক্ষণ তার প্রাণ স্পন্দিত হচ্ছে জলে স্থলে এবং অন্তরীক্ষ্যে। কান পেতে মার্গারেট হৃদয় স্পন্দনে তার কল্লোল শোনে।

এরকম এক সন্ধিক্ষণে লেডি ইসাবেল মার্গসনের ড্রয়িংরুমে ভারত সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণ শোনার সৌভাগ্য হল তার। তার্কিক মনের সব যুক্তি, তর্ক রুদ্ধ হয়ে যায় তার। অবাক মুগ্ধতা নিয়ে সন্নাসীকে শুধু দর্শন করল না, তাঁর কথাগুলো মন্ত্রের মত কানে ধ্বনিত হতে লাগল। "মানুষ ভাবে, তাকে ছাড়া ভগবানের চলে না। কিন্তু অনন্ত স্বরূপকে কী দিতে পাবে মানুষ? আঁধারের মাঝে যে হাতখানি বাড়িয়ে আসে আমাদের পানে সে তো আমাদেরই হাত। তবু সে হাতের মধ্যে অনন্তকে দেখি। তাঁর মধ্যেই লীন হয়ে যেতে চাই। আমাদের সমস্ত তপস্যা শুধু অবন্ধন মুক্তির তপস্যা। আদুরে ছেলেও হাতের কাছে দামী খেলনা ঠেলে ফেলে আকাশের চাঁদ চাই বলে বায়না ধরে। কী আশ্চর্য, মার্গারেটের সংশয়ী মনটা এ সম্পর্কে একটাও প্রশ্ন করল না। সে যেন হারিয়ে ফেলেছিল নিজেকে। তর্ক করতে ভাল লাগেনি। বুকের ভেতর কে যেন দাঁড়িয়ে অনেক-অনেকদূর থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। আর সে উৎকর্ণ হয়ে সেই ডাকটাকে শোনার চেষ্টা করছিল। স্মৃতি বিস্মৃতি পিছনে ফেলে লোক লোকান্ত পেরিয়ে সে চলেছিল এক অজানা দেশে। নিজের স্বপ্নের ভেতর সাধিকার মত মগ্ন হয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ।

হঠাৎ ভীষণ গর্জন করে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মিঃ ম্যাকনীলের গাড়ীটা বাড়ির দোড় গোড়ায় এসে দাঁড়াল। এক গভীর আত্মমগ্নতা থেকে জেগে ওঠল মার্গারেট। সারাটা পথ একটাও কথা বলেনি মাকনীলের সঙ্গে। এডিটর বন্ধুটিও তার তন্ময়তা ভঙ্গের কোনো চেষ্টা করিনি। লজ্জা পেয়ে বলল ঃ আমি যেন কী। এতটা পথ মুখে কুলুপ এঁটে এলাম, ভাবতেও লজ্জা করছে। আপনিও বা কী রকম, জিগ্যেস করতে পারতেন তো, চুপ করে কেন? আশ্চর্য মানুষ বটে।

ম্যাকনীল মৃদু হেসে বলল ঃ তা পারতাম। কিন্তু মৌনতা ভঙ্গ হলে তুমি কি খুশী হতে? মৌনীর কাছে মৌন থাকাটাই নিয়ম।

মার্গারেট একটা অস্বস্তি নিয়ে ভাসা ভাসা চোখে তাকিয়ে রইল তার দিকে। বিব্রত লজ্জায় দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বলল ঃ স্বামীজির কথাগুলো ভুলতে পারি না। তাঁর চোখের চাউনি, গলার স্বর এখনও কান ভরে আছে। চলার পথে বেশি করে মনে হয়। কোনো কোনো মানুষের মনই তো দীপ যা অন্যের পথে আলো ফেলে। পৃথিবীকে চিনতে শেখায়। অর্ন্তমুখী মনটা বোধ হয় আমার আমিকে নতুন করে চিনতে শেখাল। বেশ বুঝতে পারছি, আমার সত্তার ঘুম ভাঙছে।

এটা হল কী করে? শুদু দেখা আর শোনামাত্র এরকম কী হতে পারে? এই সব অদ্ভুত প্রশ্নে আমার ভিতরটা আলোড়িত হচ্ছে সর্বক্ষণে—যা কিছুতে শেষ হতে চায় না। নিজের সঙ্গে অবিরাম কথা বলার আনন্দও ফুরোতে চায় না।

ম্যাকনীল ভ্রমর কালো জোড়া ভুরু নাচিয়ে হাসল। দুষ্টুমির হাসি। মুচকি হেসে বলল ঃ তোমাকে দেখেই বুঝেছি, জাতসাপে ধরেছে।

চমকে তাকাল মার্গারেট। 'জাত সাপ' কথাটা এই প্রথম শুনল। আগে শুধু সাপ কথাটাই শোনা ছিল। জাত কথাটার মধ্যে একটা চিরন্তন গভীর সত্য লুকোনো আছে। তাই কথাটা শোনা মাত্র এক অনির্বচনীয় আনন্দে মন ভরে গেল।

ড্রাইভার গাড়ীর দরজা খুলে ধরল। মার্গারেট গাড়ী থেকে পা-রাখল মাটিতে।

অন্দর মহলে পা দিতেই মা রে রে করে ওঠল। বলল ঃ সারাদিন বাইরে বাইরে কাটিয়ে রাতটুকুর জন্য ঘরে ফেরা কী দরকার? ওটুকু না করে তো কারো বাড়িতে কাটিয়ে দিতে পার বাপু। আমার বয়স হয়েছে। শরীর মন ভালো নেই। তোমাদের সংসারে আর কতকাল ঝি-গিরি করব? এবার সকলে মিলে আমায় রেহাই দাও। আর পারি না।

ইদানীং মায়ের মুখে এধরনের কথা প্রায়ই শুনতে হয় তাকে। তবু রাগে না মার্গারেট। অধরে হাসি ফুটিয়ে বলে, আমাদের গর্ভধারিণী মা তুমি। নিজেকে ঝি বলে অসম্মান কর কেন? তুমি যে কাজই কর না, সে তো তোমার নিজের সংসারের জন্য এবং সন্তানের জন্য কর। সব মায়েরাই তা করে থাকে। তুমি নতুন কিছু করছ না। তবু তোমার মত এত ভাল মা কজনের ভাগ্যে জোটে।

আর লেকচার দিতে হবে না। তুমি একটা বিচ্ছু।

মার্গারেট ছাড়বার পাত্র নয়। মাকে জড়িয়ে ধরে আদর করল। বলল ঃ আচ্ছা মা, তোমার কী হয়েছে বল তো। একটুতেই রেগে যাও কেন? তুমি তো এত খিট খিটে স্বভাবের ছিলে না। ইদানীং আমাকে দেখলেই তুমি গাল মন্দ কর। ভালো করে দুটো কথা পর্যন্ত বল না। আমাকে তোমার এত অপছন্দ কেন? আমি কী করিছি?

নিজের ওপরে আমার যত বিরক্তি। আমার কিচ্ছু ভাল লাগে না। মন ভাল না থাকলে ভাল-ভাল কথা কারো মুখে আসে? সারা জীবন দুঃখ দারিদ্র্য নিয়ে ঘর করছি। একদিন সুখের মুখ দেখিনি। আরাম, স্বাচ্ছন্দ্য, বিশ্রাম কাকে বলে জানি না। নিজের সঙ্গে এবং চারপাশের মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। শরীর আর বইছে না।

বেশ তো বিশ্রাম নাও।

মুখে বলেই খালাস। কে করবে শুনি? তুমি তো দিনরাত ক্লাব, আড্ডা, সভা-সমিতি নিয়ে মেতে আছ। মেরীও কাজের নয়। তোমাদের ভরসা করলে উপোস করে শুকোতে হবে।

তাহলে, মিছেমিছি অভিযোগ করছ কেন?

গায়ের জ্বালায়।

এতে গায়ের জ্বালার কী হল। হাঁড়ি ছাড়তে পারবে না মা তুমি। কারণ তোমার ছেলে মেয়ের পাছে কষ্ট হয় তাই তুমি নিজের হাতে যত্ন করে রান্না কর। নিজের তৃপ্তির জন্য, তোমার সব সেবা যত্ন দিয়ে নিজেকে ভরিয়ে রাখ। এই নীরব আত্মদানের মধ্যে এক আশ্চর্য সুখ আছে বলেই অশক্ত শরীর নিয়ে মায়ের কর্তব্য কর।

তা-তো বলবি। পেটের কাঁটাই হল শত্রু। আমি শুধু নিজের জন্য করি তোদের জন্য করি না—এত বড় মিথ্যে কথা বলতে তোর কষ্ট হল না। বলতে বলতে ইসাবেল হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল।

মার্গারেট দু'হাতে ধরে বলল ঃ মা, আমার কথাটা বুঝতে ভুল করেছ তুমি। সন্তানের প্রতি মায়ের স্নেহ মমতা, কিংবা মায়ের প্রতি সন্তানের শ্রদ্ধা, ভালবাসা সব তাদের নিজের জন্যই। মানুষ অন্য কাউকে কিছু দিতে পারে না, শুধু নিজেকেই নিবেদন করে। নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার সুখেই পূর্ণ করছে নিজেকে এই কথাটাই বোঝাতে চেয়েছি। আমরা তোমার আত্মার স্ফুলিঙ্গ। তোমার প্রাণ থেকেই আমরা আর এক প্রাণের রূপ ধরেছি মাত্র। আমাদের প্রাণের মধ্যে তোমার প্রাণের অম্লান শিখা রয়ে গেল।

ইসাবেলের সব কান্না থেমে গেছে। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে আছে। প্রসন্ন হাসিতে তার মুখখানি উদ্ভাসিত হল। মার্গারেটের গালে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল ঃ আমার মাথা ঠিক নেই মা। যখন দেখি সোমত্ত মেয়ে চোখের ওপর জ্বলজ্যান্ত ঘুরে বেড়াচ্ছে নিজের খুশিতে তখন মাথার মধ্যে রাগ চড়ে যায়। তোদের কত বয়স হয়ে গেল তবু আজও বিয়ে থা দিতে পারিনি। একথা মনে হলে; নিজের ওপর রাগ হয়। বড় অযোগ্য, অক্ষম, অপরাধী মনে হয় নিজেকে। তোদের বাবা থাকলে তো এসব নিয়ে আমার কোনো দুশ্চিন্তাই থাকত না।

আমার বিয়ে নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। একদিন তো তুমি আমাকে ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করছ। অনেক মূল্য দিয়ে আমি তাঁর মহিমা জেনেছি। ঈশ্বরের ইচ্ছে নয় বিয়ে থা করে ঘর-সংসার করি। জীবনে দুঃখটাও যে সুন্দর

এমন গভীর করে আমার মত কেউ বোঝেনি। বর্তমানে আমার কোনো দুঃখ নেই। দুঃখ দহনের এক অলৌকিক তৃপ্তি আমার মনকে ঘুম পাড়িয়ে ফেলেছে।

ইসাবেলের বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বলল ঃ কিন্তু আমার চোখে ঘুম নেই। ঘুম আসে না। বোধ হয় আসবে না কোনোদিন। থাক সে কথা। বাইরে থেকে এসেছ। হাত মুখ ধুয়ে আমার একটু কাজ করে উদ্ধার কর।

কথাগুলো বলে ইসাবেল রান্নাঘরে ঢুকল। ইসাবেলের অসংগতিগুলো মার্গারেটের চোখে পড়ল। সময়ের সঙ্গে জীবনের অনেক কিছু বদলে যায়। গায় রঙ ফিকে হয়ে যায়। সুখ, দুঃখ, আনন্দ সব কিছুকে পরিশ্রুত করে একভাব অন্যভাবে রূপান্তরিত হয়ে যায়। কিন্তু মার খিটে খিটে ভাবটা দিন দিন প্রবল হচ্ছে।

মার্গারেট লক্ষ্য করেছে তাকে নিয়েই মায়ের অন্তরে একটা ভয় রয়েছে। এই ভয়ের উৎস কোথায়-কতভাবে জানতে চেয়েছে তবু সফল হয়নি। বরং যতদিন যাচ্ছে ততই হারানোর আশঙ্কা তাকে আতঙ্কগ্রস্ত করছে। তার কোথাও যাওয়াটা ইসাবেল সহ্য করতে পারে না। ইদানীং একটা নতুন উপসর্গ দেখা দিয়েছে। ভারতের সন্ন্যাসী স্বামীজি সম্পর্কে তার শ্রদ্ধা অনুরক্তি, কৌতূহল এবং আগ্রহ মা'র একেবারে পছন্দ নয়। ভাই বোনের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে কোনো কথা হলেও ইসাবেল চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। স্বামীজির ওপর মা'র বিরাগ যে কেন মার্গারেট জানে না। তার উৎসুকী কৌতূহল মনটা ইসাবেলের এই দুর্বলতার উৎসটুকু ঠিকখুঁজে পায় না।

মায়ের দিনগুলো আতঙ্কে কাটে বলেই মার্গারেটের ভাল লাগে না। রান্নাঘরে মার ফাই ফরমাস খাটতে খাটতে বলল ঃ আমি খারাপ মেয়ে বলে তোমার যত অশান্তি। আমাকে তুমি একটুও ভালবাস না। কিন্তু কী দোষে দোষী বলতেই হবে তোমাকে।

ইসাবেল চুপ করে ছিল। উত্তর দেবার সাহস হল না। মার্গারেট আড়চোখে তাকে পর্যবেক্ষণ করছিল। একটা ভয়ের শিখা অন্তস্থল থেকে উঠে তাকে দগ্ধ করতে করতে যেন মুখখানা কালি করে দিল। খুন্তি নাড়তে নাড়তে বলল ঃ ওয়েস্টএন্ডে ভারতের সন্ন্যাসীর বক্তৃতা শুনতে যাওয়াটা তোমার অপছন্দ ছিল। তাঁর প্রসঙ্গে কোনো কথা বললে তুমি রেগে যাও। ওই সন্ন্যাসীকে তুমি একটুও সহ্য করতে পার না। অথচ তাঁকে তুমি চেন না, জান না। তোমার সঙ্গে তাঁর স্বার্থের সংঘর্ষও হয়নি। তাঁকে তোমার ঈর্ষা করারও কিছু নেই। তবু তাঁর প্রতি তুমি এত বিরূপ কেন.ভাবতে আশ্চর্য লাগে। একী কোনো পূর্বজন্মের ব্যাপার? অথবা, রাশিগত কিছু!

ইসাবেল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল ঃ পৃথিবীর কিছু কিছু ব্যাপার থাকে যার কোনো ব্যাখ্যা হয় না। ওই সন্ন্যাসীকে আমি দেখিনি, ওঁর সম্পর্কে কিছু জানিও না। তবু কেন জানি না, আমার সব রাগ ওঁর ওপর। এর কোনো ব্যাখ্যা নেই আমার কাছে।

মা, তোমরা আমাকে আবেগপ্রবণ বল, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি কার্য ছাড়া কারণ হয় না। নিশ্চয়ই গূঢ় কোনো কারণ আছে। সচেতন মনে টের না পেলেও অবচেতনে কোথাও একটা আশঙ্কা কিংবা উদ্বেগ লুকোনো আছে। হয়তো আমাকে নিয়েই তোমার সে উৎকণ্ঠা।

ইসাবেল নিজের অজান্তে চমকে ওঠল যেন। মনে হল, এই বুদ্ধিমতী মেয়েটির কাছে সে ধরা পড়ে গেছে। পাছে তার মনের বিচলিত অবস্থাটা প্রকাশ হয়ে পড়ে তাই চাপা দেয়ার জন্যই বলল ঃ একটা সাধারণ ব্যাপার নিয়ে এত মাথা ঘামানোর কিছু নেই।

কিন্তু আমার যে প্রয়োজন আছে মা। আমাকে তুমি সহ্য করতে পার না এই কষ্টটা তীক্ষ্ণ ছুরির ধারের মত আমার বুকের ভেতরটা খুঁটিয়ে দগদগে করে ফেলেছে।

ইসাবেল অসহায়ের মত তার দিকে তাকিয়েই রইল। মুখে কথা নেই তার। মার্গারেট অসহিষ্ণু গলায় বলল ঃ মা, তোমার আর্ত মনের কষ্টটা আমাকেও যে পীড়া দেয়-এটা বোঝ না কেন? আমি তোমার মেয়ে। আমার কাছে তোমার গোপনের কিছু নেই।

ইসাবেলের দু'চোখ ছলছল হল। বুকের ভিতরেও সহসা কী যেন ঘটে গেল। তবু কষ্টে নিজের আবেগকে দমন করে বলল ঃ ভারতের সন্ন্যাসী যেভাবে ভক্ত খ্রীষ্টানদের তাঁর শিষ্য করে নিচ্ছে তাতে আমারও ভয় হয়। তোর মত সরলমতি, ধর্মপ্রাণ মেয়ে যে কোনো সময় তাঁর দলে ভিড়ে যেতে পারে এরকম একটা আশঙ্কায় আমার দিন কাটে।

এই ঘটনা! আমি বলি, কী না জানি! তোমার এরকম অদ্ভুত ধারণা হল কেন?

ইসাবেলের গলা শুকিয়ে যায়। মুখে চোখে ফের আতঙ্ক ফুটে ওঠে। ভয়ার্ত গলায় বলল ঃ হবে না! সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে যে অমৃতের পুত্র এসেছে পাশ্চাত্যদেশে, সে তো শ্বেতাঙ্গ মানুষের কাছে এক মহাবিস্ময়। মাত্র দু'বছর সে পাশ্চাত্যে আছে। এর মধ্যে একজন পুরুষ ও একজন নারীকে সন্ন্যাসী করেছে, পাঁচজনকে মন্ত্র দিয়েছে ব্রহ্মচর্যের। কত মানুষের অন্তর জয় করে তাঁর একান্ত ভক্ত ও অনুগামী করেছে তার কোনো লেখাজোখা

নেই। এঁদের মনের অন্ধকার ঘরে আলো জ্বেলে দিয়েছেন। তাদের মনের অভ্যন্তরে মুক্তির হাওয়া বইছে। যে কোনো মুহূর্তে তারা ওই সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নিতে পারে। মানুষ বশীকরণের এক আশ্চর্য ক্ষমতা তাঁর আছে। আমার সব ভয় সেজন্য। সন্ন্যাসীর বক্তৃতা শোনার পর থেকে তুইও অনেক বদলে গেছিস। ভারতকে তোর জানার আগ্রহ আমার ভয় ও ভাবনার কারণ। সর্বক্ষণ মনে হয় ঐ সন্ন্যাসী নিয়তির এক অমোঘ সঙ্কেতরূপে আর্বিভূত হয়েছে তোর জীবনে। এই সব ভাবনায় একজন মায়ের ছিন্নভিন্ন হওয়া কী খুব দোষের।

মার্গারেট কথা খুঁজে পেল না. ডাক ভুলে যাওয়া পাখির মত ফ্যাল ফ্যাল করে মায়ের দিকে চেয়ে রইল। সহসা দু'চোখ ভরে জল নামল। চোখ মুছে ভেজা গলায় বলল ঃ মা, আমার জন্য তোমার খুব চিন্তা হয়, তাই না।

ইসাবেল দরাজ গলায় বলল ঃ হয় বৈকি! সাধু-সন্ন্যাসীরা মন ভেজানো ভাল ভাল কথা বলতে পারে। ওঁদের কথায় মনটা মেতে ওঠে। তকন ভিতরের সত্যটুকু যাচাই করার অবস্থা থাকে না। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শ্লেষের গলায় বলল ঃ ওই অদ্ভুত মানুষটির প্রতি এক রহস্যময় আকর্ষণ এবং তাঁকে আবিষ্কার করার এক নাছোড় আকাঙক্ষা তোকে মাতিয়ে তুলেছে। এজন্যই আমার ভয়। ভাল-মন্দ বিচারের শক্তি তুই হারিয়ে ফেলছিস। কী করে তোকে বোঝাব, জানি না। সন্ন্যাসী খ্রীস্টান ধর্মের কেউ নয়। তিনি কী বলছেন তা নিয়ে খ্রীস্টান ধর্মযাজক পরিবারে মেয়ে হয়ে তোর মাতামাতি করা শোভা পায় না। ঐ মানুষটি যদি লণ্ডনে না আসতেন, তা-হলে এত ধ্যান ধারণা কী নিরর্থক মনে হত।

মার্গারেটের তার্কিক মনটা চাঙ্গা হয়ে ওঠল। বলল ঃ কুয়োর ব্যাঙ সাগরের মর্ম কী বোঝে? যদি তিনি না আসতেন তা'হলে জানা হত না সঙ্কীর্ণতা, গোঁড়ামি এবং সকল রকম বন্ধন ভেঙে ফেলার নাম মুক্তি। ধর্ম ও সত্য এক। পুঁথি, প্রতীক দূর করে দিয়ে আত্মার মধ্যে ঈশ্বরকে ধ্যান কর, তাকে স্ব-স্বরূপে দর্শন কর। মানুষের যা কিছু সুন্দর, শ্রেষ্ঠ তার মধ্যেই ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বর কোনো বাইরের বস্তু নন, তিনি অন্তরের মধ্যেই আছেন। তাঁকে অনুভব করতে হয়, উপলব্ধি করতে হয় আত্মার মধ্যে খুঁজতে হয়। মা, এমন করে সংশয়, দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে পাশ্চাত্যের মানুষকে সত্য দর্শন করতে কেউ শেখায়নি।

কন্যাকে বোঝানোর কথাটা ইসাবেল সহসা যেন হাতের মুঠোয় পেয়ে গেলেন। দৃঢ়স্বরে বললেন ঃ এই হল তোর প্রকৃতি। চিরাচরিত বিশ্বাসের বিপক্ষে কিছু বললে তৎক্ষণাৎ তুই বিশ্বাস করিস। অভিনবত্ব তোর মন টানে।

অত্যন্ত আবেগপ্রবণ বলেই স্রোতে গা ভাসিয়ে দিস। এজন্যেই ভাবনা হয়। আমি যে মা।

ইসাবেলের উদ্বেগ উৎকণ্ঠ মার্গারেটের হৃদয় স্পর্শ করল। থর থর করে কেঁপে ওঠল বুকের ভিতরটা। আবেগে জড়িয়ে ধরল মাকে। বলল ঃ তুমি আমার ভাল মা। তোমাকে দুঃখ দিয়ে আমি কোনোদিন সুখ পাব না। কিন্তু আমি তো কিছু অন্যায় করিনি। তা-হলে নিজের ওপর অকারণ নিষ্ঠুর হবে কেন? আমরা সাধারণ মানুষ। কেউ অন্যের হাতে নেই। আমরা নিজেই নিজের হাতে আছি। আমরা যাই করি না, তুমি কেন নিজেকে ছোট করবে? তোমার মহত্বের আলো পড়ে আমাদের মনটা যদি বড় না হয়ে যায় তাহলে তোমার মাতৃত্ব নিয়ে কী গর্ব করব আমরা? ত্যাগও বড়, দুঃখও বড়। বড় ত্যাগ ছাড়া বড় কিছু পাওয়া যায় না। মা সব কিছুর জন্য তৈরি থাকা ভাল। দুঃখের পাথর চাপিয়ে মনকে আর্ত করে, যদি ক্লান্ত কর নিজেকে, তা-হলে শত চেষ্টাতে সুখের নীড় তৈরি করতে পারব না। সুন্দর সংসার সৃষ্টি করাও একটা শিল্পকর্ম। মায়েরাই মমতা দিয়ে তা রচনা করতে পারে। সারা জীবন একটা মিথ্যে বিশ্বাস নিয়ে কাটিয়ে দেওয়ার মধ্যে সত্যি কোনো মহত্ব নেই।

ইসাবেল বুকের ভিতর মার্গারেটকে জড়িয়ে ধরে বলল ঃ সত্যি আমি যেন কী?

ছুটির দিন।

সদ্য স্নান সেরে এসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল মার্গারেট। আর নিজের মনে গুণগুণ করে গান করছিল। মনেতে বেশ একটা লঘু প্রসন্নতা ছড়িয়ে পড়ছিল। কিন্তু চোখ দুটি আয়নার ওপর স্থির হয়ে রইল সর্বক্ষণ। বোধ

হয় তন্ময় হয়ে মানুষ মার্গারেটকে দেখছিল। বহুকাল পরে নিজেকে দেখার অবকাশ হল তার।

কত মানুষের মিছিল তার জীবনে। এক জীবনের ওপর দিয়ে কত ধরণের ঘটনার স্রোত বয়ে গেছে। এই ছোট্ট জীবনে কত কর্মের আহ্বান ; কত নতুন দায়িত্ব, কত অভিনব সংগ্রাম করেছে সে। কী দুরন্ত তৃষ্ণা, আর বেঁচে ওঠার তীব্র ক্ষুধায়, কত বিচিত্র ঘটনায়, আশ্চর্য অনুভূতিতে, ব্যথা-আনন্দে, ব্যর্থতা-সার্থকতায়, জয়-পরাজয়ে পরিপূর্ণ তার জীবন। অনেক বাঁক পেরিয়ে, চড়াই-উতরাই ভেঙে আঠাশ বছর ধরে ক্রমাগত চলেছে। আঠাশ বছরের মধ্যে তার যাত্রা ভঙ্গ হয়নি। থেমেও পড়েনি! শুধু ধাও, শুধু ধাও, উদ্দাম উধাও-ফিরে নাহি চাওর বিপুল হর্ষে বারবার অন্তরের আগ্রহে যেন অমৃতের অভিসারে বেরিয়ে পড়েছে। হিয়ার মধ্যে শুনতে পায় তার সোনার নূপুরধ্বনি। আহ্বানের হাতখানা কে যেন বাড়িয়ে ধরেছে তার দিকে। নিশি পাওয়া মানুষের মত কেমন আচ্ছন্ন হয়ে কল্পনায় স্বামীজির ভাস্কর্যের মত মুখ দেখছিল।

স্বামীজি লন্ডন ছেড়ে পুনরায় আমেরিকা যাত্রা করছেন। দিনও স্থির হয়ে গেছে। ২৭শে নভেম্বর জাহাজে ওঠবেন। তার আগে বেশ কয়েকটি বক্তৃতা করবেন। সংবাদটা চাওর হওয়ার পর সে আর স্থির থাকতে পারল না। চঞ্চল হয়ে ওঠল। অনন্ত কাজের মধ্যে ১৬ এবং ২৩শে নভেম্বর সব কাজ বন্ধ রেখে স্বামীজির বক্তৃতা শুনতে সেণ্ট জর্জেস রোডের ৬৩ নং বাড়িতে হাজির হল।

বক্তৃতা আরম্ভ হল। গম্ভীর তরঙ্গায়মান স্পষ্ট শব্দ তাঁর কণ্ঠ থেকে নির্গত হতে লাগল। মুহূর্তে ঘরটা নিস্তব্ধ হয়ে গেল। মনে হল কথাগুলো যেন সুরের ভেলায় ভেসে ভেসে দেবলোকের দিকে চলেছে। ভাষার রূপ ও রঙ যেন ঝলসে ওঠল। ভাবের সৌরভ যেন ঘরময় ছড়িয়ে গেল। ঘরে যে, কোনো মানুষ আছে বোঝা গেল না। কেবলমাত্র স্বামীজির গম্ভীর নাদপূর্ণ শব্দ কণ্ঠ হতে নির্গত হতে লাগল।

মার্গারেট মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল এবং সর্বক্ষণ ধরে দ্রুত হাতে তার ভালোলাগার অংশগুলো লিখে নিল। ভিতরটা তার আলোড়িত হতে লাগল। মনের ভেতর যেন শয়ে শয়ে প্রশ্নের পায়রা উড়তে লাগল। অনেকক্ষণ পাখা ঝাপ্টা ঝাপ্টি করে ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে ঝিমিয়ে পড়ল যেন অবশেষে। বিস্ময়ে মার্গারেট চোখ বড় বড় করে দেখতে লাগল বিবেকানন্দকে। অতি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে গায়কের সঙ্গে শ্রোতার হৃদয়ের এমন একটা নিবিড় যোগাসূত্র

মুহূর্তে ঘটে যায় এবং সমস্ত হৃদয় এমন নিবিড় হয়ে তার সুরে বাধা পড়ে যে তখন পুরোপুরি সমাহিত হয়ে যায়। সেরকম একটা তন্ময়তা মার্গারেটকে এমন আচ্ছন্ন করে ফেলল যে প্রশ্ন করলে শ্রোতার উপভোগের সেই সুন্দর মুহূর্তের রেশটুকু কেটে যায়। তাই সে নীরব রইল। কিন্তু মনের অভ্যন্তরে তার প্রতিক্রিয়া অব্যহত ছিল।

ভাবলে, মার্গারেটের বিস্ময় লাগে যে টানা আড়াই ঘণ্টা ধরে বক্তৃতা শুনল অথচ একবারও সে অন্যমনস্ক হল না। কিংবা তার আগ্রহে একটুও শৈথিল্য প্রকাশ পেল না। বরং আত্মহারা হয়ে গেছিল। এতটা দীর্ঘসময় যে কোথা দিয়ে কেটে গেল, শেষ হল কখন বুঝতেও পারল না। যখন শেষ হল তখন লক্ষ লক্ষ ফুলকুঁড়ি ফুটে উঠতে লাগল মনের মধ্যে। সদ্য ফোটা ফুলের সৌরভ ছড়িয়ে পড়ল চেতনার ভেতর। কথাগুলো শুনতে ভাল লাগছিল, কিন্তু বক্তব্য বিষয় অত্যন্ত মামুলি এবং সাধারণ। অভিনবও কিছু নয়। তবু তার মধ্যে এমন কিছু ছিল যা তার মত সংশয়বাদীদের চিত্ত আকৃষ্ট করল এবং চিন্তারাজ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করল।

স্বামীজি লন্ডন ত্যাগ করে চলে গেছেন। লিপিবদ্ধ বক্তৃতা নিয়ে পর্যালোচনা করে নিজের মনে। যখনই মনোসংযোগ করে তখনই ভারতের সন্ন্যাসীর শান্ত সৌম্য মূর্তি, সরল নিষ্পাপ আলোয় ধোয়া সহাস্য মুখ, আকর্ণ বিস্ফারিত দুই চোখের উজ্জ্বল নরম দ্যুতি, নয়নাভিরাম চাহনি, ঘন বাবরি ঢেউ খেলানো চুলের সমুদ্র, পরিস্কার কামানো মুখ, আজানুলম্বিত কমলা রঙের কলার দেয়া লম্বা কোট পরিহিত সেই আশ্চর্য মানুষটিকে দেখতে পায়। শুনতে পায় সমুদ্রের নির্ঘোষের মত কল্লোলিত সুরময় কণ্ঠস্বর। মনে হলেই সারা গায়ে কাঁটা দেয়। অমনি মনটা দীন হয়ে যায়। হাত জোর করে দীন ভক্তের মত প্রার্থনা করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কার কাছে কী প্রার্থনা করবে, তা তো জানা নেই তার।

হ্যালিফ্যাক্স স্কুলে পড়ার সময় তার মনে প্রশ্ন জেগেছিল কোথা থেকে কি করে এই পৃথিবীর উদ্ভব হল? এর মনোমত উত্তর আঠাশ বছর বয়সেও পায়নি কারো কাছে? সব জিজ্ঞাসার মূলে ঐ প্রশ্নটাই তাকে আকূল করে রাখে। ঈশ্বর আছে কি নেই, এই রহস্যের কোনো সমাধান হল না আজও। অথচ, মার্গারেট ভীষণভাবে বিশ্বাস করে ঈশ্বর আছেন। তিনি তাদের সত্যরূপে, নিখিল বিশ্বে সে সত্য স্পন্দিত হচ্ছে। কিন্তু তার আত্মার রহস্য উন্মোচন হল না। চার্চের শিক্ষার মধ্যেও কোথাও প্রকাশ নেই তার। চার্চের কাজ করতে করতে তার বারংবার মনে হয়েছে-এই প্রতিষ্ঠানটি মানুষর তৈরি বলে এর প্রতিটি ইটের

গায়ে মানুষের সৃষ্ট বৈষম্য, পক্ষপাতিত্ব, স্বার্থপরতা এবং হীনমন্যতার চিহ্ন লেগে আছে। বিশ্ববিধান আর মানুষের আইনের আপস রক্ষা করতে গিয়ে চার্চ আর সমাজের অগুনতি জোড়াতালিতে ধর্মের নামে যে অমানবিক ধর্ম সেখানে হয় তাতে তার বিচারপ্রবণ স্বাধীন মনের পূজাঞ্জলি বিশ্বস্রষ্টার পায়ে গিয়ে পৌঁছয় না। সংশয়ে ক্ষতবিক্ষত হয় তার ভিতরটা। তবু ঈশ্বরের প্রতি তার বিশ্বাস টলেনি। তাই চার্চের ধর্ম, মানুষের ধর্ম এবং বিশ্বস্রষ্টার ধর্ম-সম্বন্ধে মার্গারেটের মনে একধরনের সংশয়বাদ জেগে ওঠল। আসলে সে যা জানতে চায়, সমস্ত অন্তঃকরণ যাকে পাওয়ার জন্য উন্মুখ তাকে কিছুতেই নাগালের মধ্যে পাচ্ছে না। কিন্তু অনুভূতি দিয়ে টের পায়, সে যা ধরতে চাইছে তা তো আছেই, তারও ওপারে কিছু আছে। কিন্তু সেই কিছুর সন্ধান কে দেবে তাকে?

বুকটা আলোড়িত হল সেই মুহূর্তে। তার অন্তরের তার সব যন্ত্রণার গভীর থেকে, তার নাভিমূল থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের অজানতে উৎসারিত হল ঃ রাজা। আমার প্রভু। আমার গুরু! নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারানো মার্গারেট আরো বলল ঃ তুমিই আমার ইষ্ট, আমার সাধনা। আমার সব পাওয়ার ধন। তোমাকে অর্চনা করে সার্থক হব আমি। পরম পিতা বলে যদি অলক্ষ্যে কেউ থাকে. তবে দিও—আমার হাতে তোমার অরূপরতনকে দিও।

বুকের ভেতর জমে থাকা কথাগুলো হঠাৎই উন্মত্ত উৎসারে প্লাবিত করে দিয়ে গেল তার হৃদয়ভূমি। ভারতের সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা শোনার পরে মনে হল, এতদিন হৃদয়ের অন্তস্তলে যাকে খুঁজছিল সেই পরশপাথর পেয়ে গেছে। এই সন্ন্যাসীর মধ্যে সে তার ঈশ্বর দর্শন করল। স্বামীজি বলতেন ঈশ্বর কোথাও নেই। তাঁর কোনো আকার নেই, আত্মার মধ্যে উপলব্ধি করতে হয়, তাঁকে। সকলেব সে ক্ষমতা থাকে না। যাদের আছে তারাই কেবল ঈশ্বরকে সব কিছুর মধ্যে দর্শন করে। যীশুও ঘাতকের মধ্যে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছিল। সর্বশেষ কীলকটি বিদ্ধ হয়ে যীশু যখন প্রাণত্যাগ করলেন তখন বললেন, তুমিও তিনি। কারণ, মানুষ যেরূপে চায় তাঁকে সেইরূপেই আবির্ভূত হন তিনি! ভারতের আদি মহাকাব্য রামায়ণে মহানায়ক রামচন্দ্রের হাতে যখন রাবণ নিহত হল তখন সেও ঘাতকের মধ্যে তার প্রাণের ঈশ্বরকে দর্শন করে। বলল ঃ তুমি আমার আরাধ্য ইষ্ট। তা-হলে, ভারতের সন্ন্যাসীও কি, সে যা হতে চায়-তার বীজ বপন করছে তার ভিতরে। স্বামীজির কথাগুলো পুনর্বার তার কানে অনুরণিত হতে লাগল, বীজ থেকে অঙ্কুর হয়, গাছ হয় এবং বাঁচা বাড়ার জন্য মাটির মধ্যে শিকড় ছড়িয়ে দেয়, তেমনি অলক্ষ্যে বীজই বৃক্ষরূপে বাড়তে থাকবে এবং বিকশিত হবে যতক্ষণ না ফুল থেকে ফল হয়।

দিন যত যায় মার্গারেটের অন্তরে দ্বন্দ্ব এবং কাতরতা প্রবল হয়। বেশ বুঝতে পারে অলক্ষ্যে তার ফুল ফোটানোর নির্দেশ এসেছে। স্বামীজির অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব, চরিত্রের কঠোরতা, দৃঢ়তা, সততা, ঈশ্বর বিশ্বাস, প্রগাঢ় ভক্তি ভালবাসা, মেধা, প্রজ্ঞা বাগ্মিতা এবং পাণ্ডিত্য প্রবলবেগে তাঁর দিকে টানতে লাগল তাকে। সেই আকর্ষণের মধ্যে গভীর শ্রদ্ধা ছাড়াও ছিল অনুরাগ আর এক তীব্র ভাললাগা।

আয়নার সামনে তন্ময় হয়ে নিজের কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎই প্রতিচ্ছায়াকে প্রশ্ন করল ঃ মার্গারেট, তোমার মনে এখন কোন অবস্থা চলেছে? জয়, না পরাজয়? থমথমে দুই চোখ স্থির হয়ে থাকে প্রতিবিম্বের ওপর। তাকেই রসিকতা করে বলল ঃ তুমি হারার মেয়ে নও? তোমাকে হারায় সাধ্য কার? প্রতিপক্ষকে হারিয়েই তোমার সুখ। তুমি শুধু জয় চাও। জয়েই তোমার সুখ এবং আনন্দ। জীবনের সব কাজে এবং সংকল্পে জিতে জিতে তুমি অহঙ্কারী হয়ে ওঠেছ। নিজেকে নিয়ে তোমার সব অহঙ্কার কিন্তু ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে সামান্য এক ব্যাঙ্ক কর্মচারী ম্যাগডোনাল্ড। তার কাছে হেরেছ তুমি।

প্রতিবিম্বের অধরে চেপা কৌতুক হাসি আকর্ণ বিস্তৃত হল। বলল ঃ ভুল হচ্ছে তোমার। একজন মানুষ যতক্ষণ নিজের কাছে হেরে না যাচ্ছে ততক্ষণ কেউ তাকে হারাতে পারে না। তুমি যাকে হার বলছ, সেই আপাত হেরে যাওয়াটাই আমার সবচেয়ে বড় জেতা। ঐ হার না হলে জানা হতো না বন্ধুত্ব হয় সমানে সমানে। প্রেম ভালবাসার ক্ষেত্রেও তা সর্বতোভাবে প্রযোজ্য। ম্যাগডোনাল্ডের সঙ্গে আমার মানসিক দূরত্বটা বেশি বলে ঈশ্বর অশুভ মিলন থেকে উভয়কে রক্ষা করেছেন। এর মধ্যে আমার অহঙ্কারটা কোথায়? প্রত্যাখ্যানটা আমি করলে অহঙ্কার বলাটা সাজ তো তোমার। ব্যর্থতা নিয়ে আমার কোনো অনুশোচনা নেই। আমার ব্যর্থতা কোথায় দেখলে তুমি? আমি ফুরিয়েও যায়নি, থেমেও যায়নি। আমি শুধু চলতে জানি। চলতে চলতেই পায়ের তলায় রাস্তা জেগে ওঠে।

প্রতিবিম্বকে সকৌতুকে বলল ঃ তাই বুঝি! কিন্তু আমি তোমার মধ্যে এক অভিসারিকাকে দেখছি। নায়কের হৃদয় জয়ের অভিসারে বেরিয়েছে অনন্ত উৎসাহে, অনন্ত সাহসে।

প্রতিবিম্ব হেসে যেন মার্গারেটকে প্রশ্ন করল ঃ নায়কটিকে তুমি চেন।

স্বপ্নালু দুটি চোখ দর্পণের গায়ে মৃদু নড়ে ওঠল। বলল ঃ বিলক্ষণ। তিনি হলেন ভারতের সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। কী গো চমকালে কেন?

চমকেছি বুঝি? কেন?

নিজের সঙ্গে নিরুচ্চারে এভাবে কথোপকথন করতে তার ভীষণ ভাল লাগল। যে কথাগুলো সে অন্তরে অনুভব করে, নির্জনে মনের চোখে প্রত্যক্ষ করে বারবার শিহরিত হয় দর্পণে তার সঙ্গে কথা বলতে দরজা বন্ধ করতে হয় না। এমন কি ধরা পড়ারও ভয় নেই। বরং তাঁর ব্যক্তিত্বের সুগন্ধ ভরে দেয় তাকে এক গভীরবোধে। নিশ্বাস বুজে এল যেন মার্গারেটের। চোখ দুটো আধ বোজা অবস্থায় সব জান্তার মত মাথা নাড়ল। বলল ঃ এই অসাধারণ মানুষটির বিরাট ব্যক্তিত্ব, তাঁর প্রজ্ঞা পাণ্ডিত্য এবং বাগ্মিতার সঙ্গে তোমার মিল এত বেশি যে এক গভীর শ্রদ্ধা মাধ্যাকর্ষণের মত তোমাকে প্রবলবেগে তাঁর দিকে টানছে। তোমার সাধ্য নেই তাকে প্রতিরোধ করা কিংবা তার উজানে যাওয়া। আসলে, তুমি তাঁকে জয় করতে চাও। একেবারে নিজের করে পেতে চাও। তাই তাঁর মত হয়ে ওঠার, জন্য তোমার চেষ্টার অন্ত নেই। হারানোর জন্য নয়, তাঁকে জয় করার জন্যই ভারতের বেদ, উপনিষদ, পুরাণ এবং বিবিধ দর্শন গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ছ। তাঁর নজর কেড়ে নেয়ার জন্য তুমি প্রস্তুত করছ নিজেকে। আর কেউ না জানলেও আমি তো জানি, ভারতের সন্ন্যাসীকে জয় করার জন্য তোমার পূজার উপাচার-নিষ্ঠা অধ্যবসার, সাধনা ; পূজাঞ্জলি হয়ে উপাসিতের পদতলে গিয়ে যাতে পৌঁছয় তার আয়োজন এবং প্রস্তুতির কোনো ত্রুটি নেই। চমৎকার। লোকচক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে, স্বামীজিকে বোকা বানিয়ে তাঁকে জয় করার এ এক অভিনব কৌশল তোমার। সাবাস মার্গারেট! জয় তোমার হবেই।

প্রতিচ্ছায়া সহসা হেসে ওঠল দর্পণের গায়ে। বলল ঃ স্বামীজি বলতেন সত্যেরই জয় হয়। মিথ্যের কখনও জয় হয় না। সত্য মানুষের সিদ্ধিলাভের একমাত্র পথ। সজ্ঞানে নিজের সঙ্গে মিথ্যাচার করিনি কখনও। আমার কোনো লুকোচুরি নেই। দিনের আলোর মত স্পষ্ট। এই যে দর্পণের আমি আর আমার প্রতিরূপ তুমি—উভয়েই সত্য। স্বামীজি বলতেন অসীম যিনি স্বয়ং করেছেন সাধনা মানুষের সীমানায়—তাকেই বলে আমি। এই মুহূর্তে সেই কথাটা হঠাৎ গভীর করে অনুভব করছি। আত্মা ও ঈশ্বরের অভেদ সম্পর্ক সেদিন দুর্বোধ্য মনে হয়েছিল। ব্যক্তি এবং ঈশ্বর কী করে এক হতে পারে? ব্যক্তি হিসেবে আমরা স্বতন্ত্র কিন্তু ঈশ্বরে আমরা সকলে এক। আমরা সকলে তাঁতেই আছি। সকলেই তাঁর অংশ। সুতরাং আমরা এক তথাপি মানুষে মানুষে ঈশ্বরে ঈশ্বরে একটা স্বাতন্ত্র্য অবশ্যই আছে, কিন্তু সেটা ভ্রম, আসলে স্বতন্ত্র নয়। ভীষণ গোলমেলে আর এমন পরস্পর বিরোধী যে মাথায় ঢোকে না। তাই এসব চিন্তা ভাবনা থেকে দূরে দূরে থাকতাম।

আজ সেই আড়ালটা আর নেই। নিজেকে নতুন করে খুঁজে পেয়েছ এই তো।

হাঁ, তোমার আমার মুখোমুখি কথা বলার সময় হঠাৎ আত্মা ও ঈশ্বরের অভেদ সম্পর্কের ওপর এক ঝলক আলো এসে পড়ল। অমনি সব অন্ধকার দূর হল। মাঝে মাঝে জীবনের অনেক সত্য ও গভীর রহস্যকে এরকম করে হঠাৎ জানা হয়ে যায়। তেমনি আমি আবিষ্কার করলাম ; দর্পনের প্রতিবিম্বর সঙ্গে মানুষ মার্গারেটকে যদি আলাদা করা যেত তা-হলে দর্পণে মার্গারেটের প্রতিবিম্ব পড়ত না। বস্তুরূপে দর্পণ স্বতন্ত্র, তেমনি মানুষরূপে তুমিও স্বতন্ত্র। ঈশ্বর ও আত্মার তফাৎটা সেরকম। মানুষ মার্গারেটকে ভাগ করা যায় না, সর্বদা এক সে। তাহলে অসীম যিনি, তাঁকে যদি ভাগ করা যেত তা-হলে প্রতি অংশই অসীম হত। কিন্তু অসীম কখনো দুটো হতে পারে না। তা-হলে একটি অপরকে সীমাবদ্ধ করত এবং উভয়েই সসীম হয়ে যেত। আয়নায় আমার আমিকে যখন প্রতিবিম্বের মধ্য দিয়ে দেখলাম তখন বিদ্যুৎ চমকানোর মত এক দিব্য আলোয় আমার ভিতরটা জ্যোর্তিময় হয়ে ওঠল। প্রশ্ন জাগল পাশাপশি এরকম হাজার দর্পণ থাকলে একই মার্গারেট প্রতিবিম্বিত হবে তাতে। অর্থাৎ এক মার্গারেট হাজার মার্গারেট হবে আর্শিতে। মানুষ মার্গারেট এবং তার হাজার প্রতিবিম্ব এক ও অভিন্ন। ঈশ্বরও তেমনি বিশ্বের বিভিন্ন বস্তুরূপের মধ্যে পৃথক পৃথক সত্তারূপে প্রকাশিত। বিশ্বের পটভূমিতে সেই অসীম আত্মাকেই ঈশ্বর বলি আর মানবমনের পটভূমিতে সেই একই আসীম আত্মাকেই মানবাত্মা বলি। আসলে উভয়েই এক।

এর নাম আত্মজ্ঞান। যুগে যুগে মানুষ এই জ্ঞানেই দেবতাকে জেনেছে নিবিড় করে।

অনেকদিনের একটা সংশয়ের সুন্দর সমাধান হওয়ায় তার ভেতরটা খুশিতে ভরে গেল। শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতায় এবং গভীর অনুরাগে তার মনটা দীন হয়ে গেল। চোখের সামনে ভারতের সন্ন্যাসীর ভাস্কর্যের মত মুখখানি ফুটে ওঠল। বুকের ওপর দু'হাত রেখে তার দিকে যেন স্থির চোখে চেয়ে রইলেন। মার্গারেটের মনে হল সন্ন্যাসী তাঁর অন্তঃকরণকে দেখতে পাচ্ছে। তার ওপর চোখ রেখেই যেন কথাগুলো বলছেন ঃ—মানুষের মনটাই সব। এ যেন এক আশ্চর্য খনি। পৃথিবীর যাবতীয় রত্ন এই একটা ভাণ্ডারে মজুত রয়েছে। জহুরীর মত কেবল খুঁজে নেয়ার শিক্ষা করতে হয়। গভীর অনুশীলন আর অনুধ্যানের আলো পড়ে ভেতরটা যতক্ষণ আলোকিত না হচ্ছে ততক্ষণ আধার কাটে না। অন্ধকার একবার কাটলে তুমি আবিষ্কার করবে নিজেকে, এবং অনেক সত্যানুভূতি হবে।

নিজেকে দিয়ে বলছি, আমি যখন বুদ্ধকে অভীষ্ট করে ধ্যান করি আমি বুদ্ধ হয়ে যাই, যদি শঙ্করাচার্যকে অভীষ্ট করে ধ্যান করি শঙ্করাচার্য হয়ে যাই। আমার সামনে এক অদৃষ্টপূর্ব পুরুষ এসে দাঁড়ায়, আমি তাঁদের দেখি আর তাঁদের কথা বলি। আমার নিজের বলে কিছু বলার থাকে না। একেই বলে ভাবের আকারধারণ ভাবের প্রত্যক্ষীকরণ। মন ও বিশ্বাস একাগ্র হলেই তবে সত্যলাভ হয়।

স্বামীজির কথাগুলো তার দেহমন জুড়ে সুরের তরঙ্গ তুলল। শরীরের মধ্যে ঘুঙুর বাজতে লাগল। মনের সমস্ত তারগুলি যেন তাঁর কথার সুরেই বেজে ওঠল। "গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি, তখন তারে চিনি আমি তখন তারে জানি।"

ঘনঘন দরজার কড়া নাড়ার শব্দে মার্গারেটের ধ্যানভঙ্গ হল। বাইরে থেকে রিচমণ্ডের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল-দিদি দরজা খোল।

দরজাটা যে ভেতর থেকে বন্ধ করে রেখেছিল সেকথা স্মরণে ছিল না মার্গারেটের। নিজেকে আবিষ্কার করার এক নাছোড় নেশায় বুঁদ হয়ে কতক্ষণ এভাবে আর্শির সামনে যে বসে ছিল নিজেও জানে না। হঠাৎ কড়া নাড়ার খট খট শব্দে চমকে ওঠল। একটা গভীর স্বপ্ন থেকে হঠাৎ জেগে ওঠলে যেমন হকচকিয়ে যায় ; মার্গারেটও তেমনি দিশাহারা হয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে বলল ঃ এত চেঁচামেচি করে, দরজা ধাক্কাধাক্কির কী আছে? ঘরে ঢুকতে তো মানা নেই। ভেতরে আয় না!

বন্ধ দরজার ওপার থেকে রিচমণ্ডের গলা শোনা গেল। বলল ঃ দরজা বন্ধ থাকলে ঢুকব কী করে?

সম্বিৎ ফিরল মার্গারেটের। একরকম দৌড়ে এসে দরজা খুলে দিল। হাত ধরে তাকে সোফায় বসাল। অপরাধীর মত সংকোচে বলল ঃ ভীষণ ভুল হয়ে গেছে মাইরি। রাগ করিস না ভাই। এবারের মত ক্ষমা করে দে।

রিচমণ্ডের রাগ পড়ল না তাতে। বেশ একটু রাগত স্বরে বলল ঃ তোর যে কী করে কী হল কে জানে? আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না, দরজা বন্ধ করে থাকার মত কি হল?

মার্গারেট খুব সহজ করে বলল ঃ কিছুই হয়নি রে। মানুষের মন তো। একরকম ভাল লাগে না। মাঝে মাঝে নিরিবিলি এক কোণে চুপ করে বসে থাকতে ভাল লাগে। অথচ, এখানে সেরকম কোনো জায়গা নেই। দরজা বন্ধ করে একটু একা থাকার চেষ্টা আর কি।

মুখ গোমড়া করে একা থাকতে ভাললাগে কারো? সকলের সঙ্গে থাকার একটা আলাদা আনন্দ আছে।

আসলে কি জানিস, নির্জনতা কোথাও নেই। অথচ, মানুষ মাঝে মাঝে নির্জনতা খোঁজে। একটু নিরিবিলি চায়। তাতে নিজেকে বেশি করে অনুভব করা যায়। প্রতিবন্ধকগুলো সরিয়ে নিজের স্বরূপ দেখা এবং জানার জন্য পর্যালোচনা করা দরকার হয় বৈকি। সকলের মধ্যে থাকলে একাগ্রতা আসে না।

রিচমণ্ডও ভুরু কুঁচকে চেয়ে থাকে। তার অদ্ভুত চাউনির দিকে চেয়ে মার্গারেট্ বিস্ময় প্রকাশ করে বলল ঃ অমন করে তাকিয়ে কী দেখছিস।

তোকে। কত বদলে গেছিস। ভীষণ অচেনা মনে হয় তোকে।

তুইও কত বড় হয়ে গেছিস। কত গভীর করে ভাবতে শিখেছিস। আমার জন্য কত ভাবনা তোর। কিন্তু কষ্ট পাওয়ার মত সত্যি কিছু হয়নি। আমার সম্পর্কে তোরা কে কি ভাবিস, জানি না। তবে, আমার মন সত্যকে পাওয়ার জন্য আকুল। সত্যান্বেষণের ব্যাপারটা আমার মধ্যে আগে থাকতে বর্তমান ছিল। নইলে, স্বামীজির কথায় এত আকৃষ্ট হব কেন? তাঁর অনুভূতি উপলব্ধি একটু অন্যধরণের। মনকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। কথার সুগন্ধ মনকে ভরে রাখে। কী বিস্ময়কর সেই অনুভূতি—যেখানে আমি আছি, সেখানেও সত্য আছে। সত্যকে ধর্মে পাবে না ; সে তোমার মধ্যেই আছে। আত্মার ভিতরে সেই শক্তিকে কেবল জাগাতে হয়। তখন মনে হবে আমিই সমস্ত। এমন অদ্ভুত কথা আগে শুনেনি। তুই শুনেছিস?

রিচমণ্ড বলল ঃ যা কিছু নতুন এবং অভিনব তাই তোকে মুগ্ধ করে। স্বামীজির কাছে পুরনো ঠাকুর দেবতা বুড়িয়ে গেছে, এদের হাত থেকে কবে উদ্ধার পাবে মানুষ? এসব কথার অভিনবত্ব আছে, কিন্তু মাথামুণ্ডু নেই। কী যে বোঝাতে চান তিনি নিজেও ভাল করে জানেন না বোধ হয়।

মার্গারেট মুচকি হেসে বলল ঃ আছে রে আছে। কতকগুলো কুসংস্কার পুরনো বিশ্বাস, আনুষ্ঠানিক ধর্মকর্ম পালন করলে ধর্ম-করা হয় না। ধর্ম অনুষ্ঠান নয়, ধর্ম হল অনুরাগ—এই সত্যটা পুরনো ঠাকুর দেবতার বিশ্বাস নিয়ে জানা সম্ভব নয়। ওসব পুরনো ধ্যান-ধারণা বুড়িয়ে গেছে। নতুন চোখে নতুন ভাবনার আলোয় ধর্মকে বিচার করা তার মূল্যায়ন করা দরকার। আধুনিক মানুষকে আত্মসচেতন করার জন্যই সক্ষোভে, সখেদে কথাগুলো বলেছেন, বুঝলে ব্রাদার।

আঠারো বছরের রিচমণ্ড ঘাড় বেঁকিয়ে লক্ষ্মীট্যারা হয়ে মার্গারেটের দিকে চেয়ে রইল। নির্বাক চক্ষু দুটি তার অনেক বেশি কথা বলে।

মার্গারেট মাটিতে পা ঠুকে বলল ঃ এই ছেলে অমন করে আমাকে দেখার কী আছে। স্বর্গের পরী নই আমি, এই মর্তের মানবী।

রিচমণ্ড টেবিলের বইগুলি উল্টে পাল্টে দেখতে দেখতে বলল ঃ ভারতের বেদ, উপনিষদ, গীতার ইংরেজী অনুবাদ তোকে দিল কে?

মিঃ স্টাডির কালেকশান। আমাকে পড়তে দিয়েছেন। ভারতবর্ষকে জানতে হলে এই বইগুলি পড়া উচিত বলে মিঃ স্টাডি মনে করেন। রিচমণ্ড নিস্পৃহভাবে বলল ঃহবে। সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ প্রভাব এসব।

খারাপ তো কিছু না। এগুলি পড়েই জানলাম সন্ন্যাসী নতুন কিছু বলছেন না। বহু আগেই এই সব গ্রন্থে তা লেখা হয়েছে। ঐতিহ্যের পুনঃ নির্মাণ করে এই গ্রন্থগুলির গুরুত্ব ও প্রয়োজন নতুন করে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করছেন।

রিচমণ্ড নাটকীয় ভঙ্গি করে বলল ঃ হেথা হতে যাও পুরাতন, হেথায় নতুন খেলা আরম্ভ হয়েছে।

লাজুক অপ্রতিভতায় মার্গারেটের মুখ রাঙা হয়ে গেল। বলল ঃ ঠাট্টা করার কথা নয়। এই গ্রন্থগুলি নিয়ে বসলে আমি শান্তি পাই। আমাকে নতুন প্রাণ দেয়। নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করি। সংশয়, অবিশ্বাসে ফুরিয়ে যাওয়া জীবন নবীকৃত করে আমাকে শক্তিমান করে।

রিচমণ্ড বইটা সশব্দে বন্ধ করে দিয়ে বলল ঃ নতুন ভাবনা বাতাসে ওড়া শিমূল তুলোর বীজের মত।

মার্গারেট বললঃ ঠিক বলেছিস। উড়ে উড়ে বেড়াবে। তারপর মাটিতে পড়ে চলে যাবে মাটির গভীরে। এক সময় অঙ্কুরিত হয়ে শিকর মেলে দেবে মাটির অভ্যন্তরে ; ডাল পালা মেলে ধরবে আকাশের দিকে।

রিচমণ্ডের কথা হারিয়ে যায়। রিচমণ্ডও হঠাৎ নতুন করে অনুভব করল তার সহোদরাকে। মুগ্ধ বিস্ময়ে বলল ঃ দিদি তুই একটা জুয়েল। আমাকে তোর শিষ্য করে নে।

মার্গারেটের অধরে মৃদু হাসি। সেইসময় খোলা জানলা দিয়ে এক ঝলক হাওয়া এসে মার্গারেটের চুল এলোমেলো করে দিল।

কী আশ্চর্য! কী বিস্ময়! স্বামীজি আমেরিকা থেকে লণ্ডনে পুনরাগমন করেছেন খবরটা শুনেই মার্গারেটের মনটা চনমন করে ওঠল। মনে হল একটা নয়, অনেক স্রোত একসঙ্গে বুকের ওপর আছড়ে পড়ল। ইচ্ছে করল, সেই মুহূর্তে দৌড়ে যায় রিডিং শহরে মিঃ স্টার্ডির গৃহে। কারণ জাহাজ থেকে নেমে স্বামীজি সোজা তাঁর বাড়িতেই ওঠেছেন। এই অদ্ভুত ইচ্ছে হওয়ার সত্যি কোনো মানে ছিল না। কারণ স্বামীজিকে ইতিপূর্বে মোট তিনবার দেখেছে। তাঁর সঙ্গে শ্রোতা ও বক্তার দূরত্বটাই ঘোচেনি। কোনো রকম অন্তরঙ্গ পরিচয় হয়নি। এমন কি তাঁর মুখখানা মনে রাখার মতও ঘটনা ঘটেনি। সভায় আর দশজন সাধারণ শ্রোতার মত সেও বক্তৃতা শুনতে এসেছিল। সন্ন্যাসীর নজরে পড়ার মত কোনো বৈশিষ্ট্যই ছিল না। এমন কি তাঁর বক্তৃতার কুহকে এমন সম্মোহিত হয়ে গেছিল যে, তার সংশয়পরায়ণ মনটি তর্ক করতে ভুলে গেছিল। একজন সাধারণ শ্রোতাকে কে কবে মনে রাখে? সেই হিসেবে তাকে ভারতের সন্ন্যাসীর চেনার কথাও নয়। তাছাড়া, পাঁচ মাসের ব্যবধানে তার মুখখানি যদি মনে না পড়ে, বিস্মৃত হয় তাহলেও দোষ দেওয়া যায় না তাঁকে। অনন্ত প্রত্যাশা নিয়ে সন্ন্যাসী দর্শনে গিয়ে হতাশ হওয়া অপেক্ষা দূরে থাকা ভাল মনে করে সাক্ষাৎ থেকে বিরত হল।

মার্গারেট ব্যাকুল মনকে প্রবোধ দিল। এখন তাঁকে দেখতে যাওয়া মানে নাম না জানা অসংখ্য ভক্ত, অনুরাগী এবং কৌতূহলী মানুষদের সাড়িতে দাঁড়িয়ে একটি সংখ্যা বৃদ্ধি করা। কিন্তু মানুষের ভীড়ে সে কোনোদিন হারিয়ে যেতে চায়নি। আকাশভরা নক্ষত্রের মাঝখানে ধ্রুবতারার মত সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয়ের মুহূর্ত পর্যন্ত সে অনির্বাণ হয়ে জ্বল জ্বল করবে। তবেই না নজরে পড়বে। ঔজ্জ্বল্যের দাবিদার না হলে ধ্রুবতারা কি পারত পথহারা পথিকের নজর কেড়ে নিয়ে তাকে গন্তব্যে পৌঁছে দিতে। এই উপলব্ধিই তাকে জীবন সম্পর্কে অনেক কিছু ভাবতে শেখাল।

কোনো কিছু সম্পর্কে সংশয় এবং অবিশ্বাস পোষণ করার মধ্যে কোনো বাহাদুরি নেই। কিন্তু যে সংশয় যুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়, আবেগসর্বস্ব—যার কোনো শিকড় নেই; প্রত্যুত্তরের প্রতিযোগিতাকে বিতর্কে পরিণত না করে, কিংবা নীরব প্রশংসাতে তা যদি সমাদৃত না হয়, তাহলে সেই সংশয় প্রকাশ করে লাভই বা কি? মার্গারেট জানে, সংশয় থেকে নিঃসংশয়ে যাওয়া বড় যন্ত্রণা। বড় কষ্টকর। একজন মানুষ যখন অবিশ্বাস থেকে বিশ্বাসে ফেরে, অসত্য থেকে সত্যে পৌঁছয় তখন নিজেও যেমন ভরে ওঠে, অন্যদেরও তেমনি মনের আবরণ খুলে সত্যকে চিনতে শেখায়। এজন্য বিস্তর জ্ঞান দরকার

হয়। পড়াশুনা করতে হয়। সত্যকে জানতে, বুঝতে এবং আয়ত্ত করতে মার্গারেট স্বামীজির পুনরাগমন পর্যন্ত নিজেকে প্রস্তুত করল। এই সময়টা ছিল তার অনুশীলনের কাল। মনের গভীরে ঘুমিয়ে থাকা স্বামীজির কথাগুলো তাকে চুপ করে বসে থাকতে দিল না। কেবলই মনে হয় যে, একটা সময় দ্রুতগতিতে ধেয়ে আসছে আজকের এই ভোগী, বিজ্ঞানসর্বস্ব, গর্বিত, অহঙ্কারমত্ত অপ্রয়োজনের এবং প্রয়োজনের ভারে চাপা পড়া মানুষের দিকে, যে সময় প্রমাণ করবে, যে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকতে হলে প্রকৃতি আর ঈশ্বরের প্রেম ছাড়া বিকল্প কোনো পথ খোলা নেই। একটা মানুষের মধ্যে যা কিছু মহৎ, সুন্দর, মধুর, গভীর তার সুগন্ধ কেবল প্রকৃতি ও ঈশ্বর প্রেমেই বিকশিত হতে পারে।

স্বামীজির বক্তৃতাগুলির মধ্যে নিজের আত্মাকে সে দেখতে পায়। মনে হল এতকাল যাকে হৃদয়ের মধ্যে সন্ধান করছিল তার দেখা পেয়েছে। ভারতের সন্ন্যাসী সাগর পার থেকে বিশ্বজয়ের বাণী বহন করে এনেছে যেন। মার্গারেটের ভীষণ ভাল লাগল সন্ন্যাসীকে। তাঁর একটা বক্তৃতাও যাতে বাদ না পাড়ে সেজন্য দিনের কর্মসূচী বদলে ফেলল। যে নিরানন্দ অবসাদে দিন কাটছিল হঠাৎ সেই ভাবটা কেটে গেল। অন্তরে জ্যোতির উৎস খুলে যাচ্ছে। বেশ বুঝতে পরে তার মধ্যে এক নবীন সত্তার জন্ম হচ্ছে। সে এখন দ্বিখণ্ডিত। স্বামীজিকে দেখা এবং তাঁর ক্লাশ করার আগে পর্যন্ত যে জীবনটা ছিল সেটা একটা খণ্ড মাত্র। লণ্ডনে তাঁর পুনরাগমনের পর তার ভেতর যে নতুন সত্তার জন্ম হল সেটা আর এক সত্তা। স্বামীজির সংস্পর্শে তার বিকাশ হয়েছে। এই সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশেই তার দ্বিতীয় জীবনের সার্থকতা। যেহেতু সত্যলাভ হয়নি, তাই মনের সংশয় ঘোচেনি। মনের নিত্য বিরোধ লেগে আছে। সন্ন্যাসীর কাছে গেলে মন একটু-শান্তি পায়, বুকটা ভরে ওঠে। তাই তাঁর প্রতিটি ভাষণে, প্রতিটি সভায়, প্রতিটি আলোচনাচক্রে উপস্থিত থেকে বিশ্বসত্যের মূল রহস্য অনুধাবনের জন্য সেই আশ্চর্য পরমপুরুষের পাদমূলে বসে রুদ্ধ নিশ্বাসে তাঁর অনির্বচনীয় বাণী শুনত। সব কথা যে তার বোধগম্য হত তা নয়। জ্ঞানের দীনতা, দুর্বোধ্যতা কিংবা সংশয়জনিত বহুবিধ জিজ্ঞাসায় তার বুক তোলপাড় করত। একান্তে তাঁর কাছে বসে বিনম্র কণ্ঠে জিগ্যেস করত ঃ মহাত্মন, আশৈশবকাল থেকে একজন খৃস্টান ধর্মযাজকের বাড়ির মেয়ে হয়ে জেনে আসছি, পরোপকারই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। কিন্তু আপনি বললেন ধর্মদানই শ্রেষ্ঠ, পরে বিদ্যাদান। আপনার এই অভিনব বক্তব্য আমার কেন, এখানকার সকল শ্রোতার আজন্মলালিত বিশ্বাসকে ভেঙে দিল। নূতনত্ব সৃষ্টির জন্য কথাটা বলেছেন—এই অভিযোগ আনা কি খুব অন্যায়

হবে? মৌলিকত্ব সৃষ্টির জন্য একটা চিরন্তন বিশ্বাসকে স্থানচ্যুত করলে কি সকলে মেনে নেবে!

মার্গারেটের প্রশ্নে ভারতীয় যোগীর সমাহিত চিত্তকে সামান্য আঘাত করলেও তিনি ক্রুদ্ধ হলেন না। অর্ধনিমীলিত চক্ষু দুটি যেন কোন স্বপ্ন সায়রের অথৈ সলিলে নিমগ্নচেত হয়ে রহস্যমেদুর গলায় বললেন ঃ আমি যা বলেছি তা নূতনও নয়, পুরাতনও নয়। সে শুধু সত্য। সত্যের মত পুরনো কে? সত্য কিংবদন্তীর পাহাড়ের মত পুরনো। সৃষ্টির মত পুরনো, স্বয়ং ঈশ্বরের মত পুরনো। আবার বলছি, ধর্মদানই শ্রেষ্ঠ, পরে বিদ্যাদান, আর পরোপকারের মত যে কোনো প্রকারের দৈহিক বা জাগতিক দান সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের। এখন না বুঝলেও পরে এই কথাগুলি সকলকে ভাবাবে এবং সেই ভাবনার আলোকে কাজ করাবে, তা-হলে বলুন, বলে কি ভালো করিনি? ইট ইজ অলওয়েস এ ম্যাটার অব্ দি গ্রোথ অব্ দি ইনডিভিড্যুয়াল, এ কোশ্চিন অব বিয়িং অ্যান্ড বিকামিং—এর জন্য মহৎপ্রয়াস চাই, নিরলস জীবন মরণ সাধনা চাই। বস্তু থেকে ভাবে, প্রাকৃত থেকে অপ্রাকৃতে, মায়া থেকে মায়াতীতে উত্তীর্ণ হবার সবিশেষ আকূতি চাই। আমার বক্তব্যের মূল সুরটা ধরতে না পারলে দুর্বোধ্য মনে হবে না।

কোন এক প্রশান্ত ধ্যান রাজ্য থেকে সযত্নে কথাগুলি আহরণ করে স্বামীজি বলতে লাগলেন, সেকেলে নির্জীব অনুষ্ঠান আর ঈশ্বর সম্পর্কিত ধারণা প্রাচীন কুসংস্কার মাত্র। বর্তমানেও সেগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা কেন? জীবন ক্ষণস্থায়ী, সময়ও ক্ষিপ্রগতিতে চলে যাচ্ছে। তাই কালক্ষয় না করে যে পাত্রে যে কাজ হতে পারে সেই পাত্রই প্রত্যেকের বেছে নেওয়া উচিত।

শ্রোতারা কে কি বুঝল তারাই জানে। তবু কলরব করে হিয়ার, হিয়ার করে করতালি দিল তারা। মার্গারেটের মুখে কথা ফুটল না।

কিন্তু কাঁটার মত বিঁধে রইল। যতক্ষণ ঐ কাঁটাটি উৎপাটিত না হচ্ছে ততক্ষণস্বস্তি নেই তার। বক্তৃতার ক্লাস শেষ হওয়ার পরে লোকজন একটু হাল্কা হলে মার্গারেট তাঁর খুব কাছে বসল। বলল ঃ প্রভু, আমার সবগুলিয়ে যাচ্ছে। ধর্ম তো কতকগুলো প্রাণহীণ আচরণের সমষ্ঠি। কোথাও কোনো অনুভূতির বিদ্যুৎস্পর্শ নেই। তা-হলে ধর্মদানই শ্রেষ্ঠ দান হয় কেমন করে?

স্বামীজির দীপ্ত দুই চোখের তারায় স্নিগ্ধ খুশির দ্যুতি। বললেন ঃ কল্যাণী তোমরা দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছ বলে একটা গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে ভালবাস। মনটাকে প্রসারিত করতে ভয় পাও। একটু সাহস করে চোখ মেললে দেখবে সমস্ত মানুষের মধ্যেই দেবত্ব রয়েছে। নিদ্রিত দেবতাকে জাগানো এবং

তাঁর বাণী মানুষর কাছে পৌঁছে দেয়া শ্রেষ্ঠ দান নয় কি? সেই শ্রেষ্ঠ দানের নামই তো ধর্মদান। যে ধর্ম উদার, পরমত সহিষ্ণু, যা মানুষের মনকে বড় করে, পবিত্র করে, আশ্বস্ত করে, বিভেদ বৈষম্য দূর করে—যা সমুদয় দোষের উর্ধ্বে এবং যা সকলের হৃদয়কে আপ্লুত করে, সেই মুক্ত দৃপ্ত মহাজীবনের উপলব্ধির বাণী জনে জনে বিতরণের নাম ধর্মদান। অনন্ত প্রেম ও করুণা বুকে নিয়ে বুদ্ধ, যীশু, সেই ধর্মদান করেছেন মানবপূজায়। কারণ মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর আছেন বলেই তাঁকে উপলব্ধি করার নাম ধর্ম। ধর্ম নামশব্দের মধ্যে ঈশ্বরের তিলমাত্র প্রতিবিম্ব আছে বলেই ভাল লোককে ভালবাসি! মানুষ নির্বিশেষে পবিত্র, মঙ্গলময় জীবনযাপনে উৎসাহিত করার নামই ধর্মদান।

বিস্ময়মুগ্ধ হয়ে মার্গারেট চেয়ে আছে তাঁর দিকে। মুখ থেকে কী এক তেজ ফুটে বেরোচ্ছিল সন্ন্যাসীর। কণ্ঠে শঙ্খ বাজছিল যেন। হৃদয়ের ভেতর তার গম্ভীর শব্দধ্বনি কল্লোলিত হচ্ছিল। আর ধীরে ধীরে কেমন একটা অনাস্বাদিত পূর্বসুখের অনুভবে তার চেতনা আবিষ্ট হয়ে গেল।

একজন মানুষ নিজের অজান্তে নিঃশব্দে কখন, কীভাবে বদলে যায় নিজেও জানে না। বোধ হয়, স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তাও বলতে পারে না। বদলে যাওয়ার ব্যাপারটা হয় কখনও মন্থরভাবে, কখনও দ্রুত। বিভিন্ন ঘটনার টানাপোড়নের ভেতরে মার্গারেট খুব ধীরে, ধীরে এক অন্য মার্গারেট হয়ে ওঠছিল। জননীর চোখ দিয়ে মেরী ইসাবেল নোবল তোর ভাবান্তরকে প্রত্যক্ষ করে মনে মনে শঙ্কিত হল। পাছে, মার্গারেট তার আশঙ্কাকে টের পায় এবং নানাবিধ প্রশ্ন করে বুকের মধ্যে সযত্নে লুকোনো কথাটা বের করে নেয় তাই, ইসাবেল তার কার্যকলাপ সম্পর্কে চিরদিন ঔদাসীন্য দেখিয়েছে। এই কন্যাটি সম্পর্কে ইসাবেল মনেতে একধরনের ভয় পোষণ করে। কিন্তু সে ছাড়া অন্য কেউ তার আশঙ্কার কথা জানে না।

ভারতের সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ লন্ডনে পদার্পণের পর থেকেই ইসাবেলের মনের ভীতিটি প্রবল হল। ভারতের সন্ন্যাসী সম্পর্কে মার্গারেটের উত্তরোত্তর কৌতূহল, সুগভীর অনুরাগ এবং শ্রদ্ধা ইসাবেলকে শুধু বিচলিত করল না, ভীষণ ভাবিয়ে তুলল। যে ভয়টা স্বামীজির আগমনের পূর্বে অমূলক মনে হত, তাকেই এখন বাস্তব সত্য মনে হচ্ছে। ভাগ্যদেবতা, মার্গারেটের কপালে এক অদৃশ্য কালি দিয়ে যা লিখে দিয়েছেন তা ফলবেই। তার কান্নাকাটিতে তা থেমে থাকবে না। কিংবা মার্গারেটের ভাগ্যের চাকাটা উল্টো দিকে ঘুরবেও না। সে ছাড়া যে কথা কেউ জান না, সেই কথাটা প্রকাশ হয়ে

যাবে। জীবনে কিছু কিছু কথা তাকে যা জানাজানি হলে ভালোর চেয়ে মন্দ করে বেশি। তাই চুপচাপ থাকাটা ইসাবেল শ্রেয় মনে করত।

ইদানীং স্বামীজির প্রসঙ্গ নিয়ে মার্গারেটের কথাবার্তা ছিল খুব খোলাখুলি বাড়ীতে তাঁকে নিয়ে ভাইবোনের মধ্যে যত কথা হয় ততই অস্থির উৎকণ্ঠায় ইসাবেলের বুকের মধ্যে এক খামচাখামচি শুরু হয়। সব সময় একটা ভয়, শীঘ্রী তাদের পরিবারে একটা অঘটন কিছু হবেই। মার্গারেটের জীবনে একটা মোড় নেবে। সেই মোড়টা যে ঠিক কী, তা তার জানা নেই!

ছোট থেকেই মার্গারেট খাপছাড়া। ইসাবেলে নোবলের অন্য ছেলে মেয়ের মধ্যে একটু বেশি বেমানান। দুর্জয় তার জেদ। কোনো কিছুতে ভেঙে পড়ে না। আবার হারতেও জানে না! বিধাতা তাকে অন্য ধাতু দিয়ে গড়েছেন। তার ব্যক্তিত্বের একটা আলাদা গন্ধ আছে। রোজকার দেখাশোনার মধ্যে সেই গন্ধটুকু মন ভরে থাকে বলে আলাদা করে তাকে অনুভব করার দরকার হয় না। কিন্তু বাতাসে তার ব্যক্তিত্বের সৌরভ ফুলের গন্ধের মত লেগে থাকে। মজার কথা, ব্যক্তি স্বয়ং, তার ব্যক্তিত্বের গন্ধ চেনে না। কেবল বাইরে থেকে যে আসে, জানা থাকলে তবেই বলতে পারে সৌরভটা ধূপের, না তাজা ফুলের।

স্যামুয়েলের ভারত প্রত্যাগত এক পাদরী বন্ধু মার্গারেটের মধ্যে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের লক্ষণগুলো দেখেই চিনেছিল। মার্গারেটের অসাক্ষাতে বলেছিল ; স্যামুয়েল তোমার এখানে আমার এই আশা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তুমি এক অসামান্যা কন্যার পিতা। একাদিন তোমার মেয়ে মার্গারেট নিজেই এক ইতিহাস সৃষ্টি করবে। মানুষ চেনা যদি আমার ভুল না হয়, তাহলে দেখবে, ভারতবর্ষ একদিন নিজের কাজের জন্য মার্গারেটকে ডেকে নেবে। পৃথিবীর আর কোনো দেশের জন্য নয়, শুধু ভারতের জন্য ও নিবেদিত। ভারতের মানুষ ওকে মাথায় করে রাখবে। ও নিজেও ভারতীয় হয়ে যাবে। ও নিজেকে একজন খাঁটি হিন্দু বলে দাবি করবে। এ ওর ললাট লিখন। তোমরা চাইলেও পারবে না ওকে আটকে রাখতে।

ইসাবেলের ভেতরটা বিদ্যুৎ চমকানোর মত চমকাল। বিদ্যুস্পৃষ্ট হওয়ার শিহরণ বয়ে গেল স্নায়ুর মধ্যে। সত্যদর্শী ঐ খৃষ্টান ধর্মযাজকের ভবিষ্যদ্বাণী তা-হলে কি সত্য হল। ভারতের সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ কী ভারতবর্ষ থেকে সেই আমন্ত্রণলিপি বহন করে আনল, সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে যে অমৃতের পুত্র এদেশে এল সে তো শ্বেতাঙ্গ মানুষের কাছে পরম বিস্ময়! মাত্র তিনবছর হল সে পাশ্চাত্যে আছে। এর মধ্যে বেশ কয়েকজন নারীও পুরুষ তাঁর শিষ্য হয়েছে। তাঁরা, যে সে মানুষ নয়, ধনী, জ্ঞানী এবং সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি।

এছাড়া শত শত অনুগত ভক্ত ও অনুরাগী জুটেছে তাঁর। মনের অন্ধকার ঘরে আলো জ্বেলে দিয়ে তিনি তাঁদের হৃদয় আলোকিত করেছেন। অন্তরে তাদের মুক্তির হাওয়া বইছে স্বামীজি ছাড়া আর কাউকে জানে না তারা। এক আশ্চর্য মানুষ বশীকরণের ক্ষমতা আছে তাঁর। ইসাবেলের ভয় এবং আশঙ্কা সে' কারণে সর্বক্ষণ মনে হয় ঐ সন্ন্যাসীই মার্গারেটের জীবনে নিয়তির এক অমোঘ সঙ্কেতরূপে আবির্ভূত হয়েছে। নইলে মার্গারেট তাঁকে জয় করে গৌরবতৃপ্তি অর্জনের বাসনা করবে কেন? কি আছে ওতে? ইসাবেলের উৎকণ্ঠিত জননী হৃদয় স্যামুয়েলের বন্ধু ভারতের ধর্মযাজকের ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে মনে মনে নানারকম পর্যালোচনা করে। আর কন্যাকে হারানোর আশঙ্কায় এক দুর্বিষহ আতঙ্কে ভোগে। মনটা কুড়ে কুড়ে খায়। তথাপি, উৎকণ্ঠার কথা কাউকে বলতে পারে না। কারণ সত্যদ্রষ্টা ধর্মযাজকের ঐ ভবিষ্যদ্বাণী সে এবং স্যামুয়েল ছাড়া অন্য কেউ জানে না। মার্গারেট নিজেও নয়। ইসাবেল সযত্নে তাকে গোপন রাখতে চায়। কারণ, কথাটা ফাঁস হয়ে গেলে মার্গারেটের মনের ওপর তার পরোক্ষ প্রভাব পড়তে পারে। তাই খুব কষ্টে একা একা বহন করে বেড়ায় তাকে।

ইসাবেলের দিন কাটে আতঙ্কে। মার্গারেট সন্ন্যাসীর আমন্ত্রণ পেয়ে যদি ভারতে যাওয়ার বায়না করে তখন কী করবে সে? মৃত্যুর আগে স্যামুয়েল তার হাত দু'খানা ধরে বলেছিল ঃ মেরী, মার্গারেট আমাদের স্বপ্ন। একদিন তো তাকে ঈশ্বরের পায়ে সমর্পণ করেছিলাম। আজ যদি ঈশ্বর তাঁর কর্মের জন্য তাকে আহ্বান করে তবে আমরা বাধা দেবার কে? তুমি তার ইচ্ছায় কোন বাধা দিও না। মার্গারেটের ভারতের যাওয়ার ডাক যদি সত্যি সত্যি আসে আমার বন্ধুর ভবিষ্যৎবাণী সত্যি হয় তা-হলে ওকে আগলে রেখ না। স্নেহের ডোরে বেঁধে রাখার জন্য ওর কাজের পৃথিবীর পরিধিটা যেন ছোট না হয়ে যায়। আমাকে কথা দাও মার্গারেটকে ছেড়ে দেবে।

জল ভরা দু'চোখে ইসাবেল তার শীর্ণ হাত দুটির ওপর নিজের হাত রেখে বলল ঃ জীবনে তোমার কথা অমান্য করিনি। তোমার কাজেও বাধা দেয়নি। তুমি যা হতে চেয়েছে, তাই করতে দিয়েছি। নিজের সুখের কথা ভাবিনি। তোমার মেয়ের বেলায় তার ব্যতিক্রম হবে ভাবছে কেন?

স্বস্তির শ্বাস পড়ল স্যামুয়েলের। আরামে ও তৃপ্তিতে দু'চোখ বুজল। ইসাবেল সেই দৃশ্যটা আজও দেখতে পায়। সুতরাং, মন চাইলেও স্যামুয়েলকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে পারবে না। নিজে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেলেও হাসিমুখে কন্যাকে তার নিজের পথে চলতে দেবে। তবু, মায়ের প্রাণ তো! সন্তানকে চিরদিনের জন্য বিসর্জন দিতে বুক ফাটে। ঈশ্বর হয়তো সেজন্যই

তার মন প্রস্তুত করার সংকেত বহু আগেই তাকে দিয়েছিল। তথাপি, তাকে নেহাৎ একটা সাধারণ ঘটনা মনে করে ভুলেই ছিল। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার মধ্যে অনুরূপ ঘটনার অঙ্কুরোদ্গমের কোনো সম্ভাবনা ছিল না। অপ্রত্যাশিতভাবে ভারতে যাওয়ার সেই পথটা অদৃষ্ট যেন একটু একটু করে মার্গারেটের সামনে মেলে ধরল। স্বামীজিই তার মনের অভ্যন্তরে ভারতের মর্মবাণী শুধু পৌঁছে দিলেন না তার অধ্যাত্ম ভাবনাগুলো চিরে চিরে বিচার করার সময় নিজের অজান্তে মনটা ভারতের অধ্যাত্মসম্পদের প্রতি যাতে আকৃষ্ট হয়, তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বে অভিভূত হয় তার বীজ বপন করেছেন।

ইসাবেল স্বামীজিকে পছন্দ করে না জেনেও মার্গারেট অকপটে তার মনের ভাললাগার কথা বলল ঃ মা ভারতের সন্ন্যাসী এক আশ্চর্য মানুষ! আচার্য হওয়ার গুণ ও যোগ্যতা তাঁর আছে। মনে মনে ওঁকে আমার আচার্য বলে মেনে নিয়েছি। মনে হল, এতদিনে একটা গুরু লাভ হল। ওঁর পদতলে বসে অধ্যাত্মপাঠ নিতে নিতে মনে হয় এতকাল কিছুই জানা হয়নি। উনি যদি লন্ডনে না আসতেন তা-হলে এ জীবনটা স্কন্ধকাটা হয়ে থাকত। আমার আচার্য বলেন, যে সত্যটা আমি লাভ করলাম আগে থেকেই তা আমার মধ্যে ছিল। নইলে, তার প্রতি এমন আকৃষ্ট হব কেন? জান মা, মনে মনে তাঁর ডাক শোনার জন্য আমার ভেতরটা আকুল হয়ে ছিল। ভিতরে আমার আগুন জ্বলত, কিন্তু প্রকাশের ভাষা ছিল না। কতদিন কলম ধরেছি মনের আগুনকে ভাষা দেব বলে, কিন্তু কথা জোটে নি। আর আজ আমার কথা বলে শেষ করতে পারি না। এতদিন পরে এই দুনিয়ায় আমার জায়গাটা ঠিক খুঁজে পেয়েছি। গুরুই হাত ধরে আমার ঘরে আমাকে পৌঁছে দিয়ে বললেন ঃ তিনও নাকি অনেককাল আমার অপেক্ষায় বসে আছেন। এমন অদ্ভুত কথা শুনেছ মা! আচার্যের সঙ্গে আমার দেখা যদি না হত চিরদিন বেপথু হয়ে পথে পথেই ঘুরতাম। শান্তি পেতাম না।

ইসাবেল মুখ বুজে তার কথাগুলো শুনল। কিন্তু কেমন একটা অসহিষ্ণুতায় তাকে ছটফট করতে দেখল। স্বামীজির কথা শুনতে যে, ইসাবেল একটু আগ্রহী নয় তার মুখে চোখে তা প্রকাশ পেল। আচার্যের প্রতি তার মনোভাব বদলের জন্য মার্গারেট অভিমান করে বলল ঃ আমার আচার্যের কথা শুনলেই তুমি কেমন চোখ মুখ গোট কর। তোমার বিরক্তিটা গোপন থাকে না। তোমার নিস্পৃহ হওয়ার কারণ কি? আচার্য তো সন্ন্যাসী, তাঁকে তুমি দ্যাখনি, তবু তাঁকে সহ্য করতে পারনা কেন? ভারতীয়রা জন্মান্তরবাদ বিশ্বাস করে। তোমার অপ্রীতি ও ঔদাসীন্যের মূলে অনুরূপ কোনো জন্মান্তরের সংস্কার কাজ করছে কি? নইলে, তাঁর নাম শুনলে, তাঁর কথা বললে তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠ কেন?

ইসাবেল নিস্পৃহভাবে বলল ঃ এসব তোমার মন গড়া কথা। আমি আবার তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠলাম কখন?

তা-হলে কথা বল না কেন? চুপ করে থাকার মানে কি?

তোতা পাখির মত তুই যা বলিস, তার অর্থ আমার বোধগম্য হয় না বলে কোনো মজা পাই না।

অথচ তাঁর অদ্ভুত কথাগুলো ধর্মপ্রাণ মানুষের মনের দিগন্তকে বহুদূর প্রসারিত করে দেয়। নিজেকে তার মধ্যে খুঁজে পায়। এর নাম সত্যানুভূতি। মনের মধ্যে সেই সত্য নিহিত আছে। তাকে দেখার চোখ চাই। আত্মজ্ঞান অর্জন না হওয়া পর্যন্ত পরম সত্যের উপলব্ধি হয় না। আত্মজ্ঞান তোমার মধ্যে রয়েছে। তাকে শুধু উপলব্ধি করতে হয়। স্বামীজি একটা সুন্দর গল্প বলে দুরূহ বিষয়টাকে শ্রোতাদের কাছে সহজ করে দিলেন। গল্পটা সকলেরই জানা ছিল। কেবল মূল্যায়নটা জানা ছিল না। ঠিক জায়গায় পরিবেশন করার ফলে গল্পটা দামী হয়ে উঠল। একবার এক সিংহ শাবক ভেড়ার পালের সঙ্গে ঘাস খেয়ে বড় হচ্ছিল। হঠাৎ একদিন হ্রদে জল পান করছে। এমন সময় সেখানে একটি সিংহ জল পান করতে এল। স্বচ্ছ জলে নিজের প্রতিবিম্বের পাশে ঐ সিংহকে দেখে সে স্ব-স্বরূপ অবহিত হল। সে যে ভেড়া নয় সিংহ এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মাল। তখন ভেড়ার পাল ত্যাগ করে সিংহের সঙ্গে গহন অরণ্যে ফিরে গেল। অর্ন্তদৃষ্টি ছাড়া সত্যকে জানা হয় না। সত্যটা সিংহ শাবকের মধ্যেই ছিল।

বিরক্তিতে ইসাবেলের ভুরু কুঁচকে গেল। বলল ঃ তুই একটু কম কথা বল। খাচ্ছ, খেয়ে নাও। খেতে বসে এত কথা বলতে নেই।

সারাদিনের ভেতর এটুকুই তো আমার সময়। এই সময়টুকুতে আমি তোমাদেব সকলের সঙ্গে যেমন সম্পর্ক গড়ে তুলি, তেমনি নিজেকে প্রশ্ন করে জানতে চাই আমার লক্ষ্য কি ; ব্রত কি? ঈশ্বরের কোন কাজে আমি নিযুক্ত আছি। এবং আমার দাযিত্ব, কর্তব্য ঠিক ঠিক করছি কিনা, তাও তোমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে জানা হয়ে যায়।

ইসাবেল যথাসাধ্য নিজেকে সংযত রেখে বলল ঃ সন্ন্যাসী আমাদের ধর্মের কেউ নয়। আমাদের দর্শন এবং বিশ্বাসও আলাদা আলাদা। আমরা কেউ কারো ধর্মের হতে পারি না। তিনি কি বলছেন, তাই নিয়ে তোমার মাতামাতির কি আছে? নিজের ধর্মকে কেউ বিসর্জন দেয়? ঐ মানুষটি যদি লন্ডনে না আসতেন তা-হলে তোমার এতকালের ধ্যান-ধারণা কি নিরর্থক মনে হত?

মার্গারেটের অধরে কৌতুক হাসি। বলল ঃ মা, কোনো ধর্মের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ নেই। কোনো ধর্মকে তিনি ছোট করেননি। মানুষকে চিরন্তন সত্য চিনতে

শিখিয়েছেন। মা, আমার প্রভু শুধু একজন যোগী নন, তাঁর হৃদয় প্রেমে পূর্ণ, আর তাঁর স্মৃতি বহু যুগের ঐতিহ্য দিয়ে সমৃদ্ধ। তাঁর মত সত্যদর্শী ঋষির বাণী তাই ধর্মযাজকদের কণ্ঠে গির্জার বেদী থেকে উচ্চারিত ভাষণে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। কেন জান, আসলে যা সত্য তা নিজের প্রচার নিজেই করবে। তা-হলে বুঝে দেখ যদি তিনি না আসতেন তা-হলে জানা হত না বন্ধন ভেঙে ফেলার নাম মুক্তি। সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত হওয়ার নাম উদারতা। সত্যের কোনো সীমারেখা নেই। তার কোনো সম্প্রদায় নেই। ধর্ম ও সত্য এক। উপলব্ধিই সত্যের স্বরূপ চিনতে শেখায়। মানুষের যা কিছু সুন্দর এবং শ্রেষ্ঠ তার মধ্যেই ঈশ্বর আছেন। এর নামই আত্মজ্ঞান। উপলব্ধির মধ্যে সত্যের আলো না পড়লে মানুষের আত্মস্বরূপের উপলব্ধি হত না, জানা হত না সোহং—আমিই সে। অর্থাৎ এই ব্রহ্ম আমার ভিতরেই রয়েছে। যা এমন করে সকল সংশয় অবিশ্বাস এবং দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে সত্যের অন্বেষণ করতে কেউ শেখায়নি আমাদের। অথচ, এসব জানার জন্য আমার ভেতরটা আকূল হয়ে থাকত! তুমি তো জান, কী অশান্তিতে সাত আট বছর কেটেছে। যে সহজ সরল সত্য অন্তরে আমি বিশ্বাস করতাম, তাকে বাইরে কোথাও পাইনি। আমার সন্ধিগ্ধ মন যে শান্তি খুঁজছিল, এই সন্ন্যাসীর কাছে তা পেলম।

মেরী ইসাবেল তর্ক করল না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটা প্রবল অসহিষ্ণুতা তার মেজাজটাকে রুক্ষ করল। একটা চাপা রোষ ফুটে বেরোল তার কণ্ঠস্বরে। বলল ঃ সাধু সন্ন্যাসীরা মন ভেজানো ভাল ভাল কথা বলতে পারে। ওদের মন আলো করা কথা শুনে নাচা-নাচির আগে, তার ভাল মন্দটা বিচার করে দেখা তো দরকার।

মার্গারেটে নম্র গলায় শান্তভাবে বলল ঃ সত্যকে বুঝতে না পারা এক জিনিস, কিন্তু তাকে না বোঝার ভান করা অন্য ব্যাপার।

ইসাবেলের বুকের ভিতরে যে একটা হারানোর স্রোত বয়ে চলেছে মার্গারেট সেকথাটা জানে না। কিন্তু তার দিশাহারা দৃষ্টিটা ওর চোখের ওপর থমকে আছে। কয়েকটা মুহূর্ত দ্রুত কেটে যাওয়ার পর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারণ করল ঃ ওই সুদর্শন ও অদ্ভুত মানুষটার ব্যক্তিত্বের রহস্যময় আকর্ষণ এবং তাঁকে আবিষ্কার করার এক নাছোড় আকাঙ্ক্ষা তোকে মাতিয়ে রেখেছে। ভাল-মন্দ বিচারের শক্তি তোমার নেই। তোমার বয়সের ঐ যুবক সন্ন্যাসীর প্রতি তুমি মোহগ্রস্ত হতে পার, কিন্তু আমার তো কোনো দুর্বলতা নেই নিরপেক্ষ হওয়া তাই আমার পক্ষেই সহজ। আমি তোমার মা। তোমাকে সাবধান হওয়ার জন্য বলছি, ময়ূরের পুচ্ছ পরে দাঁড় কাকের

ময়ূর হওয়ার সাধ হলে তার দুকুলই যায়। নিজের সমাজে অবাঞ্ছিত হওয়ার যন্ত্রণা দুঃসহ।

মার্গারেট একটু হাসল। খেতে খেতে হাতটা তার থেমে গেল। বলল ঃ তোমার উপদেশ মনে থাকবে। কিন্তু যা সত্য, যা অনির্বার্য তাকে অস্বীকার করে তুমি তার প্রকাশ অবরুদ্ধ করে রাখতে পারবে না।

কিছু ভেবে না পেয়ে ইসাবেল নোবল ছুরি কাঁটা নামিয়ে রাখল। এরকম বিড়ম্বনার মধ্যে জীবনে পড়েনি সে।

খাবে না?

মার্গারেটের প্রশ্নে ঠাণ্ডা দুচোখ মেলে ইসাবেল নোবল মেয়ের দিকে তাকাল। কী উত্তর দেবে ভেবে না পেয়ে জলের পাত্রটা টেনে নিয়ে তাতে হাত ডোবাল।

মার্গারেট বেশ একটু অবাক চোখে তাকিয়ে থেকে বলল ঃ বেশ কিছুকাল ধরে দেখছি তুমি আমায় সহ্য করতে পারছ না। আমাকে দেখলে তুমি বিরক্ত হও। তোমার কী হয়েছে বল তো। আমি কোনো কথা বললেই তুমি দোষ ধর। আমাকে দোষী করে তুমি কি খুব সুখ পাও?

তুই আমার মেয়ে। শুধরে দেয়ার কথা বললে মায়েরা শত্রু হয় না। চিরদিন তুই স্বপ্ন দেখতে ভালবাসিস। এখন তো সত্যি সত্যি এক স্বপ্নের মধ্যে বিচরণ করছিস। এর কতটা সত্য, কতটা নয়-সেই ধাঁধায় পড়ে নিজেও এক যন্ত্রণায় ছটফট করিস। তোর প্রিয় ভাই রিচমণ্ডও বলেছে, নিজেকে ঘিরে তোর এক মস্ত অবিষ্কারের আরতি চলেছে। ওযে কি চায় নিজেও ভাল করে জানে না। যা কিছু অভিনব, নতুন তাই ওর মন টানে। আমিও জানি ছেলে মেয়েদের মধ্যে তুই বেশি আবেগপ্রবণ বলেই তোকে নিয়ে আমার ভাবনা হয়। কারণ, আবেগে গা ভাসিয়ে দিতে তুমি ভালবাস। কোথায় যাচ্ছ, কেন যাচ্ছ বিচার করে দেখ না। সাবধান হতে বলা যদি অপরাধ হয় তা-হলে আমি দোষী। আমি তখন শত্রু হয়ে যাই তোর। কিন্তু আমি তো মা, সন্তানের ভালটা আমাকে দেখতেই হবে। তুই না চাইলেও যেটা আমার ভাল লাগে না, খারাপ মনে হয় সেটা নিয়ে আমি অভিযোগ করবই।

রিচমণ্ড মুখ নিচু করে খেয়ে যাচ্ছিল। ইসাবেল হঠাৎ তার নামটা করায় সে বেশ একটু অস্বস্তিতে পড়ল। প্রতিবাদ না করলেও একটা অব্যক্ত বক্তব্য তার দু'চোখের বিস্ময়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠেছিল। মার্গারেট দেখল, রিচমণ্ড চোখে মুখে একটা নীরব প্রতিবাদ ফুটে ওঠেছিল। ইসাবেলের কথা শেষ হলে মিন মিন করে বলল ঃ সুন্দর সংসার সৃষ্টি করাও একটা সৃষ্টি কর্ম মা। মায়েরাই

সংসারকে কাব্যের মত করতে পারে। তুমি কি চাও, সারা জীবন ধরে একটা মিথ্যেকে সত্য বলে আঁকড়ে থাকবে। মানুষ তো যন্ত্র নয়। সে চিন্তা করতে পারে। চিন্তার জন্য স্বাধীনতা দরকার। হাঁ, আধ্যাত্মিক চিন্তাতেও চাই দুর্নিবার স্বাধীনতা। স্বামীজির সব বক্তব্যের মূল কথা সত্য।

ইসাবেল বেশ একটু বিরক্ত হয়ে ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বললঃ অতশত জানি না।

মেরী ধমকে বলল ঃ যদি না জান, তা-হলে চুপ করে থাকবে। দিদি নাবালিকা নয়। নিজের ভাল-মন্দ বোঝার বয়স তার হয়েছে। ওর মনটাকে তুমি কোনোদিন বোঝার চেষ্টা করনি। দিদি বলেই শান্ত মাথায় তোমার কথার কামড় সহ্য করে। তোমাকে বোঝানোর জন্য অনেক সময় ব্যয় করে। আমি হলে এত কথা বলতে পারতে?

মার্গারেট মেরীকে ভর্ৎসনা করে বলল ঃ আমার সঙ্গে মার কথা হচ্ছে, তোরা এর ভেতর কেন আসছিস। মার মনে কোথাও একটা বড় দুঃখ লুকোনো আছে। সেটা গোপন করতে গিয়ে মা নিজেকে রক্তাক্ত করে। মা মুখে না বললেও তাঁর হৃদয়ের কান্নাটা আমি শুনতে পাই।

মেরী মার দিকে কটমট করে চেয়ে বলল ঃ দেখলে, দিদির এই মন আমাদের কারো নেই। ওর অর্ন্তমুখী মন সব কিছুর গভীরে এমন করে যেতে পারে, একজন মানুষের মনকে, আত্মাকে আবিষ্কার করতে পারে, তুমি আমি সারাজীবন তপস্যা করেও পারব না।

ইসাবেলের বুকের ভেতরটা মথিত হল আবেগে, উচ্ছ্বাসে তীব্র আত্মাভিমানে। চোখ তার জলে ভরে গেল। বিচিত্র অনুভূতির শিহরণ ঢেউ খেলে গেল তার বুকে। উদ্‌গত কান্নায় রুদ্ধকণ্ঠে উচ্চারণ করল ঃ হা, ঈশ্বর, মায়েরা আর কতকাল শাস্তি পাবে? সন্তানদের কাছে এই কি সত্যি চেয়েছিল তারা?

মার্গারেটের ভেতরটা আকুল হয়ে ওঠল। মাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল বুকের মধ্যে। বলল ঃ মা, তোমাকে দুঃখ দিয়ে আমি কোনোদিন সুখ পাব না। সজ্ঞানে আমি কোনো অন্যায় করি না। তা-হলে, আমার ওপর রাগ করে তুমি নিজের ওপর অকারণ নিষ্ঠুর হবে কেন? মা, আমি তোমার খুব সাধারণ মেয়ে। একজন অত্যন্ত সাধারণ মানুষ। ছোট ছোট স্বপ্ন, সাধ নিয়ে নিজের মধ্যেই বাস করি। আমরা যাই করি না, তুমি আমাদের চেয়ে মনে এবং আদর্শে বড় হবে। যদি তুমি সুখী না হও, ভেঙে পড়, কিংবা ছোট ছোট ঘটনার পাথর চাপিয়ে নিজের মনকে আর্ত করে ক্লান্ত কর তা-হলে শত চেষ্টাতেও আমরা সুখের নীড় তৈরি করতে পারব না।

ইসাবেল কান্নায় ভেঙে পড়ল মার্গারেটের বুকে। দু'হাতে তার মুখখানা চোখের সামনে তুলে কাঁদতে লাগল। কেঁদে যেন অনেকটা সহজ হয়ে এল। মাথার ওপর হাত বুলিয়ে দিল। গালের ওপর গাল রেখে বলল ঃ সত্যি আমি যেন কী? কেন যে এত অস্থির, অশান্ত উদভ্রান্ত হই নিজেও জানি না। আমার দুঃখ ব্যথাটা যে ঠিক কোথায় এবং কিরকম তোকে বুঝিয়ে বলতে পারব না মা। শুধু শুধু তোকে দুঃখ দিই আর নিজেও দুঃখ পাই।

কদিন ধরে স্বামীজির বক্তৃতার ক্লাশে গেল না মার্গারেট। নিজের মনটাকে পরিস্কার করে যাচাই করে নেয়ার জন্যই অন্তরের গহনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মবিশ্লেষণ করে চলে নিরন্তর। অনেক প্রশ্ন করে নিজেকে। আপনার ভাবনার ভেতর ডুবে গিয়ে দৈববাণীর মত শুনতে পেল সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বর। অজ্যো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরানো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। ইংরেজিতে স্বামীজি তাঁর ব্যাখ্যা করলেন ; এই আত্মা শ্বাশ্বত এবং পুরাতন শরীরের মৃত্যু হলেও সে মরে না!" হন্যমান এ শরীর মাঝে যার/অজয় অমর সত্তার সম্ভার/পদে পদে গায় অসম্ভবের গান/তাই শুনতেই আজো পেতে আছি কান।" দূরাগত বাণীর মত তার হৃদয়ের অভ্যন্তরে সেতারের মধুর ঝঙ্কারের মত বাজতে লাগল স্বামীজির উচ্চারিত অভয়মন্ত্র ঃ অন্তরন্ত ইমে দেহয় নিত্যমোক্তা শরীরিণঃ। অনাশিনোহপ্রমেয়স্য তস্মাদ যুধ্যস্ব ভারত।" মার্গারেট নিজস্ব বিচার বুদ্ধি দিয়ে উপলব্ধি করল, প্রত্যেক মানুষের শরীর ছাড়াও একটা মন আছে। শরীর ও মনের দ্বন্দ্ব নিত্য লেগে আছে। মন থাকলেই তার নানারকম প্রতিক্রিয়া থাকবে। এ থেকে কোনো মানুষ মুক্ত নয়। মুক্ত হওয়ার জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হয় তাকে। মনের সঙ্গে নবীন হয়ে ওঠার সেই সংগ্রাম বোধ হয় শুরু হয়ে গেছে তার ভেতরে। সেজন্য এত বেদনা নিয়ে এত রক্তক্ষরণ হয়।

এই অনুভূতি মার্গারেটের নতুন। এই মনটি ভারতের মহাযোগীর সৃষ্টি। তাঁর প্রভাবের আলো পড়ে এক নতুন মার্গারেটের জন্ম প্রত্যক্ষ করে তার ভেতর। বহুকালের খৃষ্টান ঐতিহ্যের সংস্কার ও বিশ্বাসের সঙ্গে একোন বিরোধ সৃষ্টি হল তার? হৃদয়ের অন্তস্তলে এ কোন ঝড় তুলল সন্ন্যাসী? দূরাগত দৈববাণীর মত সন্ন্যাসীর কণ্ঠে শিব শিব ধ্বণিত হতে লাগল। আর এক আশ্চর্য পুলকে সারা শরীর শিহরিত হল বার বার। ঐ ভাষা এবং শব্দের অর্থ সে বোঝে না। তবু এক অব্যক্ত ভাল লাগার আকুলতায় তার ভিতরটা ছটফট করে ওঠল। সন্ন্যাসীর দিব্যমূর্তি, উজ্জ্বল দুটি চোখের ওপর বাঁকা ধনুকের মত দুটি ভুরুর রেখা ছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না। হঠাৎই অদ্ভুত অদ্ভুত কৌতূহল জিজ্ঞাসার বিস্ফোরণ ঘটে গেল তার বুকের ভেতর।

সেই শুরু। স্বামীজির বক্তৃতার মধ্যে একঘেয়ে জীবনটাকে নতুন করে অনুভব করল। এই অভিজ্ঞতাটা কোনোদিন ফুরোবে না। তাঁর সান্নিধ্যে না এলে বোধ হয় জানা হতো না জীবনের অনেক আনন্দের মত মনের মধ্যেও কত সব অজানা সত্যকে জানার তৃষ্ণা লুকোনো আছে। মার্গারেটও জানে, ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে তার মনের বিশ্বাসগুলো একটু অন্যরকম। ধর্ম তার কাছে আচারসর্বস্ব কতকগুলি অনুশাসন এবং বিশ্বাসের বস্তু নয়, যাচাই করার বিষয়। স্বামীজির বক্তৃতাগুলি তাকে সেই পথের সন্ধান দিল। জগতের উৎপত্তি, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, আত্মার রহস্য, মৃত্যু কি জীবনের সমাপ্তি—এইসব জিজ্ঞাসা নিয়ে তার অনুভবগুলো চিরে চিরে বিচার করা এবং তর্ক করার সময় সে খুব সতর্ক থাকত। স্বামীজিব প্রত্যেকটি বাক্য এবং যুক্তিকে সে বাজিয়ে নিত। বাজিয়ে দেখার প্রবণতা তাকে শান্ত থাকতে দিত না। সংশয়ের কী নিদারুণ যন্ত্রণা নিয়ে মনের অন্ধ-কারায় মাথা ঠুকছে। মুক্তি পাগল মনটা পথের সন্ধান করে ফিরছে। সংশয়ের পথ বড় দীর্ঘ, কিছুতে শেষ হতে চায় না। এ পথে, প্রতিপদক্ষেপে কেবলই যন্ত্রণা। শ্রদ্ধা, ভক্তি ভালবাসায় মনটা যত দীনই হোক না কেন, বুদ্ধির অহংকার ত্যাগ করতে পারে না। সব কিছুর সত্য-মিথ্যে যাচাই করে তবে সে সত্যে পৌঁছয়। বাজিয়ে দেখার এই প্রবণতা তাকে ক্লান্ত থাকতে দেয় না। স্বামীজিও বললেন ঃ ধর্মকে পরীক্ষা করে নাও ধর্মকে এমন রূপ দাও, যা কোনো কিছুতেই সত্যকে ছোট করবে না। সত্য চিরপ্রোজ্জ্বল। ধর্ম ও সত্য এক।

মার্গারেট তন্ময় হয়ে শুনত। হৃদয়ের অন্তস্তলে অবিচ্ছিন্ন চিন্তার স্রোত বয়ে চলে। সংশয়-কুহেলিকার আবরণ ভেদ করে ধীরে ধীরে সত্যরূপ সূর্যের আলো প্রকাশ পায়। অন্তর জ্যোর্তিময় হয়ে ওঠে। প্রতিবাদী বিরুদ্ধ যুক্তিগুলির

ধার কমে আসে। সকল দ্বন্দ্বের অতীত সেই অনির্বচনীয় সত্তার সঙ্গে সে একাত্মতা অনুভব করে। হৃদয় উদ্বেলিত হয়। এ এক নূতন অভিজ্ঞতা তার। আশ্চর্য লাগে, স্বামীজিকে হারাতে চেয়েছিল। ভেবেছিল, নিজে হেরে না গিয়েও বস্তুবাদী পাশ্চাত্য দর্শন এবং বিজ্ঞানধর্ম দিয়ে তাঁকে হারানো সহজ হবে। কিন্তু আশ্চর্য নিজে না হেরে গিয়েও যদি একজন মানুষ নিজের যুক্তিতে এবং অনুভবে আস্থাশীল না থাকে, তবে সে হারটা তার নিজের কাছেই হয়ে যায় নিঃশব্দে। বাইরে থেকে কেউ তা দেখতে পায় না, কিন্তু অন্তরে হেরে গিয়ে লজ্জায় কাঁদে মুখ লুকিয়ে। সন্ন্যাসীর কাছে অলক্ষ্যে সে হেরে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। অথচ, সেজন্য কোনো আত্মগ্লানি নেই। মন আলো করা প্রসন্নতায় ঝলমল করে তার ভেতরটা। কে জানে এভাবে নিজের কাছে হেরে যাওয়াটাই বড় জেতা। স্বামীজির বক্তব্য এবিষয়ে খুব খোলাখুলি—মানুষ যা চিন্তা করবে, তাই হবে সে। জয়ী ভাবলে জয়ী হবে, হার ভাবলে হারই হবে। নিজের মধ্যেই মানুষের সমস্ত জ্ঞান, শক্তি এবং পরিপূর্ণতা বিরাজ করছে। কিন্তু তাকে উপলব্ধি করতে পারে না, কারণ বিশ্বাসে তার জোর নেই। সংশয়ে, অবিশ্বাসে, দ্বিধায় সে নিজেকে অজ্ঞাত রেখেছে। তাই, অজ্ঞতা থেকে জ্ঞান ফেরা এবং অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরা বড় যন্ত্রণার বড় কষ্টের। বিশ্বাসে পৌঁছনোর পথে এই স্তরগুলি পরপর সাজান রয়েছে তার ভিতরেই। পরীক্ষা দিয়ে দিয়ে তবে উত্তীর্ণ হতে হয় তাকে।

বক্তৃতার ক্লাশে মার্গারেট কয়েকদিন গেল না। তার অনুপস্থিতি স্বামীজিকে বেশ একটু ব্যাকুল করল। ভিক্টোরিয়া স্ট্রিট থেকে অদ্ভুত সব খবর আসে। বেশ কিছু মার্গারেটের গুণগ্রাহী, স্বামীজির ভক্ত এবং সিসেম ক্লাবের সদস্য তার সঙ্গে দেখা করে সত্য-মিথ্যে মিশিয়ে কত কথাই বলে। স্বামীজি নাকি তার মনের অবস্থাটা ভাল করেই জানেন। অবিশ্বাসী মন নিয়ে নিজের সঙ্গে যে সংগ্রাম করছে মার্গারেট অনুরূপ সংশয় অবিশ্বাস নিয়ে একদিন স্বামীজিও তাঁর গুরুকে মেনে নিতে মনের সঙ্গে নিরন্তর লড়াই করছিলেন, শ্রোতৃমণ্ডলীকে তার গল্পও বলেছেন।

গুরু রামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা হওয়া থেকে আমার মনে একটা দারুণ ঝড় ওঠল। কলেজে পড়ার সময় এই যোগী সম্পর্কে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুনেছিলাম কথা বলতে বলতে তাঁর ভাব সমাধি হত। মানুষটিকে দেখার লোভেই দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে গেলাম একদিন। সেই সময় আমি একজন ঘোর নাস্তিক বলেই বন্ধু সমাজে পরিচিত। বিজ্ঞানের যুগে ভয়, ভক্তির কোনো স্থান নেই। ঈশ্বরের আদেশ বললেও তা মানা হবে না, চাই যুক্তি এবং

প্রমাণ। তবু কোটি কোটি মানুষ নিরাকার, এক অদৃশ্য শক্তিকে ঈশ্বর বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু ঈশ্বর আমার কাছে কল্পনার বস্তু। ঈশ্বরের কোনো বাস্তব অস্তিত্ব আছে বলে বিশ্বাস করতাম না। পাথরের মূর্তিকে ঈশ্বর বলে পূজা করার মূর্খতা সহ্য করতে পারতাম না। অথচ আমার গুরু নাকি মৃন্ময়ী মূর্তির মধ্যে ঈশ্বরের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর সঙ্গে কথাও বলেন। যুক্তিহীন আষাঢ়ে রটনা বলে উড়িয়ে দিলাম। মানুষ ঠকানো এই সব গল্পে আমার কোনো আকর্ষণ ছিল না।

বন্ধু বান্ধবের পাল্লায় পড়ে একদিন তাঁর কাছে যেতে হল। মানে জোর করে তারা নিয়ে গেল। মানুষটা আর পাঁচটা সাধুর মত নয়। পরনে গেরুয়া কাপড়ও নেই, মাথায় চূড়া করা জটাও নেই। গ্রাম্য লোকের ভাষায় কথা বলে। কথায় শালীনতার অভাব। একটুও সাধু বলে মনে হয় না। তবু এই সহজ সরল মানুষটাকে লোকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে। পাগল ঠাকুর এই বিশ্বাস নিয়ে মেতে আছে। বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, ভক্তি নিয়ে এরা এতই মেতে থাকে যে দেখতে ভাল লাগে। বন্ধুরা ঐ যোগীর সঙ্গে গায়ক বলে আমার পরিচয় করে দিল। গান গাইতে বাধ্য করল। মন উজার করে গাইলাম। কে যেন আমাকে দিয়ে গাওয়াল ঃ মন চল নিজ নিকেতনে/সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে/ভ্রম কেন অকারণে?

গান শেষ হলে দেখলাম মানুষটির আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। একেবারে মোহিত হয়ে গেছেন। চোখ দুটি স্থির। মুখে চোখে একটা অপার্থিব ভাব। চোখের কোণে জল জমেছে। মনে হল মানুষটি এ জগতের নয়। ভীষণ অচেনা মনে হল তাকে। ঘোর লাগা আচ্ছন্ন ভাবটা কাটতে কয়েকটা মুহূর্ত্ত কেটে গেল। সমাধিভঙ্গ হলে আমার হাত ধরে পাশের ঘরে এনে বসালেন। আমার চোখের ওপর চোখ পেতে রাখল। ওঁর চোখের ভাষা আমি পড়তে পারছি না। বুকের মধ্যে আমার মৃদঙ্গ বাজছে। অশ্রু রুদ্ধ কণ্ঠে বলল ঃ ওরে এতদিন পরে আসতে হয়? আমি যে তোর অপেক্ষায় বসে আছি। আর তুই কিনা একবারও আমার কথা ভাবিস না। হাঁরে নরেন, এতদিন কেন আসিস নি আমার কাছে। তুই যে আমার সে।

আমি স্তম্ভিত। কী জবাব দেব। আমি তো তাঁকে চিনিই না। লোকটাকে বদ্ধ পাগল বলে মনে হল।

কিন্তু ওঁর কথায় এমন একটা নিবিড় আন্তরিকতা ছিল ; আপন করে নেবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল যে আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। শুধু তাই নয়, বিধাতা ওঁর কণ্ঠে মানুষকে আহ্বান করার শক্তি দিয়েছেন। ওঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে,

ব্যবহারের মধ্যে এমন একটা সুগন্ধ ছিল যে, আমার মনটা ভরে ছিল। ওই মায়াবী কণ্ঠস্বর আর ব্যক্তিত্বের সুগন্ধ তাঁর কাছে টেনে নিয়ে গেছে। শিশুর মত জিগ্যেস করিছি ঃ আপনি ভগবান দেখেছেন। তাঁকে দেখতে কেমন?

উনিও শিশুর মত ঘাড় কাত করে দ্বিধাহীনভাবে তৎক্ষণাৎ বলেছেন। হাঁরে, দেখিছি বৈকি। খুব কাছ থেকে দেখিছি। যেমন তোকে দেখছি তেমনি তাঁকেও দেখতে পাই। তোর ও আমার মতই দেখতে। মা-ছেলের মত কত কথা হয়।

কথাগুলো শুনতে ভাল লাগল। সুধা ভরা কণ্ঠস্বর আমার দু'কান ভরে রইল। আশ্চর্য হওয়ার মত বিবৃতি! কিন্তু ওতে তো প্রমাণ হল না। যোগীরা সম্মোহনী ক্ষমতা দিয়ে অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। চোখের ভ্রম এবং মনের মোহ কাটানোর জন্য দক্ষিণেশ্বর যাওয়া বন্ধ করলাম। কিন্তু দক্ষিণেশ্বর আমাকে ছাড়ে না। সেখান থেকে অদ্ভুত অদ্ভুত সব খবর আসে। মানুষটি আমার অদর্শনে ব্যাকুল হয়ে কাঁদছেন। রাতে ঘুম থেকে জেগে ওঠে শিশুর মত বায়না ধরেছেন ওরে আমার নরেনকে এনে দে।

মাঝে মাঝে মায়ের মন্দিরে গিয়ে বলছেন—মাগো নরেনের জন্য এত কাঁদলাম, তবু একবারটি আমার কাছে সে এল না। তার জন্য প্রাণটা আমার ফেটে যাচ্ছে। আবার অনুশোচনা করে নিজের কাছে নিজেই নালিশ জানিয়ে বলছে, বুড়ো মিনসে তার জন্য এভাবে কাঁদছি দেখলে, লোকে কী বলবে আমায়। কিন্তু কী করব মা, আমি যে সামলাতে পাচ্ছি না।

এসব শোনার পর কেউ স্থির থাকতে পারে? আমার ভিতরটা সত্যি তাঁর জন্য অস্থির হল। দক্ষিণেশ্বরের জন্য মনটা ব্যাকুল হল। তবু কষ্ট করে নিজেকে ঠেকিয়ে রাখলাম। কিন্তু ঐ পাগল মানুষটা শিশুর সারল্য স্বার্থশূন্য ব্যাকুলতা, বুকভরা অনন্ত বাৎসল্য নিয়ে একদিন আমাকে দেখতে নিজে এলেন কোলকাতায়। ওরে নরেন,ওরে নরেন বলতে বলতে ঢুকলেন ঘরে। তারপর সকলের সামনে কাঁচু মাচু হয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদ কাঁদ গলায় বললেন আমার ওপর রাগ করে থাকতে তোর কষ্ট হয় না? তোকে না দেখে যে আমি থাকতে পারি না। বুকটা আমার মোচড়ায় তোর জন্য। ওরে, রাধিকার মান ভাঙতে প্রেমের ঠাকুর কৃষ্ণকেই দৌড়ে আসতে হয়েছিল তার কুটীরে। তুইও যে আমার সে। তোকে না দেখে থাকতে পারি? এবার যখন তোকে পেয়েছি, আর ছাড়ব না বাপু।

মার্গারেট নীরব শ্রোতা হয়ে সে অদ্ভুত, অত্যাশ্চর্য গল্প শুনল। বুকের মধ্যে সত্যি কষ্ট হচ্ছিল তার। সেই কষ্টে তার কাঁদতে ইচ্ছে করছিল। মুখ নিচু করে

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল। স্বামীজি হঠাৎ তাঁর গুরুর গল্প শোনালেন কেন? তবে কি তাঁর গুরুর মত তিনিও প্রতীক্ষা করছেন তার? প্রত্যেক মানুষের কিছু কিছু দুর্বলতা থাকে, যখন অনেক থেকেও কিছুমাত্রই থাকে না, তখন নিজের কাছেই তার জবাব দিহি করতে হয়—আসল আমি তার একা আমির সর্বস্ব সম্বল করে দাঁড়াতে হয় নিজের মুখোমুখি। এরকম একটা গভীরবোধ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিরুচ্চারে উৎসারিত হল ঃ গুরু আমার, প্রভু আমার। তোমাকে না দেখে আমিও থাকতে পারছি না।

বিদ্যুৎ চমকানোর মত মার্গারেটের ভিতরটা চমকাল। অমনি মনে হল, সত্য যা তা এমনি অমোঘভাবেই হঠাৎ প্রকাশিত হয়। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারানো মার্গারেট বলল ঃ আমার প্রভু। আমার রাজা! তোমার দয়াল গুরুর মত আমারও বুক ভরে বলতে ইচ্ছে করছে-তুমিই আমার সে। আমি যে তোমার অপেক্ষায় বসে আছি। তুমি কি গো, একবারও আমার কথা ভাব না। সত্যি তুমি বড় নিষ্ঠুর। তোমার গুরুকে কাঁদিয়েছ, আমাকেও কাঁদাচ্ছ। আর কতকাল কাঁদাবে।

ভাবাবেগে মার্গারেটের দু'চোখ ভরে জল নামল। বুকের মধ্যেও তার কী যেন গলে গেল। কী যেন নয়, পুরো বুকটাই গলে যেন নদী হয়ে যাচ্ছে। মানুষের মনের গন্ধই নদী হয়ে আপনি ছড়িয়ে যায় অন্য মানুষের অন্তরে।

জীবন বৃত্তান্তের ঘটনাগুলোর মধ্যে মার্গারেট একের পর এক প্রবেশ করছিল। কিন্তু সেগুলো পরের পর ঘটনা কিনা জানে না। পরের পর যে হতে হবে এমন কোন বাধা ধরা নিয়ম নেই। ঐ দিনগুলোর স্মৃতি সবই একসঙ্গে মনের মধ্যে চিন্তার মধ্যে বর্তমান। মার্গারেট ক্ষণে ক্ষণে তার মধ্যে প্রবেশ করছিল। গোটা অতীতটা তার মন জুড়ে আলোড়িত হতে লাগল।

সেদিন ছিল শুক্রবার। মার্গারেট চুপি চুপি বক্তৃতার ক্লাশে স্বামীজির সামনেই বসল। তার পাশে বসে ছিল মিস ম্যাকলয়েড। স্বামীজির একজন পরমভক্ত হয়ে আমেরিকা থেকে এসেছে সে। বিত্তশালী এই মহিলা মার্গারেটের চেয়ে বয়সে বড়। তবু উভয়ের মধ্যে খুব ভাব। ম্যাকলয়েড ক্যাব ভাড়া করে রোজ রাতে উইম্বলডনে তাকে পৌঁছে দেয়।

বক্তৃতার ক্লাশ তখন শুরু হয়নি। মঞ্চে প্রিয় পার্ষদ সারদানন্দ, গুডউইন, স্টাডির সঙ্গে আলাপে মগ্ন। ম্যাকলয়েডের এক চোখ স্বামীজির দিকে আর এক চোখ মার্গারেটের ওপর। ফিস ফিস করে বলল ঃ স্বামীজিকে আজ খুব

খুশি দেখছি। তুমি আসাতে উনি খুশি হয়েছেন। দেখ, ওঁর বক্তৃতা আজ খুব ভাল হবে। তুমি থাকলে সত্যি ওর বক্তৃতা অসাধারণ হয়।

মার্গারেট একটু লজ্জা পেল। মুখ লাল করে প্রতিবাদ করে বলল ঃ ননসেন্স টক্। হি ইজ অ্যান অরেটর বাই ডিভাইন রাইট। এর সঙ্গে আমার মত ক্ষুদ্র মানুষের হাজিরার কোনো সম্পর্ক নেই। ওঁর মত মানুষের বক্তৃতা কারো থাকা, না-থাকার ওপর নির্ভর করে না। উনি সন্ন্যাসী।ওঁর কোনো তাপ-উত্তাপ নেই। মঞ্চে যে মানুষটিকে এখন হাসি ঠাট্টা করতে দেখছ, একটু পরে উনি যেই বক্তৃতা করতে দাঁড়াবেন অমনি ঐ রূপটাই বদলে যাবে। এক অন্য মানুষ হয়ে যাবেন। এই ভাবটাই তখন আর থাকবে না। ওঁর ভেতর থেকে তখন এক মহা তেজস্বী শক্তিমান বাগ্মী আবির্ভূত হবে। সম্পূর্ণ বিভোর! সম্পূর্ণ আত্মাহারা। সম্মুখে বাতাসের বা শূণ্যের মধ্যে কি যেন নিরীক্ষণ করেন আর কণ্ঠস্বর তরঙ্গবৎ কল্লোলিত হয়।

ম্যাকলয়েড মুখ টিপে হাসল। তারপর ঢোক গিলে বলল ঃ গত মঙ্গলবার প্রশ্নোত্তরের আসরে তো তুমি ছিলে না। আমাকে, মিসেস মুলারকে এবং ওলি বুলকে রীতিমত র্ভৎসনা করে বললেন, তোমরা সব রক্ত মাংসের পাথর। তোমাদের কি কোনো কৌতূহল নেই? জানতে ইচ্ছে করে না। চুপ করে গুরুর কথা শোনাটা মোটেই ভাল নয়। ভক্ত হওয়ার চেয়ে নাস্তিক হওয়া ভাল। হাঁ, ইট ইজ বেটার টু বি অ্যান এ্যাথেইস্ট দ্যান টু বি এ পিটিস্ট। নাস্তিক হওয়ার জন্য সাহসের দরকার। ভক্তেরা ভীরু, নিস্তেজ। অন্যের আশ্রয়ে কিংবা আনুগত্য স্বীকার করা আমার একটুও ভাল লাগে না। তেজহীন ভক্ত জীবস্মৃত হয়ে থাকে। ভিতরে যদি শক্তি থাকে তা-হলে সে নাস্তিক হলেও পরে আস্তিক হতে পারে। দ্বৈতভাব থাকলেই তার ভয়, ত্রাস, দ্বিধা, দুর্বলতার ভাব থাকবেই। অদ্বৈতবাদের মধ্যে এর কোনো চিহ্ন নেই। অহংই তার অন্তরে ও বাইরে সমভাবে বিদ্যমান। কথাগুলো আমাদের বললেও কিন্তু লক্ষ্য তুমি। তোমার কথা মনে রেখে ভাববাচ্যে তোমার মত হতে বলেছেন আমাদের।

মার্গারেট দৃঢ়তার সঙ্গে বলল ঃ আমি মনে করি না। উনি ইস্পাতে তৈরি। ভাঙবেন কিন্তু মচকাবেন না। অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী বিশ্বাস করেন, প্রত্যেক মানুষের সব শক্তি তার ভিতরে আছে। তাকে শুধু জাগাতে হয়। ভক্তিপ্রভাবে ভক্ত আত্মশক্তি বিস্মৃত হয়। এই মায়া থেকে মুক্ত হওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন তোমাদের। কারো কথা মনে রেখে এসব উপদেশ শোনানোর মানুষ তিনি নন।

ম্যাকলয়েড কৌতুক করে বলল ঃ মায়া বড় খারাপ জিনিস।

তবু মায়াবশে হিতোপদেশ গল্পের ঋষিকে মার্জার তাড়িত এক ইঁদুর আশ্রয় দিল। শরণাপন্নের ভীতির অবসান ঘটাতে মায়াবশত ঋষি তাকে মার্জার করে দিলেন। তারপর কুকুর এবং সিংহে পরিণত করলেন। সিংহরূপ ধরেই সে ঋষিকে বধ করতে উদ্যত হল। কুপিত ঋষি তখন, পুনরায়, মুষিক করে দিলেন তাকে। এর মানে মায়ার বন্ধনটা যখন ভয়াবহ রূপ ধারণ করে তখন মায়া সিংহের মত সংহারী হয়ে আত্মনাশেপ্রবৃত্ত হয়। সেই মুহূর্তে ঋষির মত মায়ামুক্ত হয়ে তাকে ত্যাগ করতে হবে। আত্মসংহারী মায়া থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সত্যোপলব্ধির দরকার। মায়ারূপী সংহারী সিংহ যে মুষিক ছাড়া কিছু নয় এই আত্মজ্ঞান থাকলে মায়াকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন কিছু নয়। হিতোপদেশের সিংহের পুর্নমুষিকীকরণ গল্পে মায়া অতিক্রমণের এক আশ্চর্য পশ্চাৎপট সৃষ্টি হয়েছে।

ম্যাকলয়েড বেশ একটু চমৎকৃত হয়ে বলল ঃ সুন্দর ব্যাখ্যা। একমাত্র আত্মোপলব্ধিতেই দুর্বলতা দূর হয়।

আসলে সব হিতোপদেশের গল্পের মধ্যে একটা জীবন দর্শন এবং যুক্তি রয়েছে। মায়াতে তন্ময় হওয়ার নামই বন্ধন। এই বন্ধন ভেঙে ফেলার নাম মুক্তি। বন্ধন যদি ছিন্ন করতে চাও তাহলে ত্যাগকে জীবনে মূল মন্ত্ররূপে গ্রহণ কর। হিতোপদেশের ঋষি সেই শিক্ষাই জগজ্জনকে দিচ্ছে।

ম্যাকলয়েড বেশ একটু উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল ঃ চমৎকার। এত বুঝেও মায়াবাদ বোঝনি বলে নাকে কান্না কর।

একে কেউ বোঝা বলে? এতো নিজের মত করে তর্জমা। এই আছে এই নাই-এর এক ঝলকানি, সত্য-মিথ্যার জট পাকানো একটা রহস্য। ইন্দ্রিয় আর ইন্দ্রিয় নির্ভর মনের মাধ্যমে তার সঙ্গে ঘটে আমাদের পরিচয়। ব্যস, এই পর্যন্ত আমার বোঝা।

হঠাৎ মার্গারেটের চোখ পড়ল স্বামীজির ওপর। সোজা চেয়ে আছে তার দিকে। মার্গারেটের বুকের ভিতর মৃদু তরঙ্গ বয়ে গেল। তাঁর দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ আকর্ণ বিস্তৃত টানা দু'চোখ দিয়ে যেন জ্যোতি বেরোচ্ছে। মার্গারেট অল্পক্ষণ মাত্র তাকিয়ে চোখ নত করল।

মঞ্চে দাঁড়ানো মাত্র স্বামীজির ব্যক্তিত্বের রূপ রঙ সম্পূর্ণ বদলে গেল। এক অন্য জগতের অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। চিরচেনা হাসিখুশি স্বভাবের মানুষটি ধরা ছোঁয়ার বাইরে স্বতন্ত্র জগতের মানুষ, স্বতন্ত্র তাঁর ব্যক্তিত্ব। কণ্ঠস্বরও অনন্য। বিভোর বিহ্বল দুই আঁখি তারায় কেমন একটা স্বপ্নাচ্ছন্নভাব। শান্ত সৌম্য স্নিগ্ধ মুখমণ্ডলের অনির্বচনীয় দ্যুতি শ্রোতৃমণ্ডলকে মুহূর্তে স্তব্ধ ও বিমূঢ় করে দিল। বক্তৃতা শুরু করার আগে চক্ষু দুটি মুদ্রিত করলেন। ভাবে পুরোপুরি

সমাহিত হয়ে উদ্ভাসিত ঔজ্জ্বলে কিছুক্ষণের জন্য স্থির হয়ে গেলেন। তারপর নাভিমূল থেকে উৎসারিত হল নাদ ধ্বনি। শিবোহং, শিবোহং। উচ্চারণের সঙ্গে সমস্ত কক্ষটি স্পন্দিত হতে লাগল। শ্রোতাদের বক্ষমধ্যে সেই স্পন্দন এক বিচিত্র সুর লহরী সৃষ্টি করল। মনে হল শয়ে শয়ে সুরের পায়রা পাখা ঝাপ্টা ঝাপ্টি করছে।

বক্তৃতা শুরুর সময় যে চোখ মার্গারেটের দিকে প্রসারিত ছিল সেই চোখ সেখান থেকে নড়ল না। কিন্তু সে চাহনি কিছুই দেখছিল না। মনে হচ্ছিল ঐ চাহনি পুরোপুরি সমাহিত হয়ে যেন শূণ্যলোক থেকে অনন্ত ভাব আহরণ করে আনছে। আর বক্তব্য বিষয়ের ওপর একটি একটি করে তাঁর কথা বসাচ্ছেন। বড় যত্নে, বড় শ্রদ্ধামিশ্রিত সোহাগে। চারদিকে তার রূপ রঙ ঝলসে ওঠল।

স্বামীজির কণ্ঠস্বর শুনে চমকে ওঠল মার্গারেট। প্রথম দিনে বক্তৃতা শুনে যেমন চমকে ওঠেছিল আজও আবার তেমনি চমকে ওঠল। কণ্ঠস্বরের মত চকিতে হৃদয় বিদীর্ণ করার মত ক্ষুরধার অস্ত্র আর নেই। মার্গারেট লাজুক চোখে স্বামীজির দিকে তাকাল। স্বামীজি তখন তন্ময় হয়ে গেছেন তাঁর বক্তৃতায়। কোন কিছুতে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। সুরেলা কণ্ঠ থেকে নির্গত হচ্ছিল ঃ মানুষ অনন্ত, তাই.তার বাসনাও অনন্ত। কিন্তু তার পরিতৃপ্তিও এই অনন্তের মধ্যে। আমরা যথা থেকে আসি তথায় ফিরিয়া যাই। বুদবুদের উৎপত্তি জলে, নিষ্পত্তিও সেখানে। আমাদের জীবন যেন স্বপ্ন থেকে স্বপ্নান্তরে যাত্রা। মানুষ অনন্ত স্বপ্নবিলাসী, সে কী করে সীমার স্বপ্নে তুষ্ট থাকবে?

মার্গারেট গভীর মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনল। তার ভেতরটা কেয়াবৎ, কেয়াবৎ করে ওঠল।

সুরেলা ভেলায় ভেসে ভেসে স্বামীজির দৃপ্ত ভাষণ যেন কোন্ দেবলোকের দিকে চলেছে। আমি যেন অনন্ত নীলাকাশ। আকাশের ওপর দিয়ে নানা রঙের মেঘ ভেসে চলে যায়, কখনো বা একমুহূর্ত থাকে, তারপর আর দেখা যায় না। আমি সেই চিরন্তন নীলই থেকে যায়। আমি সব কিছুর আকাশলীলার সাক্ষী। সেই চিরন্তন সাক্ষী, আকাশ দেখি বলেই প্রকৃতি আছে। আমি না দেখলে প্রকৃতি থাকে না। আমায় না হলে হে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে।

ভারতের সন্ন্যাসীর প্রত্যেকটি কথা মার্গারেটের কানে, মনে, বুকে এমন করে গেঁথে গেল যে এক দারুন মুগ্ধ চমকে বিজুরীর মত চমকাতে লাগল ভেতরটা। মার্গারেটের সেই সপ্রতিভ লাজুক ভাবটা আর নেই। তবে, নারীপ্রকৃতির মধ্যে নিজের কাছে নিজেকে লুকিয়ে রাখার একরকমের চাপা নিষ্ঠুরতা আছে। সব নারীই সংকোচে, কুণ্ঠায় ভিতরে ভিতরে কষ্ট পায়। অনুরূপ এক কষ্টের আর্তিতে তার বুকটা টাটাতে লাগল। চিত্রার্পিতের মত স্বামীজির

সামনে বসে থাকল। প্রশ্নয় ভরা উজ্জ্বল চোখ মেলে অনিমেষ তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে।

স্বামীজির মুখে চোখে সে কী তৃপ্তির বিভাতি। হঠাৎই উৎফুল্ল হয়ে বললেন আজ ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ অশান্ত এই পৃথিবী কোন কাম্য বস্তুটির জন্য অপেক্ষমান? কোন সামগ্রীর প্রয়োজন তার পক্ষে আজ একান্ত অপরিহার্য?

বলতে বলতে যেন উজ্জ্বল বহ্নিশিখার মত প্রদীপ্ত হয়ে ওঠল তাঁর মুখমণ্ডল। মার্গারেটের পিপাসু মনটি উৎকর্ণ হয়ে শুনল ঃ জগৎ চায় আজ চরিত্র। জগতে আজ সর্বাধিকপ্রয়োজন মুষ্টিমেয় নরনারী তাদের সংখ্যা বিশ একুশ জন হলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু যাদের আছে জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃতের মত আদর্শ, আদর্শের আনুগত্যে যাদের চিত্ত ভাবনাহীন, শঙ্কাহীন। যারা নাম যশ চায় না, ভোগ-বিলাসের আকাঙ্ক্ষা করে না, যারা অভী মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে মুক্ত আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে বলতে পারে ভগবানই আমাদের জীবনের একমাত্র কাম্যধন। ভগবান ছাড়া আর আমাদের কিছুই প্রার্থনীয় নেই। আমি তাদের চাই।

দীর্ঘ দু'খানা বাহু শ্রোতাদের দিকে প্রসারিত করে দিয়ে স্থির হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। মার্গারেটের অকম্পিত মুখের ওপর দু'চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ। স্বপ্নাচ্ছন্ন চাহনিতে কি যেন ব্যগ্র প্রত্যাশা, কি যেন গভীর অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা! বললেন ঃ কে কে যেতে প্রস্তুত? কেউ কি সাড়া দেবে? শ্রেয়র জন্য, প্রেয়কে বিসর্জন দেবার শক্তি রাখে, স্বপ্ন দেখে এমন কেউ কোথাও কি আছে? আমার জীবন লভিয়া জীবন কেউ কি ধন্য, সার্থক হয়ে ওঠতে চাও?— তাহলে কিসের ভয়? অদ্ভুত প্রত্যাশা ভরা চোখে স্বামীজি মার্গারেটের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

সমস্ত কক্ষটি সেইক্ষণে এক দিব্য আবেগে পূর্ণ হয়ে ওঠেছে, একটি নিরবয়ব মহাপ্রশান্তি যেন আচ্ছন্ন করেছে সকলকে। অভিভূত আচ্ছন্নতায় মার্গারেটের ভেতরটা কেঁপে গেল। মনে হল সন্ন্যাসী যেন ইঙ্গিতে হাতছানি দিয়ে তাকেই শুধু কাছে ডাকছেন। তার মনে যে দ্বিধা, সংশয়, অনিশ্চয়তা, ভয় জাগছিল তা দূর করার জন্য অভয় দান করে বললেন ঃ কিসের ভয়? যদি ঈশ্বর আছেন একথা সত্য হয় তবে জগতে আর কিসের প্রয়োজন? আর যদি একথা সত্য না হয়, তবে আমাদের জীবনের মূল্যই বা কি? ভয় নাই, ওরে ভয় নাই কিছু নাই তোর ভাবনা। জাগো, জাগো, মহাপ্রাণ, জগৎ যন্ত্রণায় দগ্ধ হচ্ছে, তোমার কি নিদ্রা সাজে?

মার্গারেটের বুকের ভেতরটা মুহুর্মুহু চমকাতে লাগল। ক্ষণে ক্ষণে অভিনব ভাবপ্রবাহের খরস্রোতে যেন ভেসে চলেছিল মার্গারেট। মনে হচ্ছিল সাগরপারের

ওপার থেকে যেন এক মহা আহ্বান এসেছে তার কাছে। বিশেষ করে তার গুরু, তার আচার্য সেই বার্তাবহন করে এনেছেন। তিনি তার দ্বারে এসে করাঘাত করছেন, আকুল কণ্ঠে ডাকছেন জাগো, জাগো মহাপ্রাণ, তোমার কি নিদ্রা সাজে? ভিক্ষার পাত্র নিয়ে ভৈরব দ্বারে ভিক্ষা দাও ভিক্ষা দাও করছে। কত না ছোট করছে নিজেকে তার কাছে, আর সে চোখের জলে ভেজা নিষ্ঠুরতা দিয়ে তাঁকে 'না' বলে ফিরিয়ে দেবে কী করে? মুখের ওপর না বলতে তার বুক ভেঙে গেল। সত্যি যে ভেঙে যায় এমন করে মার্গারেট কোনো দিন অনুভব করিনি।

একটা অদ্ভুত অনুভূতি, হল মার্গারেটের। স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে শুনতে লাগল, এস আমরা আহ্বান করতে থাকি, যতক্ষণ পর্যন্ত নিদ্রিত দেবতা জাগ্রত না হন, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরের দেবতা এই আহ্বানে সাড়া না দেন। আমি শুধু বলি জাগো, জাগো।

ঐ আহ্বানে মার্গারেটের সমস্ত অন্তঃকরণটা গান গেয়ে ওঠল। মনের মধ্যে তাঁর ধ্বনিটা স্পন্দিত হতে লাগল। চোখ বুজে মন্ত্রের মত উচ্চারণ করল

তুমি কি শুনেছ মোর বাণী।
হৃদয়ে নিয়েছ তারে টানি,
জানি না তোমার নাম, তোমারেই সঁপিলাম
আমার ধ্যানের ধনখানি।

মার্গারেটের মনের সমস্ত তারগুলি যেন ঐ আহ্বানের সুরে বাঁধা পড়ল। দেহ মন জুড়ে তার সুর বেজে যাচ্ছিল। স্বামীজির দৃষ্টি শূণ্য। মনে হল বহুদূরের সে দৃষ্টি তার ওপর স্থির হয়ে আছে। একটা ছোট্ট আনন্দের বিদ্যুৎ তার শরীর মনের ভিতর এক মুহূর্তের জন্য বয়ে গেল। আর সে সন্মোহিত হয়ে অপলক চেয়ে আছে তাঁর দিকে। অনন্ত সময় বয়ে যাচ্ছে। মনে হল শূণ্যে মহাশূণ্যে সে ভেসে চলেছে। আর স্বামীজির সে অতলস্পর্শী অপলক দৃষ্টি মৃদু হাসিতে উদ্ভাসিত। মার্গারেটও বিপন্ন মুখে অপ্রস্তুত হাসি নিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। ভিতরটা তার কাঁপছে। ঝড়ের মুখে ছোট্ট একটা বিপন্ন পাতার মত কাঁপছে। কী আশ্চর্য সেই শারীরিক অনুভূতি। এতকাল মনে মনে যাকে অনুসন্ধান করছিল সেই পরশপাথরকেই যেন পেয়ে গেল সে। জীবন যেন নতুন আলোর ছোঁয়ায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠল। পায়ের তলা থেকে একটা তীব্র তীক্ষ্ণ অনুভূতি উঠে এল। নিজেকে আর সংবরণ করতে পারল না। শ্রোতাদের মধ্যে থেকে সে ওঠে দাঁড়াল।

বিস্ময় বিমুগ্ধ স্বামীজির দু'নয়নে আনন্দের বারি। অভিভূত গলায় বলল ঃ মার্গারেট আমার মনে একজনের জন্য অপেক্ষা ছিল। কিন্তু কে সে স্পষ্ট করে

জানি না। কারণ জানতে চেষ্টা করিনি। তবু উৎকর্ণ হয়ে আমি তোমাকেই চাইছিলাম।

সারা শরীরে মার্গারেটের কাঁটা দিল। অভিভূত আনন্দে বিস্ময়ে তার চোখের কোণ চিক চিক করে ওঠল। তবু অশ্রুসিক্ত দুটি চোখ বড বড় করে স্বামীজির মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। ভাল লাগার স্বাদ পেয়ে ভেতরটা নেতিয়ে গেল। কী বলবে ভেবে পেল না।

স্বামীজি চোখ বুজে একটা লম্বা শ্বাস নিল। তারপর স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বলল ঃ পরিকল্পনা করে আমি কাজ করি না। চলার পথেই পায়ের তলায় আপনা থেকে রাস্তা জেগে ওঠে। ভগবান ছাড়া আমার আর কোনো সম্বল নেই, সিদ্ধির পথ তিনিই দেখাবেন। তুমি তাঁর আলোকবর্তিকা। তাই এসেছে নিজে। আমার বিশ্বাস ভারতের সেবায়, ভারতের কল্যাণকল্পে তোমার ভবিষ্যৎ জীবন চিহ্নিত হয়ে আছে। আমার দেশের জন্য বিশেষ করে নারী সমাজের জন্য একজন শক্তিশালী নারী চাই। পুরুষ নয় নারী চাই। যোগ্যা মনস্বিনী নারী। সিংহিনীসম মহিলা। ভারত ভূমির উষরতা এখনও ঘোচেনি। তেজস্বিনী কর্মী নারী এখনো বিরল। অন্যদেশ থেকে তার ধার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

মার্গারেটের অভিভূত আচ্ছন্নতার ভাব এক ঝটকায় কেটে গেল। স্বপ্ন থেকে চোখ মেলল জাগরণে। একটা স্বস্তির শ্বাস পড়ল। উজ্জ্বল হাসির পূর্বাভাস তার ঠোঁটে লেগে রইল। বলল ঃ মেরুদণ্ড সোজা রাখা নিজের জন্য এবং একটা দেশের জন্য খুবই দরকার। তার জন্য আমাকে কী করতে হবে? আপনার নিজের জীবনের ব্রতই বা কি? কোন আদর্শেরি বাস্তব রূপায়ণে আপনি নিযুক্ত? আমার নিজের জীবনের ঐকান্তিক প্রয়োজনের তাগিদেই সে কথা আমার জানা বিশেষ দরকার।

স্বামীজির শান্ত সৌম্য মুখে শ্রীময় হাসি। বললেন ঃ মার্গারেট ভাবাবেগের বশে কোনে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত নয়। অগ্র পশ্চাত ভেবে তবে পা বাড়াবে। যতক্ষণ পর্যন্ত কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য নির্দ্বন্দ্ব না হতে পারছ, আত্মনির্ভরশীল না হচ্ছ, নির্ভর হওয়ার মত শক্তিটুকু অর্জন না করছ ততদিন পর্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করে থাকতে হবে। স্বার্থপরের মত ভারতের কাজে ডাকব না তোমায়। সেখানে অনেক বাধা। কুসংস্কারের জঞ্জাল স্তূপ সরিয়ে তোমাকে পথ করে চলতে হবে। অনেক ঘৃণা, অপমান, অসম্মান, অবহেল, অসহযোগিতা, বিরূপতা তোমাকে পদে পদে ছিন্নাভিন্ন করবে। স্বাধীন দেশের পরিচ্ছন্ন শিক্ষাদীপ্ত আবহাওয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে সেটা তোমার ধারণা করা

সম্ভব না। তুমি কল্পনাও করতে পারবে না জাত-পাত, ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার আমার দেশের মানুষকে কত ছোট করে দিয়েছে। শ্বেতাঙ্গ বলে তুমি ঘৃণার শিকার হবে। এসব মানিয়ে নিয়ে তুমি কতখানি চলতে পারবে তার বিচার করে তোমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

উৎকর্ণ হয়ে শুনল মার্গারেট। বিস্ময়ে ভরে গেছে তার মন। স্বামীজির আহ্বান দূরাগত সঙ্গীতের মত তার কানের মধ্যে বাজছিল। আর তার সমস্ত চেতনা কেমন অবশ হয়ে আসছিল।

একটা সুন্দর অনুভূতি নিয়ে বাড়ি ফিরল মার্গারেট—যা কিছুতে শেষ হতে চায় না, যে আনন্দ বা সুখ ফুরোয় না, বুদ্ধি দিয়ে মাপা যায় না, ভাল মন্দ সম্পর্কে কোনো বোধ থাকে না সেরকম একটা অদ্ভুত অনুভূতির ঢেউ খেলে গেল সমস্ত শরীরে। এই অদ্ভুত অনুভূতিটা প্রশ্নে প্রশ্নে তাকে ভরিয়ে ফেলল।

সে রাত্রে মার্গারেটের ঘুম এল না সহজে। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে রইল। অন্ধকারের মধ্যে তার নিজেরই কৌতূহলী চোখটা যেন তার নিজের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল—অতঃপর, কী করবে মার্গারেট!

মেরী ইসাবেল নোবলের ডাকে ঘুম ভাঙল মার্গারেটের। চোখ মেলে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে মায়ের মুখের দিকে। মার্গারেটের ভীষণ অবাক লাগল। এখন তার কাছে মা কেবল বাস্তব সত্য। একটু আগে যে অনন্তনীল সমুদ্র জাহাজ আর আলখাল্লা পরা সন্ন্যাসীকে দেখছিল, তারা কোথায় গেল? বাস্তবে তারা কেউ কোথাও নেই। অথচ, এই পৃথিবীরই সব। অনেক কষ্টে স্বপ্নের ঘোরটা কাটিয়ে মায়ের দিকে চেয়ে রইল। স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে আলতোভাবে মায়ের শীর্ণ হাতখানা ধরে বলল ঃ দিলে তো স্বপ্নটা মাটি করে! তোমার জ্বালায় স্বপ্নের শেষটা আর দেখা হল না।

ইসাবেল বেশ একটু বিরক্ত হয়ে বলল ঃ সারাদিন তো স্বপ্নে ডানা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে। আর কত স্বপ্ন দেখবি?

তবু আমি স্বপ্ন দেখি। স্বপ্নগুলো খুব ভীতু হয়। চোখ খুললে আর কিছু থাকে না। নিবিড় ঘুমের মধ্যে স্বপ্নগুলো ডানা ঝাপ্টায়; অস্ফুট স্বরে কী যেন কইতে কইতে নড়ে চড়ে। বেশ লাগে। কাল সারা রাত ধরে একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখিছি। ভীষণ মজার স্বপ্ন।

ইসাবেল মুখ ফিরিয়ে চলে যাওয়ার চেষ্ট করলে তাকে জোর করে কাছ বসাল। বলল ঃ চুপিসারে পা পা করে একজন জ্যোতির্ময় পুরুষ এসে দাঁড়াল আমার সামনে। তন্ময় হয়ে আমি তাকিয়ে আছি। তাঁকে দেখে স্বপ্নে আমি অনেক কিছুই ভেবেছিলাম। ভারতের সন্ন্যাসীর কাছে তাঁকে নিয়ে যেতে খুব ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু আমার সব ইচ্ছেকে চাপা দিয়ে বন্দরে নোঙর করা একটা

বিরাট জাহাজ দেখিয়ে তাতে ওঠতে বলল ঃ ওঠ মার্গারেট। চল আমার সঙ্গে। আমি তোমায় নিতে এসেছি।

ইসাবেলের বুকের ভেতরটা ধরাস করে ওঠেছিল। তাই তার চমকানোটা সে দেখতে পেল। হাতখানা তার মুঠি থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ওঠে যাওয়ার চেষ্টা করল। দু'হাতে জড়িয়ে ধরে মার্গারেট তার ঊরুর ওপর মাথা রেখে বলল ঃ তুমি ওঠতে চাইলেই আমি যেতে দেব ভেবেছ! অত সোজা নয়। আমি বসে বসে এখন আদর খাব।

ইসাবেল একটু জোর খাটাল। বলল ঃ আমার ভাল লাগছে না। অনেক কাজ পড়ে আছে।

আজ ছুটি। কাজতো সারাদিন আছে। গল্প বলার মুডটা গেলে তো আর পাব না। শোনোই না, বেশ মজা পাবে।

স্বপ্নে গরু গাছে ওঠে।

সেটাই তো স্বপ্নের মজার ব্যাপার। তারপর দিব্য কান্ত সেই সন্ন্যাসী জাহাজে ওঠার সিঁড়ি দেখিয়ে দিল আমাকে। আশ্চর্য এতটুকু দ্বিধা, ভয়, কিংবা সংশয় আমার ছিল না। সন্মোহিতের মত প্রতিবাদ না করে তাঁর অনুসরণ করলাম। সমুদ্রতীর তখন অনেক দূরে। বহু প্রান্তর পার হয়ে সেই জ্যোর্তিময় পুরুষের পিছু পিছু আমি সমুদ্র তীরে এসে দাঁড়ালাম। মনে হল,একটা জাহাজ ঘোর অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু জাহাজের কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। সাদা পোশাক পরা জ্যোর্তিময় পুরুষ ছাড়া আর কিছু দেখতে পেলাম না। অন্ধকারে তাঁর মায়াবী আহ্বান শুনলাম, এই জাহাজে ওঠ। কী আশ্চর্য এক জ্যোর্তিময় আলো আমাকে সিঁড়ি দেখিয়ে জাহাজের ডেকে নিয়ে গেল। আমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন সেই সন্ন্যাসী। মুখে তাঁর স্মিত হাসি, চোখের তারায় অভয় দ্যুতি। তারপর পাল তোলা জাহাজের বাঁশি বেজে ওঠল। অন্ধকার বিদীর্ণ করে দৈত্যের হাসির মত নভোমণ্ডল পর্যন্ত ছুটে গেল সেই বাঁশির শব্দ। আকাশ থেকে টুপটাপ করে কয়েকটা তারা খসে পড়ল। আমি ভয় পেলাম। কান্না পেল ভীষণ। মা, মা করে ডাকতে লাগলাম। সেই জ্যোর্তিময় সন্ন্যাসী আমার পাশে এসে দাঁড়াল। মাথায় তাঁর নরম মায়াবী হাতখানা রেখে বলল ঃ মাই চাইল্ড ভয় পেও না। আমি তোমার পাশে আছি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত থাকব। তুমি ঈশ্বরের পুত্রী। তুমি নিজেই একটা আলো। কিন্তু সে আলোয় লন্ডনের আকাশ আলোকিত হবে না।

আমার সামনে কোথাও আলো নেই। চারদিকে শুধু উত্তাল ঢেউ আর তরঙ্গের নির্ঘোষ। মোচার খোলার মত তরঙ্গের দোলায় দুলছে জাহাজখানা।

কুল কিনারার কোনো চিহ্ন নেই। এমন কি সেই জ্যোর্তিময় সন্ন্যাসীও নেই। এই জাহাজের চালক কে, আরোহী বা যাত্রী কারা, কোথায় চলেছে জাহাজ তা কিছু জানা নেই। আমার ভীষণ ভয় করতে লাগল। আমার সমস্ত চেতনা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আমি মূর্চ্ছা যাচ্ছি। ঘোর লাগা আচ্ছন্নতার মধ্যে সেই জ্যোর্তিময় পুরুষ তাঁর দু'বাহু বাড়িয়ে আমাকে আশ্রয় দিলেন। ছোট্ট একটা চৌকির ওপর শুইয়ে দিলেন। ঘোর লাগা আচ্ছন্নতার মধ্যে আধ বোজা আঁখি মেলে দেখলাম শিয়রের কাছে একটা লণ্ঠন জ্বলছে। আর সেই জ্যোর্তিময় পুরুষ মায়ের মমতা নিয়ে আমার চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। আমি একটু একটু করে সুস্থ হয়ে ওঠছি। জ্ঞান ফিরে আসছে। প্রাণে একটু আশা হল। আমি একেবারে একা নই। আমাকে দেখার একজন মানুষ আছে। সেই মহাপ্রাণ মানুষটি তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রে ভাসমান জাহাজের আমার একমাত্র মঙ্গলাকাঙক্ষী। উনি আমার রক্ষাকর্তা, আমার পরম হিতৈষী এবং বন্ধু। এই মুহূর্তে আমি আর একা নই। তাঁকে পরম আশ্রয় ভেবেই তাঁর কোলে মাথা রেখে শিশুর মত পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লাম। লম্বা গাঢ় ঘুম। তারপর চোখ মেলে দেখলাম, আমার পরম মমতাময়ী মা বেড টি হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। স্বপ্নের জাহাজে করে আমার আর বন্দরে পৌঁছানো হল না। দেখা হল না সেটা কোন দেশ?

ইসাবেল বেশ একটু অসহিষ্ণু হয়ে বলল ঃ আজে বাজে স্বপ্ন নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় আমার নেই।

মার্গারেটে আহত হয়ে বলল ঃ মা, স্বপ্নে বোধ হয় মানুষ নিজেকে নিয়ে কৌতুক করে। সে যা হতে চায়, করতে চায়, স্বপ্নেই দেখে তাকে। স্বপ্ন আমাদের কামনা বাসনার অবাস্তব রূপরেখা।

ইসাবেল হঠাৎ চমকে মার্গারেটের দু'চোখে চেয়ে রইল। কথা বলল না। ইসাবেলের এই চাউনি মার্গারেট চেনে। ভয়, উৎকণ্ঠায়, দুর্ভাবনায় ইসাবেলের মনটা যখন অস্থির হয় এবং নিরুপায় বোধ করে তখনই এরকম ফ্যাল ফ্যাল করে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে চেয়ে থাকে। আর তখন আদরের হাতখানা সারা গায়ে বুলিয়ে দিয়ে ইসাবেল তার উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠা প্রশমিত করে। মার আদরে মার্গারেটের চোখ বুজে এল। বলল, মা, স্বপ্ন নিয়ে আজকাল বিস্তর গবেষণা হচ্ছে। স্বপ্ন আর ফেলনা নয়। স্বপ্নে একটা মানুষের মনের হদিস খুঁজে পাওয়া যায়। আপাতদৃষ্টিতে যা এলোমেলো বিশৃঙ্খল, অপ্রাসঙ্গিক, উদ্ভট ঘটনা মনে হয়, তার মধ্যেই কিন্তু প্রত্যাশাগুলো ডানা মেলে দিয়ে ঝাপ্টায়, নড়ে চড়ে, অস্পষ্ট কথা বলে। স্বপ্ন আর ফেলনা নয়। ভীরু মানুষ স্বপ্নেতে নিজেকে নিয়ে কৌতুক করে। সেখানেও নিজের দুর্বলতাগুলো দুর্বোধ্যতা মোড়কে মোড়া

থাকে। যা তাকে মানুষ হিসেবে হাস্যস্পদ করলেও অসঙ্গত দৃশ্য ও ঘটনাগুলো মিলে মিশে মানুষ হিসেবে তার অনেক অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণতর করে তোলে।

পাগল মেয়ে। এত বড় হয়েছিস তবু পাগলামি গেল না।

ইসাবেলের র্ভৎসনার মৃদু প্রতিবাদ করে বলল ঃ মা একে পাগলামি বলে না। অল্পবিস্তর পাগল সবাই। স্বপ্নে তাই উদ্ভট উদ্ভট দৃশ্য দেখে। এগুলো না হলে স্বপ্ন দেখার মজাই থাকত না। স্বপ্নে মজাটা বেশি আছে বলেই স্বপ্ন নিয়ে সবচেয়ে বেশি হাসে স্বপ্নদ্রষ্টা নিজে।

ইসাবেল কোনো জবাব না দিয়ে মার্গারেটের চুলের মধ্যে বিলি কেটে দিতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারণ করল ঃ আমি তো স্বপ্নের কোনো কিনারা করতে পারলাম না। স্বপ্ন আমার কাছে আজগুবি। তবু একবার মাথায় ঢুকলে তাড়াতে পারি না। সব সময় মনের মধ্যে ঐটাই আনাগোনা করবে। মন খারাপ করবে। কোনো কাজ হবে না। আজকের দিনটা তুই মাটি করে দিলি।

মার্গারেট দুষ্টু দুষ্টু চোখ করে বলল ঃ আমার কথা খুব ভাব তাই না।

তোর স্বপ্নের ছবিটা আমি ভুলতে পারছি না। ঐ জ্যোর্তিময় পুরুষটা কে? ওই জাহাজটাই বা কোন দেশের, কোথায় যাবে?

মার্গারেট কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বলল ঃ মা, মনে হচ্ছে এটা নিছক স্বপ্ন নয়। আমার ভবিষ্যৎ জীবনের ছবি। জীবনের এক সন্ধিক্ষণে এই স্বপ্ন দেখার একটা তাৎপর্য আছে।

উৎকর্ণ উৎকণ্ঠায় ইসাবেল মার্গারেটের দিকে চেয়ে রইল। হতাশ গলায় বলল ঃ এসব কী বলছিস? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। বুকটা আমার কেমন করছে। মনে হচ্ছে, একটা কিছু ঘটবে শীঘ্রী।

মার্গারেট শান্ত গলায় বলল ঃ মা উতলা হওয়ার কিছু নেই। সব অবস্থার জন্য মানুষকে তৈরি থাকতে হয়। যা হওয়ার তা হবেই। তুমি আমি চাইলেও তা রদ করতে পারি না। মিছে ভাবনা চিন্তা করে কি লাভ?

ব্যাকুল গলায় ইসাবেল বলল ঃ তবু, তুই আমাকে সব খুলে বল। আমার মন ভীষণ ব্যস্ত হয়েছে। চিরদিন তুই বড় চাপা। দোহাই, আজ আমাকে গোপন করিস না।

মার্গারেটের ভুরু কুঁচকে গেল। ইসাবেলের দিকে সন্ধানী চোখ মেলে বলল ঃ তোমার কী হয়েছে বল তো। মনে হচ্ছে, তুমি কিছু গোপন করছ। আমার ভবিতব্য সম্পর্কে নিশ্চয়ই কিছু জান? তোমার মুখে চোখে একটা অশান্ত অস্থিরতার ভাব।

ইসাবেল নিজের বিস্ময়টাকে চট করে লুকোনোর জন্য বলল ঃ উৎকণ্ঠায় উদ্বিগ্ন হওয়া মায়েদের মনের ধর্ম। মায়েরা সন্তানকে বেশি আগলে রাখে। আঁকড়ে থাকাই তাদের প্রকৃতি। মায়া মোহ তাদের জন্মগত অভিশাপ। তাই হারানোর আশঙ্কায় সর্বক্ষণ তটস্থ থাকে।

সামান্যক্ষণ চুপ করে থেকে মার্গারেট বলল ঃ খোলাখুলি বলার সময় এখনও আসিনি। স্থির করিনি কী করব। তবে, ভারতের সন্ন্যাসীর আহ্বানের এক অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ অস্বীকার করতে চরিত্রে যে জোর লাগে আমার বোধ হয় সে জোর নেই। তাঁর কাজে মন প্রাণ সমর্পণ করার প্রবল ইচ্ছে থেকে হয়তো এই দুর্বলতার উৎপত্তি।

ইসাবেলের কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ প্রকাশ পেল। এসবের মানে কি?

জানি না। নিশ্চয়ই মনের ভাল লাগা। কিন্তু তার হিসেব করা হয়নি এখনও। তেমাথার পথের মোড়ে এসে পথিককে যেমন স্থির করতে হয় কোন পথে গেলে সে গন্তব্যে পৌঁছবে, আমিও তেমনি জীবনের পথের মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছি। একটা পথ আমার সোজা ভারতবর্ষের দিকে গিয়েছে, আর একটা পথ তোমার স্নেহনীড়ে এসে শেষ হয়েছে। আমার আদর্শ, বিশ্বাস, সত্য, নিয়ে ভাবছি, কোন পথে গেলে আমার আমিকে পাব। জ্ঞান, বুদ্ধি কিংবা বিবেক দিয়ে নয়, মন দিয়েই তাকে চিনতে হয় নীরবে নিভৃতে।

ইসাবেল নিঃশব্দে ওঠে গেল তার কাছ থেকে। তার যে হঠাৎ কী হল কে জানে? মার্গারেটের মনে হল, পাছে অনুযোগ অভিযোগ করে মা তার কাছে ছোট হয়ে যায় তাই নিজে থেকে চলে গেল। ভাল মন্দ কিংবা নিজের মনের কথাটা জানাতে গেলে সঙ্কীর্ণতা যদি ছোট করে দেয়, তাই কৌশলে এড়িয়ে গেল।

খুব বেশি দিনের ঘটনা নয়। অবিকল সব মনে আছে মার্গারেটের। সে এক আশ্চর্য দিন। সিসেম ক্লাবে প্রাচ্যের ঋষিপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দকে আমন্ত্রণ করতে গেছে সে। সেন্ট জর্জেস রোডের বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠতে ওঠতে থমকে দাঁড়াল শেষ ধাপে। সেখানেই যে, স্বামীজির সঙ্গে অপ্রত্যাশিত ভাবে তার দেখা হবে স্বপ্নেও ভাবিনি। তবু আশ্চর্যভাবে তার সঙ্গে যখন দেখা হল, সব গুলিয়ে গেল। কী করবে আর কী যে বলবে ভেবে পেল না।

স্বামীজিই তাকে সহজ করে দেবার জন্য বললেন ঃ মার্গারেট! তুমি আসবে আমি জানতাম।

মার্গারেট শুকনো গলায় সবিস্ময়ে বলল ঃ কী করে জানলেন?

কিছু কিছু কথা থাকে, যা অন্যকে বোঝানো যায় না। এটা মনের ব্যাপার। ভেতরে এস। এভাবে বাইরে দাঁড়িয়ে কথা হয় না।

মার্গারেটকে একটি সোফায় বসতে দিয়ে অন্য একটি সোফায় তার মুখোমুখি বসলেন। জান মার্গারেট, একদিন এরকম অকস্মাৎ আমার গুরু রামকৃষ্ণদেবের কাছে আমিও হাজির হয়েছিলাম। কিসের টানে, কেন যে গিয়েছিলাম আজও মনে করতে পারি না। বোধ হয় এক অলৌকিক শক্তিবলে তিনি আমাকে আকর্ষণ করেছিলেন।

মার্গারেটকে কথা বলার ফুরসৎ না দিয়ে বললেন ঃ তোমার মত অনন্ত কৌতূহল আর জিজ্ঞাসা নিয়ে তাঁকে প্রশ্নে প্রশ্নে অস্থির করেছি কতদিন। কিন্তু কোনোদিন বিরক্ত হতে দেখিনি তাঁকে। শিশুর মত হাসতেন আর আনন্দে মাথা নাড়তেন। কী অসীম ধৈর্য তাঁর। অনন্ত সময় নিয়ে একটু একটু করে আমার অবিশ্বাস, সংশয়, রাগ, বিরক্তি, বিতৃষ্ণার সব বিষটুকু গ্রহণ করে আমাকে অমৃতের ভাগ দিলেন। আমার অহং এবং বিশ্বাস দিয়ে তাঁকে বাজিয়ে গুরু বলে গ্রহণ করেছি। প্রথম প্রথম মনে হতো লক্ষ্যবস্তু অনেক দূরে, যেন বিশ্বপ্রকৃতির অপর পারে। তাকে এতটুকু বিকৃত না করে, তার মহিমা একটুও ছোট না করে নিজের করে পেতে হবে তাকে। আরণ্যক ঋযিরা যাঁকে খুঁজেছেন জীবনভোর, তিনি এই বুকের মাঝে আমার আত্মার মধ্যেই রহস্যময় ভাবে অবস্থান করছেন। তাঁর স্বরূপকে যতক্ষণ না জানছি ততক্ষণ কেমন করে সোহম্ কি? আমিই সেই—বলতে কি বোঝায়? কিংবা তোমার মধ্যেই তিনি আছেন 'তত্ত্বমাসি', জানব কি করে? তুমিও আমার মত ব্যাকুল হয়ে তাঁকে খুঁজছে। তোমাকে তাই আমি বুঝতে পারি। একেবারে নিজের করে ভাবি। মনে হয় কত চেনা তুমি! কত আপনজন। আমার মনের জল রঙের ছবি তুমি।

স্বামীজিকে যেন প্রগলভতায় পেয়েছে। মার্গারেট অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে তাঁর শান্ত সৌম্য শ্রীময় মুখের দিকে। চোখের পলক পড়ছে না মোটে। একটা মহৎ, উদার ও পবিত্র অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল মার্গারেটের সমস্ত চেতনা। তীব্র একটা আবেগে তার অন্তরটা যেন বিরাট আদিত্যবর্ণ জ্যোর্তিময় সত্তার কাছে লুটিয়ে পড়তে চাইল।

স্বামীজির শান্ত সৌম্য মুখমণ্ডলে এক অনির্বচনীয় তৃপ্তির হাসি। অসংকোচে মার্গারেটের কাছে নিজেকে উন্মোচিত করতে তাঁর ভাল লাগছিল। তাই কোথাও এতটুকু আড়াল ছিল না। আড়ম্বর ছিল না। পরম বন্ধু এবং আত্মীয়ের কাছেই যেন বিশ্বস্ত হৃদয়ে অকপটে সব কথা খুলে বলছেন। তার সমস্যাগুলি তিনি সমাধান করে দেবেন, এমন আশাও করেন না, তিনি শুধু শিখিয়ে দিচ্ছেন কেমন করে মিথ্যে আসক্তি আর সংস্কার কাটিয়ে, অহং বর্জিত হয়ে সেগুলি সে নিজেই বিশ্লেষণ করবে। যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে নিজের চারপাশে যে গণ্ডি সে নিজেই তৈরি করেছিল তাকে নস্যাৎ করার প্রতিক্রিয়া তার মনের অভ্যন্তরেই সৃষ্টি হল।

মার্গারেট মুগ্ধ হয়ে শুনল তাঁর নিজের কথা। কী মিষ্টি, কী মধুর সেই কণ্ঠস্বর। ইচ্ছে করল বাইবেলের মিরিয়মের মত তাঁর পদযুগল স্পর্শ করে চোখের জলে ধুয়ে দেয়, তারপর রেশমের মত নরম সোনালী চুল দিয়ে জোসুয়ার মত তাঁর পা দুটো মুছিয়ে দিয়ে নিজেকে নিবেদন করে। বলতে ইচ্ছে করলঃ তুমি আমার প্রভু, আমার গুরু। আমার হৃদয়ের রাজা। তোমার পায়ে আমি নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করলাম। তুমি আমাকে গ্রহণ কর। তোমার শিষ্য করে নাও। আশীর্ব্বাদ কর তোমার আদর্শের যোগ্য হয়ে তোমার বাণী যেন মানুষের প্রাণে পৌঁছে দিতে পারি। তুমি আমার আলোর দেবতা! তোমাকে শতকোটি প্রণাম—কিন্তু এসব কিছুই বলা হল না তার। সমস্ত চেতনার ওপর নেমে এল এক বিহ্বলতা। এক অনির্বচনীয় সুখে আর পরিতৃপ্তিতে পূর্ণ হয়ে গেল তার মন।

স্বামীজি কয়েকমুহূর্তের জন্য চুপ করে মার্গারেটের দিকে চেয়েছিলেন। কি যে দেখলেন সেই মুখমণ্ডলে তিনিই জানেন। মৃদু হাসির আভাসে উজ্জ্বল হয়ে ওঠল তাঁর সুডৌল মুখখানা। অস্ফুটস্বরে নিজের মনেই বললেনঃ মার্গারেট, তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ আজ এক গুরুকে খুঁজছে। তোমার চেতনার ভেতর, আত্মার ভেতর আমি তাঁর অস্তিত্বকে অনুভব করছি। কিন্তু অহং'র বেড়ী ভেঙে বেরিয়ে আসতে না পারার জন্য তীক্ষ্ণ তীব্র যন্ত্রণার আর্তি ফুটে বেরোচ্ছে তোমার প্রতিমার মত অনিন্দ্যসুন্দর মুখমণ্ডলে। মুখে তুমি কিছু বলছ না, কিন্তু আমি অনুভব করতে পারি তোমার কষ্ট। একদিন আমিও এরকম যন্ত্রণায় ছটফট

করিছি। তোমার মনের অবস্থাটা তাই বুঝতে পারি। তোমার সমস্ত অভিব্যক্তির মধ্যে আমি নিজে দেখি। তুমি যেন আমার মত মনে মনে বলছ, আমাকে ডেকে নাও। তোমার কোলে আশ্রয় দাও।

মার্গারেটের ভিতরটা আলোড়িত হয়ে ওঠল। পরম আবেগে চোখ দুটো বুজল। একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল। বুকের কোণে কোণে যে শূণ্যতা লুকোনো থাকে, সে যে অনুভূতিপ্রবণ কোনো মানুষের চোখের চাওয়ায় এমন করে বেরিয়ে পড়ে আপ্লুত করে দিতে পারে তা জানা ছিল না। তার শরীরে যে মন বাস করে ভারতের সন্ন্যাসী তার আশ্চর্য রহস্যালোকের মধ্যে ঢুকে তাকে আবিষ্কার করেছেন। গুহায়িত মনের বুকে কান পেতে হৃৎস্পন্দনের ধ্বনি শুনেছেন। তার আত্মাকে দেখেছেন।

প্রদীপের মত উজ্জ্বল হয়ে ওঠল মার্গারেটের মুখ। স্বপ্নাচ্ছন্নের মত বলল ঃ আমার সম্পর্কে উচ্চভাব পোষণের জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আপনার সব কথাই আমার মনের তারে গভীর ঝংকারে বাজে। এক আশ্চর্য সুখে আমার দেহ মন ভরে রয়েছে। যতদিন যাচ্ছে ততই অজ্ঞাত রহস্যলোকের পর্দাটা সরে যাচ্ছে। আমি বুঝতে পারছি, তার ওপাশে কি আছে। আমার মনের তারগুলি যেন আপনার বাণী দিয়ে বাঁধা। আমার দেহ মন যেন তার সুরের ভেলায় ভেসে ভেসে কোন দেবলোকের দিকে চলেছে। ভাল মন্দের দ্বন্দ্বে আমার বুকের ভিতরটা কাঁপছে। কতকগুলি ধারণা আমি নিজেই তৈরি করে নিয়েছি। তবু আমার সমস্ত অনুভূতি কেন্দ্রীভূত হয়েছে আপনার আকাশজোড়া বিদ্যুৎ চমকানোর মত কথায়। ঈশ্বর আমাদের একমাত্র সম্বল। তাই যদি হয় তা হলে কিসের ভয়? আর যদি একথা সত্য না হয় তাহলে আমাদের জীবনেরই বা ফল কি? আমার একাগ্রতা এখানে স্পন্দিত। ভীষণ দোটানায় আছি। একই সময়ে দুই অবস্থায় বাস করার মানসিক যন্ত্রণাকে বাক্যে রূপ দেবার ভাষা আমার নেই। একদিকে আমার বর্তমান মন ভীষণভাবে চাইছে আপনার ডাকে সাড়া দিতে। সে তার পরিপূর্ণ দাবি নিয়ে আমাকে অশান্ত করে তুলেছে। অন্যদিকে আমার আর একটা সাংসারিক অস্তিত্ব যেন এক ছায়ামূর্তিতে আমার সত্তার পিছনে দাঁড়িয়ে আমার প্রত্যেক মুহূর্তকে স্পর্শ করছে। আমার দায়িত্ব, কর্তব্য, মায়া-মোহ, মমতা যেন একটা তারের বাজনার মত হয়ে গেছে, একটু ছোঁয়া লাগলেই ঝন্ ঝন্ করে বেজে ওঠছে। এমনই হয়েছে যে পিছনোর টানটাই পথ অবরোধ করে সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমি নিজেকে নিয়ে কী যে করব ভেবে পাচ্ছি না। এটা অনুভব করতে পারি যে আমি দ্বিখণ্ডিত। কী দারুণ আত্মপীড়নের মধ্যে আমার দিন কাটছে সে কেবল আমিই জানি। আমার চোখ জ্বালা করে জল আসছে।

কেমন একটা অভিভূত করুণায় আর্দ্র হল স্বামীজির চিত্ত। গভীর এক মমতাবোধ থেকে উৎসারিত হল তাঁর কথাগুলো। তোমার মনের গভীরে যে পরিবর্তন চলেছে তার রূপ ও প্রকৃতি অন্যরকম। একদিন আমিও গুরুর সংস্পর্শলাভ করে অনুরূপ আত্মযন্ত্রণায় ছিন্নভিন্ন হয়েছি। মনের মধ্যে অনেকগুলো মানুষ বাস করে বলেই নিজেকে প্রশ্ন করে জানতে হয়, কোনটা সত্য? সত্যের দায় বইতে আমি প্রস্তুত কিন্তু যা মিথ্যে তার দায় কেন নেব? সেজন্য আত্মপীড়ন করব কেন? দিনের পর দিন কেটেছে এই ভাবনায়। একটা ভয়ের শিখা অন্তস্থল থেকে ওঠে একটু একটু করে আমার সব মোহ, মমতা, অহঙ্কার, দগ্ধ করে গুরুর চরণে সমর্পণ করেছে। গুরুর করকমলের ছোঁয়ায় আমার নবজন্ম হল। এক নতুন মানুষ হয়ে ওঠলাম। তোমাকেও ঐ ভয়ের শিখাটা তাড়া করে বেড়াচ্ছে। একদিন আমার মতই ঐ শিখার মুখে জ্বলবে তোমার বন্ধনগুলো। খুব বেশি দেরি নেই তার।

মার্গারেট যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। অসংকোচে বলল ঃ দূরাগত সঙ্গীতের মত আপনার আহ্বান আমাকে আকুল করে তুলেছে। আমাকে আপনার শিষ্য করে নিন।

স্বামীজির চোখ দুটোয় আগ্রহ, প্রদীপের মত জ্বলে ওঠল। বললেন ঃ তুমি যেন কী বলতে এসেছিলে?

আচমকা এরকম একটা প্রশ্নে মার্গারেট চমকাল। স্বামীজি তার প্রস্তাবটাকে যথোচিত মর্যাদা এবং গুরুত্ব দেবেন না একথাটা সে স্বপ্নেও কল্পনা করিনি। তার কথাটাকে চাপা দেওয়ার জন্যই সচেতনভাবে অন্য প্রশ্ন করল তাকে। স্বামীজির কাছে এহেন অবহেলা পেয়ে তার অভিমান তীব্র হল। অপমানাহত চোখে তাঁর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে নিজের বিব্রত অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে ওঠার জন্য কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর ধরা গলায় বলল ঃ আপনি হয়তো বোর হচ্ছেন। হাঁ, কথায় কথায় আসল কথাটা বলা হয়নি। কিন্তু ভুলে যায়নি প্রসঙ্গটা। ঠিক মনে আছে। কার্যত কথাটা যেভাবে শুরু করার কথা ছিল সেভাবে হল না। আপনিও জানেন। তবু কুপিত হলেন। নির্দয় নিষ্ঠুর হয়ে আপনি কি সুখ পান? কিন্তু আমার কি দোষ? আপনিই তো অলক্ষ্য থেকে মনের কোণায় কোণায় অন্ধকার গলিতে গলিতে আলো জ্বেলে দিয়ে সব অন্ধকার দূর করে দিচ্ছেন। আর আমি তন্ময় হয়ে দেখছি সে বিচিত্র খেলা। যা কিছু নিয়ে আমার অহংকার,সব মিলিয়ে যাচ্ছে, ক্ষয়ে যাচ্ছে, সত্যের পূর্ণরূপ দেখতে পাচ্ছি আমি। আমার জীবন এক নতুন অর্থে অর্থবান হচ্ছে। ঠিক সেই মুহূর্তে নিজেকে নির্দয় করে আমাকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার মানে কি?

শান্ত নির্বিকার ও বেদনাহীন দুই চোখ মেলে ভারতের সন্ন্যাসী মার্গারেটকে দেখতে লাগল। তার অভিযোগ অনুযোগের কোনো প্রতিবাদ করলেন না। মনের ভাব গোপন করে মুখে মোহমাখা হাসি ফুটিয়ে মধুর এক প্রসন্নতায় আবিষ্ট হয়ে রইলেন।

তাঁর নির্লিপ্ত নির্বকারত্ব মার্গারেটকে আরো অভিমানিনী করে তুলল। কণ্ঠস্বর নিজের অজান্তে ভারী শোনাল। বলল ঃ আমাকে খুব কম জানেন আপনি। জানার সুযোগ হল আর কই? আপনার আদর্শের কতখানি যোগ্য হব সেটা দেখে নেয়া আপনারও দরকার আছে। আপনার দ্বিধা দূর করার জন্য আমার নিজস্ব চিন্তা, ভাবনা, পরিকল্পনা, কার্যকলাপ গভীর করে অনুভব করার জন্য আমার প্রতিষ্ঠিত সিসেম ক্লাবে শিক্ষা সম্পর্কিত সেমিনারে আপনাকে বিশেষ বক্তারূপে পেতে চাই। প্রাচীন ভারতের কর্মমুখী শিক্ষা, গুরু শিষ্যের মধুর সম্পর্ক, আবাসিক বিদ্যালয়ের সুবিধা, শিশুর চরিত্র গঠনে আচার্যের ভূমিকা এসব আমাদের অজ্ঞাত রয়ে গেছে। আধুনিক শিক্ষাভাবনার মধ্যে তার কী ধরণের প্রতিফলন হয়েছে কিংবা হতে পারে এ সম্পর্কে একটা মনোজ্ঞ আলোচনা সিসেম ক্লাব আপনার কাছে প্রত্যাশা করে। আমার নিজেরও একটা স্কুল আছে, সেখানেও আপনার পদধূলি দিতে হবে।

স্বামীজির অধরে স্মিত হাসি। বললেন ঃ অমন করে বলছ কেন? আমি তো যাব না বলিনি।

অভিমানিনী নারীর দুই চোখের কোণে তখন নিবিড় ব্যথা জমেছিল। স্বামীজির কথাতে সহসা সজল হল। বলল ঃ কী জানি, এক প্রশ্ন করলাম, আর এক উত্তর পেলাম। প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ভয় ও সংশয়ে সংকুচিত হয়ে আছি।

স্বামীজির শান্ত সৌম্য মুখমণ্ডলে অনির্বচনীয় হাসিতে উদ্ভাসিত হল। বললেন ঃ তোমার কাছে থেকে কিছু না শুনলেও, আমার অপরিচিতি নও তুমি। ভীষণ আপনজন। তোমার সব খোঁজ আমি রাখি। অসাধরণ সাংগঠনিক ক্ষমতা তোমাকে অন্য জগতের মানুষ করেছে। যেখানেই তুমি যাও এবং থাক সেখানেই বিভিন্নরকম জন কল্যাণমূলক সংগঠন গড়ে তোল। তুমি এক জীবন্ত প্রাণ। তোমার কথা যত শুনেছি ততই তোমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি। শ্রদ্ধা জেগেছে। তোমার মত এক অসাধারণ শক্তিমতী নারীকে ভারতবর্ষের ঘুম ভাঙানোর জন্য, তার চিত্ত জাগরণের জন্য ভীষণ দরকার। আমার দেশে তুমি যাবে মার্গারেট? তোমার মত কন্যার প্রয়োজন আজকের ভারতবর্ষে যে কত গভীর তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। তবু অসংকোচে সে কথা বলতে ভয় হয়।

আমার দেশের ভয়ঙ্কর কুসংস্কার, মমতাহীন নির্দয় সামাজিক আচার প্রথা, বিশ্বাস, সংস্কার দাসত্বের বদ্ধতা যে সেখানে কত ব্যাপক, তা তুমি এদেশে থেকে কল্পনা করতে পারবে না। জাত-বিচার, ছোঁয়াছুঁয়ি সম্পর্কে মধ্যযুগীয় ধারণা, শ্বেতাঙ্গদের প্রতি তাদের বিরূপতা ঘৃণা, উপেক্ষার মর্মবেদনায় পাছে তুমি কষ্ট পাও—তাই তোমাকে নিয়ে যাওয়ার উৎসাহ পাই না। স্বার্থপরের মত আমার দেশের প্রয়োজনে তোমাকে অচেনা, অজানা জায়গায় এনে বিপদে ফেলতে পারি না।

স্বামীজির কথাগুলো শুনতে শুনতে মার্গারেট তন্ময় হয়ে গেল। মনে হল, সাজানো ঘরের নিষ্প্রাণ আসবাবপত্র দেয়ালে টাঙানো বিশাল বিশাল ছবিগুলো যেন উৎকর্ণ হয়ে চেয়ে আছে তার দিকে। সময়-সেকেণ্ড, মিনিট হয়ে স্পন্দিত হতে লাগল তার বুকের মধ্যে। হতে থাকবে অনন্তকাল। ঐসব জড় বস্তুর মধ্যে সারাক্ষণ একটা মানুষ বাস করে বেঁচে থাকে। যা কিছু সুন্দর অনুভূতি তাঁও তো এই কক্ষের ঐ জড় বস্তুর সঙ্গে একসঙ্গে বাস করেই মানুষ পায়। তা-হলে অনুভূতি সম্পন্ন, বিবেকবান জীবন্ত মানুষের মধ্যে বাস করে তাদের অজ্ঞানতা থেকে চৈতন্যে ফেরানো একটু কষ্টকর হলেও দুঃসাধ্য তো নয়। বরং এই ধরণের চ্যালেঞ্জমূলক কাজে সে বেশি মজা পায়। যা কঠিন, দুঃসাধ্য, অনায়ত্ত তাকে জয় করাই তার সুখ। তার ভেতর যে রোমাণ্টিক মন এক ডাইনামিক সত্তা আছে তা উৎসাহিত করল তাকে। বলল ঃ বনের পশুকে যদি বশ মানানো যায়, তাহলে মানুষকে প্রেম ভালবাসা মমতা দিয়ে আপন করতে পারব না কেন? সমস্ত সম্পর্কই ভালবাসা দিয়ে তৈরি করতে হয়। ভালবাসাই মনের ঘরে অনুরাগের প্রদীপ জ্বেলে দেয়। প্রকৃত ভাল না বাসলে বোধ হয় ভালবাসাটা ভালবাসা হয়ে ওঠে না। ভালবেসে মানুষ বলে ঃ আমায় যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি। আমার যত বিত্তপ্রভু—আমার যত বাণী সে তো দিতে হবে সে তো দিতে হবে।

স্বামীজি অবাক বিস্ময়ে বললেন ঃ কোন স্বার্থে নিজেকে তুমি বলি দেবে?

হঠাৎ জবাব দিতে পারে না মার্গারেট। নীরব আত্মদানের আবেগে থরথর করে কেঁপে ওঠল ভিতরটা। এই অনুভূতির নাম জানে না। এ এক নতুন অনুভূতি। বুকটা উথাল পাথাল করছিল তার। কানের লতি গরম হয়ে ওঠেছিল। মুখখানা নিষিদ্ধ এক তীব্র আনন্দের আবেগে রাঙা হয়ে গেল। কেন যে রক্তিম হল—এ এক বিস্ময় তার। স্বামীজি সম্পর্কে কতটুকুই বা জানে? নতুন পরিবেশে কী ধরণের সংগ্রাম করতে হবে তাও অজানা তার। যাঁকে আশ্রয় করে সে অপরিচিত জীবন বরণ করে নেয়ার সংকল্প নিয়েছে, কার্যকালে তিনিইবা কতটুকু তার পাশে, দাঁড়াবেন, তাও তার অজ্ঞাত। তবু-দুঃসাহসী অভিযাত্রী

মনটি অপরিচিত জীবনকে বরণ করে নিতে উৎসুক হল। বলল ঃ জানি না। আমার মনটা উন্মুখ হয়ে আছে আপনার সঙ্গ পেতে। আপনি কাছে থাকবেন, পাশে আছেন-শুধু এটুকু জানা থাকলেই প্রাপ্তির প্রসন্নতায় মনটা ভরে ওঠে। সমাজ, ধর্ম, কুসংস্কারের বিষে ঈশ্বরের পুত্রের মৃত্যু হয়েছে জেনেও আমরা দোষ শুধরে নেয়নি। ঈশ্বরের পুত্রকে হত্যা করে আমরা বিবেককে নিহত করিছি। বিমুখ হয়ে থাকলে তার পুনর্জীবন হয় কী কবে? অথচ, সেজন্য ঈশ্বর তো দায়ী নয়। তাঁর হাতে গড়া মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। মানুষ যে অমানুষ হয়ে গেছে সেতো তার দোষে, পাপে, লোভে এবং ভয়ে। তার ওপর অভিমান করে থাকলে তার তাপিত হৃদয়ের জ্বালা জুড়োবে কে? তার ক্ষতের ওপর প্রলেপ লাগানোর জন্য তো একজন ধাত্রী চাই। তার অধিকার দিয়ে আমাকে আপনার পাশে রাখুন, আপনার ইচ্ছেকে সুন্দর করার সাধ পূরণ করে ধন্য করুন।

স্বামীজির দু'চোখের ওপর আগ্রহের দীপ জ্বেলে চেয়ে রইলেন। অবাক মুগ্ধতায় অভিভূত হয়ে গিয়ে বললেন ঃ তুমি আমাকে অবাক করলে মার্গারেট। তোমাকে যত দেখছি, ততই তোমার ওপর শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছে। মানুষকে এত ভালবাস তুমি? তোমার নিঃস্বার্থ আত্মদানের জন্য তোমাকে অনেক মূল্য দিতে হবে।

জানি, প্রভু জানি। নিজের মত হতে পারার এবং থাকতে পারার জন্য দাম দিতে হয় অনেক। কিন্তু তার সুখ একটা আলাদা সুখ। প্রভুর জন্য গুরুর জন্য আমি সর্বস্ব দিতে পারি। গুরুই তার শিষ্যের সব চাওয়াকে পূর্ণ করতে পারে।

এক মহৎবোধে স্বামীজির অন্তঃকরণ ভরে ওঠল। তবু নিবৃত্ত হওয়ার জন্যই তাকে বলল ঃ স্বপ্ন খুব বাজে জিনিস। তার প্রমাণ দেওয়া সহজ নয়।

মার্গারেট অসংকোচে বলল ঃ তবু আপনি আমার স্বপ্নের পুরুষ। আমার কবিতার। আপনার অনেক মূল্য যে আমার কাছে। দেশের মানুষের মঙ্গলের জন্য আপনি খুশি হলে আমিও খুশি। খুশিতে ভরে ওঠুক আপনার দেশের খুশিহীন মানুষগুলো।

এক মহৎবোধে আবিষ্ট হয়ে গেল স্বামীজির চেতনা। কথাগুলো বুকের মধ্যে তাঁর গেঁথে গেল। গেঁথে যে অনেকক্ষণ ছিল তা তাঁর চোখের সবিস্ময় চাহনিতে ফুটে উঠেছিল। মার্গারেট মনের ভালবাসা দিয়ে নিজেকে নিবেদন করেছে এই বোধেই স্বামীজির চোখ মুখ হঠাৎ রাজা হয়ে গেল। নিজের বিব্রত ভাবটা মুহূর্তে সামলে নিয়ে বললেন ঃ আমার দেশের দুর্গত দুঃখী মানুষের কথা ভেবে তাদের জন্য জীবন উৎসর্গ করলে সে হবে আমার পরম প্রাপ্য। পশ্চিমের একটা মেয়ে যদি আমার পাশে দাঁড়িয়ে কোনো প্রত্যাশা প্রতিদানের

দাবি না রেখে দরিদ্র নারায়ণ সেবায় সর্বান্তঃকরণ নিজেকে উজার করে দেয় তা-হলে ভারতের মাটিতে সে নিজের জায়গা নিজেই করে নিতে পারবে। তোমার মত মেয়েকে ভারতের ভীষণ প্রয়োজন।

মার্গারেট প্রশান্ত চিত্তে গভীর গাঢ় স্বরে বলল ঃ তাই যদি ভগবানের ইচ্ছে হয়, আমি আসব আপনার পাশে, আপনার কাজে হৃষ্টচিত্তে যোগ দেব। একই সঙ্গে খাটব একই উদ্দেশ্য নিয়ে

"যতদিন, ওই তব মহাদ্যুতি প্রখর প্রত্যয়।

প্লাবিত না হয় বিশ্ব,

পৃথিবীর সর্বদেশে সেই আলো না হয় বিচ্ছুরিত।"

উত্তম কথা। আবার বলছি সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে বিশেষভাবে সবদিকে ভেবে দেখ। বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে পূর্বাপর চিন্তা করে নিয়ে তবে ঝাঁপ দিও। তবু যদি ব্যর্থ হয়ে যায় তোমার স্বপ্ন, কিংবা ভাবান্তর ঘটে,তা-হলেও আমি শেষদিন পর্যন্ত তোমার পাশে থাকব। আই উইল স্টান্ড বাই ইউ আনটু ডেথ, ওহেদার ইউ গিভ্ আপ বেদান্ত অর রিমেন ইন ইট।

ভীষণ ভাল লাগল মার্গারেটের। খুশিতে ভরে যায় তার অন্তঃকরণ। নিরুচ্চারে মনে মনে বলল ঃ রাজা, তোমার মনের নীলাভ অনুভূতির দ্যুতি মার্গারেটের অন্তরে বিন্দু বিন্দু আলো হয়ে স্পন্দিত হচ্ছে। এখন থেকে হতে থাকবে সারা জীবন। এইটুকুই তার চাওয়া এবং পাওয়া ছিল তোমার কাছে। নিভৃত হৃদয়ের ঐ স্পর্শটুকু পেয়ে ধন্য হয়ে গেছে তোমার পশ্চিমের মেয়ে। ওর মধ্যেই ও বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবেও। রাতের স্বপ্ন, দিনের ভাবনা থেকে তুমি কি করে পালাও দেখব?

উইম্বলডনে মার্গারেটের নিজের প্রতিষ্ঠিত রাস্কিন স্কুল পরিদর্শন করে স্বামীজি যে কত খুশি হয়েছিল সে কথা মনে হলে দীর্ঘসংগ্রামী জীবনের কর্মের গৌরব তৃপ্তিতে মার্গারেটের হৃদয় মন ভরে যায়। সাফল্যের এত বড় পুরস্কার জীবনভোর কেউ দেয়নি তাকে।

অফিস ঘরে বসে ওরা কথাবার্তা বলছিল। স্বামীজি নিজেকে কোনোরকম গোপন না করেই বললেন ঃ মার্গারেট স্কুল পরিদর্শন করে তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বহুগুণ বেড়ে গেল। নিজের যোগ্যতা এবং কর্মক্ষমতার জোরে তুমি এত বড় কীর্তির অধিকারী হয়েছ। তোমার এই কৃতিত্ব কোনো একটা ছোট গণ্ডীর মধ্যে আঁটিবে না। তুমি উপছে যাবে অবলীলায় মানুষের অন্য কোনো বৃহৎ কল্যাণকর্মের দিকে। বৃহৎ কর্মক্ষেত্রই তোমাকে ডেকে নেবে, তার হাতছানি উপেক্ষা করার সাধ্য নেই তোমার। সিসিম ক্লাবে এবং রেস্কিন স্কুলে তোমাকে যেভাবে পেলাম, দেখলাম তাতে তো তোমাকে এই জানা আমার ফুরোবে না। বোধ হয়, এই জানার সঙ্গে সঙ্গে চেনাও ফুরোবে না। চিরদিনের মিষ্টি প্রীতির বাঁধন বাঁধা পড়তে কার না ভাল লাগে। আমার দেশের দীন দরিদ্র অভাগা ছেলেরা অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। ওদের দুর্দশা দুর্ভাগ্য তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। ওদের সঙ্গে তোমার মিষ্টি প্রীতির বন্ধন ঘটলে অনেকেই তোমাকে বেশি ভালবাসবে। এটাই কিন্তু প্রকৃত ঘটনা। মানুষ ভালবাসার বড় কাঙাল।

স্বামীজির মুখে এই প্রশস্তি মার্গারেটের জীবনে এক নতুন মানে বয়ে আনল। দু'চোখে আগ্রহের দীপ জ্বেলে মার্গারেট স্বামীজির দিকে অনন্ত কৌতূহল নিয়ে চেয়ে রইল। তার দৃষ্টি যেন স্বামীজির শরীর ভেদ করে বিদ্যালয়ের গাছ গাছালি ভরা সবুজ লন পর্যন্ত যেন প্রসারিত।

জানলার কাছে গিয়ে শিক ধরে স্বামীজি লনের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিল। অভিভূত আচ্ছন্ন গলায় ডাকলেন ঃ মার্গারেট।

এই ডাকটা শোনার জন্য মার্গারেট উৎকর্ণ হয়েছিল। শোনামাত্র কী সব জমে থাকা জিনিস টিনিস হঠাৎ করে গলিয়ে দিল। সেই গভীর ডাকের মধ্যে এমন একটা গভীর অনাস্বাদিতবোধ লুকিয়ে ছিল যা আগে কখনও জানা হয়নি।

স্বামীজি ঘুড়ে দাঁড়ালেন মার্গারেটের দিকে। কিছুক্ষণ অপলক চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। তাঁর গলার স্বর, চোখের চাহনির পরশে সমস্ত শরীরটাই মার্গারেটের গলে যেতে লাগল। স্বামীজির অধরে স্মিত হাসি। সহকর্মী সহকর্মীকে দেখে যেমন হাসি হাসে। বললেন ঃ তোমার বিদ্যালয় ঘুরে ভীষণ শান্তি পেলাম। এই বয়সে শিক্ষা সম্পর্কে তোমার নিজের একটা ভাবনা-চিন্তা তৈরি হয়েছে। গতানুগতিকতার বাইরে কিছু করার সাহস এবং শক্তি তোমার দুই আছে। শিক্ষায়

শিশুদের মনের একটা বড় ভূমিকা আছে। তার ভালবাসার বিষয়টাও ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক শিশু কল্পনাপ্রবণ, খেলাধূলা করতে ভালবাসে। তার মধ্যে রূপকথার এক রাজপুত্র বাস করে। ফ্রয়েবেলের শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করে তুমি এগুলিকে আবিষ্কার করেছ এবং গ্রহণ বর্জন করেছ। তোমার কর্মপদ্ধতি আমাকে অবাক করেছে। আনন্দ যেমন হচ্ছে, তেমনি কষ্টও হচ্ছে।

মার্গারেট স্বামীজির বিষাদমাখা মুখের দিকে তাকিয়ে বলল ঃ তা-হলে আপনাকে এখানে এনে আমি শুধু কষ্ট দিলাম।

স্বামীজি একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন ঃ তা কেন? একজন সৃজনশীল মানুষের বেঁচে থাকাটা কখনও গতানুগতিক হতে পারে না। একেকজন মানুষের প্রতি একেকরকম শ্রদ্ধায় মন নুয়ে আসে।

সপ্রতিভ মার্গারেট বলল ঃ ভাগ্যিস, ভগবান মানুষকে কথা বলার জন্য ভাষা দিয়েছিল।

স্বামীজি সহসা হেসে ফেললেন। বললেন ঃ আমিত্ব প্রকাশটা এক একজনের একেকরকম। তবু মনের কারণেই একেকজনের দুর্বোধ্য দুর্বলতা থাকেই। আমিও সব দেখে শুনে এক নির্মল ঈর্ষা অনুভব করছি মানুষ হিসেবে নিজেকে পূর্ণতর করে তুলতে।

স্বামীজির কথায় মার্গারেট বেশ একটু মজা পেল। কথার মধ্যে বলল ঃ ঈর্ষা করার মত আমার কী আছে? আপনি যাকে দুর্বলতা বলছেন, সে হল আপনার মনের উদারতা। ঔদার্য দুর্বলতা নয়।

স্বগতোক্তির মত বললেন ঃ কিছুই করা হল না জীবনে। অথচ কত কী করার ছিল জীবনে। তবু অজ্ঞতা দূর করার জন্য, মানুষের শিক্ষার জন্য কিছুই করা হল না। যদি সমাজসেবী হতে পারতাম তা হলে আমার এই আমিময়তাকে চরিত্র গঠনের মধ্যে মিশিয়ে দিতে পারতাম। মানুষ থাকে না—সে কবিই হোক আর সন্ন্যাসীই হোক। কিন্তু অমর হয়ে থাকবে মানুষের চরিত্র। চরিত্র তৈরি করতে না পারার জন্য জগতের ধর্মগুলি প্রাণহীনতার শিক্ষায় দীক্ষায় ব্যক্তিত্ব গঠনের ওপর জোর দিতে হবে। ব্যক্তিতেত্বর সত্যই একটা গন্ধ থাকে। তাই, জগৎ চায় চরিত্র। জগতে আজ সেই লোকদের প্রয়োজন যারা স্বার্থহীন এবং যাদের জীবন প্রেমে প্রদীপ্ত। তোমার বুকে মানুষের প্রতি সেই অনন্ত প্রেম আছে। জগৎ আলোড়নকারী শক্তি আছে। তুমি পারবে মুর্খ, অজ্ঞ ভারতবাসীকে অন্ধকার থেকে আলোয় ফিরিয়ে আনতে। আমি শুধু বলি জাগ, জাগ। অনন্তকালের জন্য আমার অফুরন্ত আশীর্ব্বাদ রইল তোমায়।

মার্গারেট স্তব্ধ অভিভূত। তার কথা হারিয়ে যায়। স্বামীজির দেশহিতৈষণার বিপুল আবেগ তার হৃদয় মনকে প্লাবিত করল। মার্গারেট তাঁর কথা শুনে অনুভব

করে বুকে অনন্ত ভালবাসা নিয়ে এই মহাপুরুষ দেশের মানুষের কাছে পৌঁছতে চান। কিন্তু একা কিছুই করে ওঠতে পারছেন না। কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার অভাব যেমন আছে, তেমনি সংগঠন শক্তিরও অভাব আছে। তিনি যত বড় ধর্মপ্রচারক তত বড় সাংগঠনিক নন। দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য, মঙ্গলের জন্য অনেক কিছুই করার ইচ্ছে তাঁর।

মার্গারেটকে নিরুত্তর দেখে স্বামীজি বললেন ঃ আমার দেশের মানুষ এত গরীব যে ওদের যদি বিনা বেতনে পড়ার ব্যবস্থা করি তা-হলেও ওরা লেখাপড়া করতে পারবে না। ওরা ভাববে পেটের কথা—কী করে পেট চলবে? আর আমরা ভাবছি শিক্ষিত করার জন্য টাকা দরকার—এত টাকা কোথা থেকে আসবে? মানুষকে শিক্ষিত করার স্বপ্ন বোধ হয় স্বপ্নই থেকে যাবে।

স্বামীজির স্বপ্নভঙ্গের নিদারুণ যন্ত্রণা মার্গারেটকে আকুল করল। চমকানো বিস্ময়ে উচ্চারণ করল ঃস্বামীজি! তার সে ডাকের মধ্যে এমনই একটা উৎকর্ণ উদ্বেগ ছিল যে, স্বামীজিও বিদ্যুৎ চমকানোর মত চমকে তাকালেন তার দিকে। মার্গারেট নিজেই অপ্রস্তুত হল। লজ্জায় গাল তার লাল হল। লাজুক অপ্রতিভতায় চোখাচোখি হল ভারতের সন্ন্যাসীর সঙ্গে। দু'জনেই হেসে ফেলল। বিব্রতভাবটা চাপা দেবার জন্য মার্গারেট দ্রুততার সঙ্গে বলল ঃ আমি থাকতে কার সাধ্য আপনাকে স্বপ্নভঙ্গ করে? আপনার বাধাগুলি আমি হৃদয়ঙ্গম করিছি। কী করলে সব গুছিয়ে স্বপ্নগুলি সুষ্ঠভাবে সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করা যায় তার পরিকল্পনা আমি করে দেব। ভগবানের যদি তাই ইচ্ছে হয় তা-হলে আমি আপনার কাজে যোগ দেব। একসঙ্গে কাজ করব। একই উদ্দেশ্যে। পুরুষের পৌরুষ এবং বীর্যাবর্তার সঙ্গে নারীশক্তির নিগূঢ় প্রেরণা, এবং তার মমত্ব ও হৃদয়ের মাধুর্যের সমন্বয়ই পারে সমাজ সংস্কারের রূপরেখাকে আমূল বদলে দিতে।

মার্গারেটের কথাগুলো মন দিয়ে শুনলেন। ওঁর স্থির বুদ্ধিতে চমক লাগল। ওর মনোভাব যে খাঁটি, আন্তরিকতার মধ্যে যে ফাঁকি নেই তাও বুঝতে পারেন। তবু কথাগুলির মধ্যে এমন কিছু ছিল যা বিদ্যুৎ চমকানোর মত তাঁর সমস্ত ভেতরই চমকে দিল। ভাললাগা বড় সাংঘাতিক। তাই সে খেলায় মেতে ওঠার আগে নিজেকে সতর্ক এবং সাবধান রাখার জন্যই আস্তে আস্তে বললেন ঃ আমি সন্ন্যাসী। নিষ্কাম কর্মই আমার ব্রত।

আশাভঙ্গতার ছাই হয়ে গিয়ে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল মার্গারেট। এই মানুষটির আচরণ, কথাবার্তা, চালচলনের মধ্যে এতটুকু হৃদয় দুর্বলতার স্থান নেই। সর্ববিধ বন্ধনের বাইরে এক অসাধারণ মানুষ। সেজন্য ভীষণ ভাল লাগে তাঁকে। ওঁকে জয় করার প্রবল বাসনা তাকে পেয়ে বসে। স্বামীজি যে তাকে

এড়িয়ে চলছে সেটা মার্গারেট বোঝে, কিন্তু সে পারে না তাঁকে এড়াতে। মনে মনে নর-নারীর মধুর সম্পর্কের বন্ধন পোষণ করে মার্গারেট। তাঁর সান্নিধ্য তার কাছে সুখের। একা থাকলেই নিজের মনে বলতে ইচ্ছে হয়, তুমি আমার সর্বস্ব। আমার অস্তিত্ব, অনস্তিত্ব সব তুমি। তোমার কাছে নিজেকে সঁপিলাম আমি।

স্বামীজির অদ্ভুত উক্তিতে মার্গারেটের অভিমান হল। বলল ঃ তবু ভারতবর্ষের কাজে আমি বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব বলে সঙ্কল্প করিছি। সন্ন্যাসীর জীবনে ব্যক্তিগত বন্ধনের যে কোনো স্থান নেই আমি জানি। আমি তাঁর জীব সেবায় শুধু নিজেকে নিবেদন করতে পারি। ভূমিষ্ঠ হওয়ার বহু আগে থেকেই আমি ঈশ্বরের কার্যে উৎসর্গীকৃত হয়ে আছি। আমার নিজের বলে দাবি করার কিছু নেই। বিশ্বস্রষ্টার কাজের জন্যই নিবেদিত হয়েই আছি। তাই তো আপনার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করতে প্রস্তুত।

স্মিতহাস্যে অধর রঞ্জিত করে বললেন ঃ আমি জানতাম, তোমার কাছ থেকে অনেক সাহায্য পাব। ভারতবর্ষের হাজার হাজার মেয়ে তোমার প্রতীক্ষা করে আছে। আমি জানি নারীর ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার জোরে তুমি তাদের অত্যন্ত আপনজন হয়ে ওঠবে। বিধাতারও বোধ হয় সেরকম ইচ্ছে। তাই তোমাকে একান্ত কাছের জন করে পেলাম।

মার্গারেটের বুকের ভেতর তড়িৎ খেলে গেল। কী ভালো যে লাগল! ঐ কথাটায় তার শরীরের ঘরে ঘরে আলো জ্বলে ওঠল। ঘণ্টা বেজে ওঠল। পূজোর শানাই বাজতে লাগল। অনুভূতির মধ্যে আত্মনিবেদনের দপদপনি অনুভব করল। এই অব্যক্ত ভালবাসার কোনো যুক্তি যেমন হয় না, তেমনি ব্যাখ্যা করাও যায় না। তাই বোধ হয় লোভীর মত তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। নিজের অজান্তে এক নিষিদ্ধ ভালবাসার লাল হয়ে ওঠল।

এর একমাস পরেই স্বামীজি ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। সঙ্গে বেশ কিছু বিদেশী শিষ্য-শিষ্যার ছোট একটি দল। সকলেই স্বামীজির সঙ্গে ভারতবর্ষে চলেছেন। জাহাজে ওঠার সময় দেখা গেল মার্গারেট ঐ ছোট দলের মধ্যে নেই। অথচ তার ভারতে যাওয়ার ব্যাপারে স্বামীজির মনোভাব ছিল খুবই খোলাখুলি। মার্গারেটও মনে মনে সেরকম একটা ধারণা ছিল। কিন্তু রাজা চায়নি মার্গারেটকে সঙ্গে নিতে। স্বামীজির সঙ্গে একই জাহাজে ভারতে যাওয়ার ইচ্ছেটা শেষ পর্যন্ত অপূর্ণ থেকে গেল তার।

যাত্রার কিছু পূর্বে তাকে আশ্বস্ত করার জন্য একান্তে বসলেন ঃ মার্গারেট ক'দিন ধরে তুমি ছিলে আমার ভাবনার মধ্যমণি।

অমনি সারা শরীরের মধ্যে একটা হিল্লোল বয়ে গেল মার্গারেটের। অনির্বচনীয় ভাল লাগার সুখানুভূতিতে দু'চোখ বুজে এল। মার্গারেটের অভিভূত আচ্ছন্নভাব স্বামীজির দৃষ্টি এড়াল না। নিজেও একটু লজ্জা পেলেন। নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললেন ঃ ভেবেই বলছি, আমার সঙ্গে তোমার যাওয়া হবে না।

চমকানো বিস্ময়ে মার্গারেট তাকাল। মুহূর্তে দু'চোখের পাতায় নিবিড় ব্যথা জমে ওঠল। মনে হচ্ছিল তার ভিতরে একটা নদী বয়ে যাচ্ছিল। বিষাদ মাখা মুখে বলল ঃ যাওয়া হবে না!

নির্বিকার গলায় বললেন ঃ কিছু বন্দোবস্ত এখনো বাকি আছে। সেই আয়োজন সম্পূর্ণ না করে তোমাকে ভারতে যেতে বলি কেমন করে? যাঁরা যাচ্ছেন আমার সঙ্গে, তাঁরা আর তুমি এক নও। তোমার প্রয়োজন একটু অন্যরকম।

স্বামীজির মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা অনুমানের চেষ্টা করল মার্গারেট। তারপর কয়েকবার ঢোক গিলে বলল ঃ আমি কিন্তু মানসিকভাবে ভারতে যেতে প্রস্তুত।

অন্যদিকে চেয়ে স্বামীজি দুর্বল গলায় বললেন ঃ সে আমি জানি। ভারত জননী তোমাকে গর্ভে ধারণ করিনি, কিন্তু তুমি তাঁর সন্তান। ভারতবর্ষ তোমার নিজের ঘর। সেখানে তোমার ঠাঁই পাতা রয়েছে। ভারতবর্ষ তোমাকে বরণ করার জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু তার সময় এখনও হয়নি।

মার্গারেটের বুকটা দুলে ওঠল দুঃখে ও অভিমানে। উদগ্রীব হয়ে প্রশ্ন করল ঃ আর কতকাল অপেক্ষা করব? আমার যে তর সইছে না। ইচ্ছে করছে পাখি হয়ে উড়ে গিয়ে হিমালয়ের পাহাড় চূড়োয় বসতে।

ওর ছেলেমানুষী কথাশুনে স্বামীজি স্মিত হাসলেন। চকিতে একবার ওর মুখের দিকে চেয়ে গম্ভীর গলায় বললেন ঃ অতিরিক্ত ভাবালুতায় কোনো কাজ

হয় না। 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি এই হওয়া উচিত। নোবল আরো কিছুকাল অপেক্ষা করে তোমার মন তৈরি কর। মনটা তোমার ঠিক কী চায়, তুমিও ভাল করে জান না। সেটা আমিও ঠিক ব্যাখা করতে পারব না। তবে নিজেকে ভালবাসা, গুরুর প্রতি আত্যন্তিক অনুরাগ প্রীতি শ্রদ্ধা এবং ভারত সম্পর্কে তোমার কৌতূহল, আগ্রহের মাঝামাঝি একরকম অনুভূতি সেটা। রোদের দিকে বন্ধ চোখে তাকালে রামধনু দেখা যায় অনেকটা সেরকম একটা সুন্দর অনুভূতি।

মার্গারেট বিষাদ মাখা নীল রঙের দুটি চোখ তাঁর চোখের ওপর মেলে ধরল। তারপর স্ফুরিত অধরে একটু অভিমান প্রকাশ করে বলল ঃ আমার অর্ন্তমুখী মনের শূন্যতা ভরব কী করে?

অসহায়ভাবে গালে হাতখানা বুলিয়ে স্বামীজি বললেন ঃ নোবল, তোমার ঘটনাবহুল জীবন কত বিচিত্র ঘটনায় পরিপূর্ণ। কত মানুষের মিছিল, কত কর্মের আহ্বান, কত নতুন দায়িত্বে, অভিনব সংগ্রামে তোমার জীবন সমৃদ্ধ। তুমি ভাল করেই জান কোনো কোনো ঘটনা এবং মানুষকে বাইরে থেকে যা দেখায় তাই তার যথার্থ রূপ নয়। তাই বলছি কাজে ঝাঁপ দেবার আগে নিজের সঙ্গে ভাল করে বোঝাপড়া করে নাও। তা-ছাড়া, তুমি তো অন্যদের মত নও। তুমি একেবারেই আলাদা। ঝাড়া হাত-পা নও। তাই কোনো কাজ শুরুর আগে সাত-পাঁচ ভাবার আছে। যাব বললেই তৎক্ষণাৎ সব ছেড়েছুড়ে যাওয়াটা যে তোমার কত অসম্ভব আমার চেয়ে বেশি সেকথা কে জানে? স্কুল ক্লাব সংগঠনের বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে আছ। তার একটা সুষ্ঠ ব্যবস্থা করে দায়-দায়িত্ব অন্যদের বুঝিয়ে দিয়ে যেতে তো একটু সময় লাগে। সে সময় তো তোমাকে দিতে হবে। তারপর ভারতে কাজ করার অনেক সময় পাবে। তুমি অমৃতের পুত্রী। তোমার মধ্যে জগৎকে টলিয়ে দেবার বীর্য। ঘুমন্ত দেবতার ঘুম ভাঙা সোনার কাঠি তোমার হাতে।

স্বামীজির কথা শুনে মার্গারেট আশ্চর্য হয়ে গেল। এভাবে হতাশ হয়ে শূন্য হাতে তাকে ফিরতে হবে ভাবিনি। তার কথাগুলো চমৎকারিত্ব এবং এক তীব্র আকর্ষণে এমনই মুগ্ধ ও সম্মোহিত হয়ে গিয়েছিল যে প্রত্যুত্তরে কোনো কথা বলতে পারল না। এক বিভোর তন্ময়তা নিয়ে স্বামীজির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে একসময় একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

১৬ই ডিসেম্বর রাজার জাহাজ ইংলন্ডের উপকূল ছেড়ে ভারতের পথে রওনা হল। এক গভীর বিষাদে মার্গারেটের মনটা আচ্ছন্ন হয়ে গেল। মনে হল, কি যেন থেকেও নেই তার। বুকের মধ্যে একটা অব্যক্ত

ব্যকুলতা অহরহ দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে পাক দিয়ে দিয়ে ফিরতে লাগল, যার নাম হাহাকার।

হঠাৎ এ আবর্ত কোথা থেকে এসে তার জীবন নদীর গতিপথটাই পাল্টে দিচ্ছে, কি এর উদ্দেশ্য, কিই বা পরিণাম সে জানে না। বিদায়কালে তাকে আশ্বস্ত করার জন্য স্বামীজি বললেন ঃ নোবল, তুমি নিশ্চিত জেনো, ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য করেন। তিনি মানুষের শুধু ভাল চান। তোমার জীবনে এর সুফল একদিন মহিমান্বিত করবে তোমাকে। এই যে তোমার যাওয়া এর কোনো উদ্দেশ্য আছে, হয়তো তাতে আমরা দুজনেই লাভবান হব।

চোখের জলে বুক ভাসিয়ে মার্গারেট আর্তগলায় প্রশ্ন করল ঃ কি লাভ হবে?

স্বামীজি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতে পারলেন না। একটু থেমে বললেন ঃ এক অজ্ঞাত মোহনার দিকে তাকিয়ে তুমি আর কাউকে নয়, তোমার আমিকেই লাভ করছ। যাজ্ঞবল্ক্যের ভাষায় মানুষ অন্য কাউকে কিছু দিতে পারে না, নিজেকেই দেয়। নিজে ভরে ওঠার জন্য আপনাকে বিলিয়ে দিয়ে সুখ পায়। এই সুখ এবং প্রাপ্তির আনন্দ তোমার আমার আত্মাকেই পূর্ণ করছে।

মার্গারেটের সব কথা হারিয়ে যায়। কিন্তু কথাগুলো দেহে মনে এমন আশ্চর্য সঙ্গীতে বাজছিল যে তার সমস্ত মনটা সুরের ভেলায় ভেসে ভেসে কোন দেবলোকের দিকে পৌঁছে গেল--যেখানে তার কোনো অভাব কিংবা দৈন্য ছিল না।

এক অদ্ভুত ভাবোন্মাদনার মধ্যে দিনগুলো কাটার পর সংসারের নিত্যকর্মের মধ্যে আবার ফিরল মার্গারেট। কিন্তু দিনগুলো আগের মত কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠল না। বিষাদের কষ্ট বুকে চেপে যন্ত্রের মত কাজে করে যাওয়া। তার মধ্যে সে ছিল কিন্তু মন ছিল না। স্বামীজির আরব্ধ কাজেও ভাঁটা পড়ল। যাদের ওপর স্বামীজির প্রবর্তিত কাজের দায়িত্ব ছিল তারাও কোনো উৎসাহবোধ করল না। ফলে, লন্ডনে বেদান্ত ধর্মের প্রচরের কাজটা পিছিয়ে পড়ল।

মার্গারেট দিশেহারা হয়ে পড়ল। কী করলে স্বামীজির আরব্ধ কার্যে গতিবেগ সঞ্চার করা যায় তার কথা ভেবে অস্থির হল। অথচ ইংলন্ডে বেদান্ত প্রচারের দায়িত্ব তাকে ও মিঃস্টাডিকেই তিনি অর্পণ করেছেন। কিন্তু ইংলন্ডের মানুষকে আকৃষ্ট করতে তাদের কর্ম-প্রয়াস ব্যর্থ হল। চেষ্টা করেও তারা বক্তৃতায় স্বামীজির মত মানুষ আকৃষ্ট করতে পারল না। মার্গারেটেরে নিজের মনে সংশয় জাগল,-বেদান্তের আত্মাকে তারা ঠিক ধরতে পারছে না বলেই তাকে ভারত যাত্রার সঙ্গী করল না। প্রথম পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার

আত্মগ্লানিতে তার মন পুড়তে লাগল। একজন ভাল বাগ্মী এবং সাংগঠনিক হওয়ার আত্মগর্ব ঐ আত্মদহনের শিখার মুখে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছিল। এতদিন যাকে মূল্যবান বলে ভেবেছিল তা ঐ আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল। মাসের পর মাস পুড়তে লাগল সেই আগুনে। পুড়তে পুড়তে মনের কোনায় কোনায়, অনুভূতির অন্ধকার গলিতে গলিতে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি শিখার আলোয় ভাস্বর হয়ে ওঠল মার্গারেটেরে ভেতরটা। ভয়ের, গর্বের অন্ধকার সরে গিয়ে এক নতুন মার্গারেটের জন্ম হল। তার নাম বিবেকানন্দের মার্গারেট। তাঁর হস্তলিপি বক্ষলগ্ন হয়ে যেন বলছিল ঃ নোবল তোমাকে নয়, তোমার ভিতরে যে আত্মার অধিষ্ঠান আমি সেই আত্মাকেই ধরতে চেয়েছি। তোমার মধ্যে আমি তাকে খুঁজছি। আত্মা অক্ষয়, অমর। একে কেউ ধ্বংস করতে পারে না, না কাল, না নিজে, না তোমার আমার অহঙ্কার। কিন্তু এই জীবনের পরম অনুভূতিতে সে অক্ষয় অব্যয়।

বিবেকানন্দের কথা ভাবতে-ভাল লাগছিল। এক আশ্চর্য সুখে দেহ মন ভরে যাচ্ছিল। কতদিন তাঁকে দেখিনি মার্গারেট। তবু তার অর্ধবিস্মৃত মুখখানা রাতের আকাশের চাঁদ হয়ে জেগে ছিল। কিন্তু এতো জ্যোৎস্নার বাগান। এখানে কোনো মোহ নেই, দুঃখ নেই-এক অনির্বচনীয় প্রাপ্তিতে হৃদয় উপছে উঠল। পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকিয়ে বলল ঃ আমি আর কাউকে তোমার চেয়ে বড় হতে দেব না। এই কথাটা কয়েকদিন ধরেই আমার মনে যাওয়া আসা করছিল। কিন্তু আমি উত্তর পাইনি। আজ মনে হচ্ছে, আনন্দের সিঁড়ি বেয়ে আমি আমার উত্তরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। আমার মনের সমস্ত তারগুলি যেন তাঁরই সুরে বাঁধা। তাঁর একটু ছোঁয়া পেলে দেহমন জুড়ে সুরের তরঙ্গ বয়ে যায়। তোমার গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি, তখন তারে চিনি আমি তখন তারে জানি। এক আশ্চর্য পুলক শিহরণে সারা গায়ে কাঁটা দিল।

ভারত থেকে আগত স্বামীজির চিঠির ওপর চোখ রেখে নিশ্চল হয়ে রইল অনেকক্ষণ। এক গভীর তন্ময়তায় ডুবে গিয়ে নিজের স্বপ্নের মধ্যে মগ্ন হয়ে রইল। রাত্রিটা যে জেগে জেগেই গড়িয়ে গেল, জানল মায়ের কণ্ঠস্বরে।

শীতের রাত্রি। জানলা দরজা বন্ধ অন্ধকার ঘরে শুয়ে পূবের আকাশে মুঠো মুঠো আবির ছিটিয়ে ভোরের সূর্য ওঠা দেখা গেল না। জানা গেল না আঁধার লুপ্ত হয়ে গিয়ে দিনের আলোয় ঝলমল করছে দিন। আলো বাতাস শূন্য সেই

জমাট অন্ধকারে আচ্ছন্ন ঘরে কিসের অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি তার মন আলো করে রয়েছে।

বাইরে মোরগ ডাকল। পাখিরা নীড় ছেড়ে হৈ-চৈ করে বেড়িয়ে পড়েছে ভোরের উজ্জ্বল আকাশে।

আশ্চর্যের কথা, বিনিদ্র রজনী যাপনের কোনো চিহ্নই ছিল না মার্গারেটের মুখাবয়বে। এক আনন্দ সাগরে ভাসছিল সে।

রোজ সকালে ছেলে মেয়েদের ঘুম থেকে ডেকে তোলা মেরী ইসাবেলের প্রথম কাজ। ধীর পায়ে মার্গারেটের সামনে দাঁড়াল। উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ। মনে হল, সে ঘুমিয়ে নেই, জেগে আছে। কয়েকটা মুহূর্ত তার দিকে স্থির তাকিয়ে থেকে অস্ফুট গলায় দরদ ঢেলে জিগ্যেস করল ঃ মার্গারেট, সারারাত জেগে আছিস মা। শরীরটা যে ভেঙে যাবে।

নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল জেগে আর কোথায় কাটালাম মা রাতভোর তো তোমাদের সঙ্গে রাজার সঙ্গে এবং নিজের সঙ্গে কথা বললাম। রাজা, বাবা, তোমরা কোথা থেকে পাতাল ফুঁড়ে ওঠে আমার ঘুমটাকে কেড়ে নিলে। আজ কয়েকটা মাস ধরে যে ভাবনা, যন্ত্রণা বুকে করে বেড়াচ্ছি রাজার চিঠি এসে তার ঢাকনা খুলে দিল। স্নেহ, মমতা, দরদ, ভালবাসা, শ্রদ্ধা, অনুরাগ, মোহ, আসক্তির ছত্রিশ নাড়ীর বন্ধনের মধ্যে যে এত রক্ত জমা ছিল, জানতাম না। সারারাত ধরে বোধ হয় রক্তক্ষরণ হয়েছে। তারই রক্তে ভিজে গেছে আমার বিছানা, বালিশ। আমার বিনিদ্র রাত্রির নীল আকাশ রক্তে লাল হয়ে গেছে।

ইসাবেলের বুকে মমতার সাগর উথলে ওঠল। হৃদয়াবেগ সামনে রাখা তার পক্ষে মুস্কিল হল। মুখের ওপর ঝুঁকেপড়ে ইসাবেল প্রশ্ন করলঃ তোর এত কষ্ট কিসের? আমি আর তোর কষ্ট সইতে পারি না। কী হয়েছে আমার খুলে বল মা!

মার্গারেট চুপ করে রইল। ইতস্তত করছিল—কী বলবে, আর কী বলবে না করে। ভাবল ; মাকে বললে তাকে কষ্ট দেওয়া হবে। সন্তান হয়ে মাকে সেই কষ্ট দেবে? আঠাশ বছরের ব্যক্তি হঠাৎ কোন অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে তাকে যাদু করল, আর সে পাখি হয়ে নীল আকাশে ছোট্ট দুটি ডানা মেলে দেখার জন্য অধীর হল। বাস্তব সংসার মরীচিকা হয়ে গেল তার কাছে। এসব কথা শুনলে কোনো মা সইতে পারে? পারবে না বলেই সে নিজের সঙ্গে অন্যের কথা বলে জেনে নিচ্ছে সত্য কি? রাতের নীরব সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গিয়ে নিজের মনের যে অংশ অভিব্যক্ত করতে পারে

না ; ঘুমে স্বপ্নে, জাগরনে তাকেই খোঁজে সে। নিজেকে অন্বেষণ করতে গিয়ে মার্গারেট বারংবার আশ্চর্য হচ্ছিল এই ভেবে, যে জীবনের কোনো বৃত্তান্ত নেই বলে তার ধারণা ছিল সে জীবন বহু মানুষের সংস্পর্শে, জীবনের নানা ঘটনায় ভরে আছে। এক জীবন কত বিচিত্র ঘটনায় পরিপূর্ণ। কত জীবনের কত মানুষের ঘটনার মিছিল চলেছে-জীবনকে পূর্ণ করার জন্য। রাতের অন্ধকারে নিঃশব্দে একের পর এক ওঠে এসেছে তারা এক অনির্দিষ্ট আকাংখায়-অর্ন্তজীবন প্রবাহের গতিকে চিহ্নিত করতে।

মার্গারেটকে নীরব দেখে ইসাবেল বলল ঃ চুপ করে থাকলে তোর কষ্টকে যন্ত্রণাকে তো জানা হবে না মা।

মা, আমি তো বলতে চাই, কিন্তু তোমার কষ্টের কথা ভেবে বলা হয় না। বলতে পারি না। আমার কষ্ট তোমার বুকে বোঝা হয়ে ওঠুক সে আমি সহ্য করতে পারব না।

ইসাবেল তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল ঃ তুচ্ছ ভয় আমার কেটে গেছে। তোর কষ্টটা আমি আর সইতে পারছি না। তুই এমন কিছু করিস নি যে নিজেকে এত কষ্ট দিতে হবে।

মা, তবু আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। এরকম পরীক্ষায় কি কেউ পড়েছে কখনো? বিশ্বাস কর ভিতরে ভিতরে আমি কাঁদছি সর্বক্ষণ। নিজেকে প্রশ্ন করছি ওগো পরম পিতা আমাকে অন্যদের মত করনি কেন? অন্যদের জন্য আমার বুকে এত মমতা দিলে কেন? কেন পারলাম না সাধারণ হতে? অসাধারণই যদি তোমার করার ইচ্ছে ওগো দয়াময় তাহলে শক্ত মনের মানুষ করে গড়লে না কেন? আমাকে শক্ত হওয়ার একটু শক্তি দাও। নইলে, মনের বন্ধনগুলো ছিঁড়ব কি করে? আমি তো সাধারণ মেয়ে। আমার পরিবারের প্রতি কিছু দায়িত্ব আছে। ব্যক্তিগতসুখের জন্য সে দায়িত্বচ্যুত হওয়া যায় না।

ইসাবেল হঠাৎই প্রশ্ন করল ঃ তোর অন্তরের মধ্যে বসে যিনি সত্যকে স্বীকার করার নির্দ্দেশ দিচ্ছে তিনি কি ভারতের সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ?

চমকে ওঠে সেই আধ-অন্ধকার ঘরে মার্গারেট। বিস্ময়ে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল ঃ হাঁ। তাঁর চিঠি পেয়ে আমি এত অভিভূত হয়ে গেছি, যে আমার মন আর বাঁধা মানছে না। তাঁর আহ্বানকে 'না' বলে ফিরিয়ে দিতে পারব না। আমার মনপ্রাণ ভারতবর্ষের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য ব্যগ্র হয়েছে। আমার রক্ত মাংসের জড় শরীরটাই শুধু এখানে। মনটা ভারতবর্ষে পড়ে আছে। শয়নে স্বপনে আমার গুরুকেই দেখি। হাতছানি দিয়ে আমাকে ডাকছেন। আমি থাকি কি করে?

ইসাবেল একটু হেসে বলল ঃ এই অনুমতির জন্য নিজেকে তুই দুঃখ কষ্ট দিচ্ছিস। এই দিনটার জন্য আমি বিশ বছর ধরে নিজেকে তৈরি করছি। তোর বাবার এক বন্ধু ভারত প্রত্যাগত যাজক তোকে দেখেই বলেছিলেন, এই মেয়েকে ভারতবর্ষ একদিন তার কাজের জন্য ডেকে নেবে। সেই বার্তা যে ভারতের সন্ন্যাসী বহন করে এনেছে আমার মন জানত। তাই স্নেহ কাঙাল মনটা ওঁর ছায়া থেকে সর্বক্ষণ তোকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করত। কিন্তু যা সত্য যা অনিবার্য তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারব না জানতাম। তবু নিজের সঙ্গে নিজের ছায়ার যে নিরন্তর লড়াই তাতে যত পর্যুদস্ত হয়েছি ততই তোর ওপর নিষ্ঠুর হয়েছি। তোকে কষ্ট দিয়েছি। তাই যেদিন তুই বললি, মা সন্ন্যাসীকে গুরু বলে মেনেছি। তাঁর আহ্বানে সাড়া দেওয়ার জন্য মনটা আকুল হয়েছে। তাঁর সহকর্মী হয়ে কাজ করার জন্য ভারতে যাব। সেদিন তোর কোনো কথার জবাব না দিয়ে রাগ করে ওঠে গিয়েছিলাম। দরজা বন্ধ করে শুধু কেঁদেছি। যীশুকে বলেছি, শোকে দুঃখে, যন্ত্রণায় সারাজীবন তুমি আমাকে শাস্তিই দিয়েছ। শান্তি দাওনি। আজ তোমার কাছে ভিক্ষে চাইছি, আমার মার্গারেটকে তুমি কেড়ে নিও না। স্বামীজি তারপর সত্যি সত্যি তোকে রেখে ভারতে চলে গেলেন তখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। যীশু আমার প্রার্থনা শুনে কৃপা করেছেন। এই বৃদ্ধ বয়সে তিনি আমায় এক কঠিন পরীক্ষা ফেলেছেন। আই ওয়ার্ক এগেনস্ট মাই হার্ট। সারা জীবন অপ্রাপ্তি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হল।

ইসাবেল প্রাণ খুলে কাঁদল। অনেকদিন পরে মার্গারেটের সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলতে পেরে বেশ স্বস্তি অনুভব করল। মনে হল কান্নাটাই যেন মুক্তি হয়ে তার মনকে গ্লানিমুক্ত করে দিয়েছে। মার্গারেট মায়ের কোলে মাথা রেখে তাকে জড়িয়ে ধরল। আর ইসাবেল তার কুঞ্চিত সোনালী কেশদামের মধ্যে আস্তে আস্তে আঙুল চালিয়ে দিতে দিতে বলল ঃ আমি যা পেয়েছি তা অতুলনীয়, আমার কোনো ক্ষোভ নেই, দুঃখ নেই। শুধু দুঃখ, তোকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। এত কষ্ট স্বামীজি চলে যাওয়ার পরেও আমায় দেখতে হয়েছে।

মার্গারেটের বুকের মধ্যে কি যেন সব গলে গলে পড়ছিল। মনটা আর্ত হল। কনুইর ওপর ভর দিয়ে মুখটা তুলে ধরল ইসাবেলের দিকে। চোখের কোনে গড়িয়ে পড়া অশ্রুবিন্দু মুছিয়ে দিয়ে গাঢ় গভীর গলায় অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলল ঃ মা গো, একদিনও আমি কোনো কষ্ট পাইনি, বিশ্বাস কর, কষ্ট পেলে তোমার মায়ের মন দিয়ে কি তুমি টের পেতে না? এই তো পেলে।

মার্গারেটের মনের মধ্যে এক নতুন হাওয়া বইতে লাগল। তার ভারতে যাওয়ার কথা শুনে কুড়ি বছরের রিচমণ্ড কেঁদে ফেলল। বলল ঃ দিদি, তুই চলে যাবি? আমাদের আঠাশ বছরের সম্পর্ক কিছু নয়। এর কি কোন জোর নেই, অধিকার নেই।

মার্গারেট রিচমণ্ডের কপাল থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে বলল ঃ কোনো সম্পর্কই মুছবার নয়। স্নেহে, সখ্যে, মাধুর্যে ভালবাসায় তার পাত্র ভরা থাকে।

যারা জীবনে নানা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে তারাই শুধু জানে, যা যাবার তা যাবেই। আমরা কাউকে ধরে রাখতে পারি না। শুধু ধরে রাখার চেষ্টা করি। তোর মনটা কি আমাদের জন্য একটু ভাবতে বলে না।

যেখানেই থাকি তোদের সকলকে সবসময় মনে পড়বে। আঠাশ বছরের সম্পর্ক কি ভোলা যায়?

তাহলে ভারতে যাওয়ার ইচ্ছে ত্যাগ কর। তুই হলি এ বাড়ির মাথা। তুই গেলে আমরা অনাথ হয়ে যাব। মনে হবে, সংসারের প্রধান আশ্রয়টাই আমাদের হারিয়ে গেল।

মার্গারেট রিচমণ্ডকে শান্ত করার জন্য বলল ঃ আমিও কোনোদিন ভেবেছি তোদের ছেড়ে যাব। আমারও কষ্ট হচ্ছে। তবু ভারতই আমার বন্ধন। ভারতই আমার মুক্তির পথ দেখাবে। আমি চাই তুই এই বাস্তব সত্যটা একটু সহানুভূতির সঙ্গে বোঝার চেষ্টা কর। তাহলেই আমি সেখানে গিয়ে শান্তি পাব।

তুই তো সমাজসেবা করতে চাস। তাহলে ইংলণ্ড দোষ করল কি? আমাদের স্বদেশভূমি আর্য়ল্যাণ্ড তো আছে।

ভারত সম্পূর্ণ আলাদা। ওখানে যে দারিদ্র্য, কুসংস্কার আর দাস মনোবৃত্তি দেখতে পাব এখানে থেকে তুই তা কল্পনাও করতে পারবি না। ওখানে হত দরিদ্র অর্ধনগ্ন মানুষগুলোর ধ্যান-ধারণা অদ্ভুত।

ওরা সাদাচামড়ার মানুষ এড়িয়ে চলে। তাদের অস্পৃশ্য বলে ঘেন্না করে। সন্দেহ করে, অশ্রদ্ধা করে। এসব জেনেও সেখানে যাবি।

যাব। কারণ, আমার গুরু বলেছেন, ভারতবর্ষ আজও মহীয়সী নারী সৃষ্টি করতে পারেনি। অন্যদেশের কাছ থেকে এ জিনিস তাকে ধার করে আনতে হবে। উপেক্ষিত, অনাদৃত, পরাধীন আর্য়ল্যাণ্ড থেকে সেই রমণীকে ধার করলে তাতে আর্য়ল্যাণ্ডের গৌরব ও মর্যাদা দুই বাড়বে। আমি ইংরেজের কেউ নই। ইংলণ্ডে বসে আমি স্বদেশভূমি আর্য়ল্যাণ্ডের জন্য কিছু করতে পারব না। কিন্তু পরাধীন আর্য়ল্যাণ্ডের মতই একটি দেশ ভারতবর্ষকে আমি ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইর সাধনক্ষেত্র করে তুলব। আমাদের চিরশত্রু ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াইর জন্য ভারতের মানুষকে একেবারে তৃণমূল থেকে তৈরি করতে পারব। এ হল আমার সাধনা। ভারত আমার সেই সাধনক্ষেত্র।

কিন্তু স্বামীজি তো তোকে চিঠি দিয়েছে. ভারতের চেয়ে লণ্ডনে থাকলেই তুই অনেক বেশি কাজ করতে পারবি। আমারও তাই ধারণা। লণ্ডনের সংবাদপত্রগুলিতে তোদের নতুন সমিতির কর্মোদ্যোগের প্রশংসায় ছড়াছড়ি। সব ধর্মের মানুষের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থে এরা একমাসের মধ্যে দশহাজার লোককে দুর্ভিক্ষের সময় অন্ন দিয়েছে। এক মুঠো চালের বিনিময়ে একটা মানুষকে মৃত্যুর মুখ থেকে ছিনিয়ে আনা কী কম কথা! এত বড় প্রশস্তির পরেও ভারতে যাবি।

সে জন্যে তো আরো যাওয়া দরকার ভাই। যে মহান দেশের হৃদয়খানা এত বড় সে দেশের মানুষের মধ্যে ভগবান বাস করেন। সে দেশে যাওয়াটা পূণ্য। যে মানুষটার পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করতে যাচ্ছি তিনি পুরুষোত্তম। ওঁকে একবার দেখে আসতে আমার হবেই। কিন্তু ওঁর কাছে যাওয়া খুব সহজ নয়। অনেক বাজিয়ে পরখ করে তবে অধিকার দেন। বড় দেরি করে সে কথাটা বুঝতে পেরেছি। আহ্বানও যেমন করছেন. তেমনি ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে সতর্ক-সাবধানও করছেন। মানুষকে বাজিয়ে নেযার পদ্ধতিটা একটু অন্যরকম।

রিচমণ্ড বেশ একটু ক্ষুব্ধ হয়ে বলল ঃ তোকে বোঝায় কার সাধ্য? সবাই যখন হাল ছেড়ে দিয়েছে তখন ভাবলাম, ছোট ভাইর আব্দারটুকু অন্তত থাকবে। কিন্তু হতোস্মি। হেরে গেলাম তোর জেদের কাছে।

মার্গারেট একটুও রাগল না। শান্তভাবে বলল ঃ রিচমণ্ড ভাই আমার, অভিমান করে থাকলে কষ্ট পাব। দিদিকে একটু বোঝার চেষ্টা কর ভাই। আমি কিছুই করছি না। সবই নির্দ্দিষ্ট হয়ে আছে খোপে খোপে। মানুষের জীবন বড় বিচিত্র। কত বিস্ময় এখানে থরে থরে সাজানো। সব ঘটনারই একটা নির্ধারিত সময় থাকে। সে সময় না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকতে হবে। কুঁড়ি ধরা, ফুল ফোটা কিংবা ফল হওয়া তারপর ঝড়ে পড়া সবকিছু যে যার ভাগ করা সময়ে আপনা আপনি হয়ে যাচ্ছে। তেমনি মানুষের জীবনেও একে একে সব জটিল গ্রন্থি খুলে যাচ্ছে। আমার ক্ষেত্রেও তাই। বেশ বুঝতে পারছি, আমার যাওয়ার পথটা সহজ হয়ে আসছে। সাধারণ একটা মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে আমি। কত দরিদ্র অবস্থার মধ্যে বড় হয়েছি। খুব সামান্য আশা-আকাঙক্ষার জীবনও যে দারুণ কিছু হতে পারে নিজেও কি ভেবেছি কোনোদিন। অথচ, কী সুন্দরভাবে সব আপনা আপনি ঘটে যাচ্ছে। কোনো কিছুই আমি ডাক দিয়ে আনিনি—বরং বর্তমানই দরজা ভেঙে জীবনের মধ্যে ঢুকে পড়ে আমাকে বর্তমানের মধ্যে টেনে নিয়েছে। আমি শুধু তার স্রোতে ভেসে গেছি।

যাওয়ার দিনে সকাল থেকে আকাশখানা মেঘলা করে ছিল। চারদিক থেকে কুয়াশা নামল নিবিড় হয়ে। শীতের কনকনে ঠাণ্ডায় হাত-পা জমে যাচ্ছিল। কাকভোর থেকে টিপটিপ করে বৃষ্টি হচ্ছিল। বৃষ্টিটা একটু কমলে মার্গারেট বেরোবে ভেবেছিল। কিন্তু মৃদু বৃষ্টি ক্রমেই চেপে এল। সময় বয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে প্রবল বর্ষনের মধ্যে ওরা বেরোতে বাধ্য হল। একটা ক্যাবখানা করে টিলবাড়ির বন্দরের দিকে ওরা চলল। খড়খড়িতে বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা খই ফোটার মত ফুটতে লাগল।